আনাতোলী রীবাকোভ

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

আনাতোলী রীবাকোভ

বিদেশী ভাষায়
সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ
КОРТИК

অনুবাদ: রথীন্দ্র সরকার
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ্লাসভ

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

রেভ্স্ক

দ্বিতীয় পর্ব

আরবাত স্ট্রীটের আঙিনা

তৃতীয় পর্ব

নতুন বন্ধুদল

চতুর্থ পর্ব

সতেরো নম্বর দল

পঞ্চম পর্ব

সপ্তম শ্রেণী

ষষ্ঠ পর্ব

পুশকিনোর কুটীর

প্রথম পর্ব

১

সাইকেলের ছেঁড়া টিউব

নিঃশব্দে সোফা ছেড়ে উঠল মিশা। জামাটা গায়ে চড়িয়ে সুট্ করে বেরিয়ে এল অলিন্দে।

ভোরের কাঁচা রোদের আমেজ পেয়ে চওড়া ফাঁকা রাস্তাটা ঝিমুচ্ছে। শুধু মোরগদের ডাকে যা একটু নীরবতার ব্যাঘাত। আর বাড়ির ভেতর থেকে মাঝে

মাঝে শোনা যাচ্ছে গলা খাঁকারি আর ঘুম-জড়ানো বিড়বিড়ানি। রাতের বিশ্রামের হিমনিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রথম প্রাণের সাড়া জেগেছে এইটুকুই।

চোখদুটো কুঁচকে মিশা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ফের গিয়ে গরম বিছানাটার মধ্যে ঢোকে, কিন্তু যেই মনে পড়ল কাল সেই লাল-চুলো গেঙকাটা খুব বুক ফুলিয়ে গুল্তি দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল অমনি ঘুম-টুম কোথায় গেল উপে! মেঝের ক্যাঁচকেঁচে তক্তার ওপর দিয়ে গুটি গুটি পা ফেলে ও এগিয়ে গেল গুদামঘরের দিকে।

ছাদের কাছে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়ে সরু একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা বাইসিকেলখানার ওপর। ওটা আসলে একটা মান্ধাতার আমলের যন্তর, ছুট্কি-নাট্কি কলকব্জা জোড়াতালি দিয়ে বানানো— টায়ারগুলো চেপ্টে গেছে, চাকার শলাগুলো ভাঙা, মরচে-ধরা। চেনে চিড় ধরেছে। বাইসিকেলের ওপরের দেয়ালে একটা ছেঁড়া রবারের টিউব ঝুলছিল — গায়ে সেটার নানা বর্ণের বিচিত্র তালি। টিউবটা নিচে নামিয়ে মিশা ছুরি দিয়ে ভেতর থেকে দুটো পাতলা ফালি কেটে বের করে নিল। তারপর এমনভাবে সেটাকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে ঝুলিয়ে রাখল যাতে কাটা জায়গা নজরে না পড়ে।

সাবধানে দরজাটা খুলে বের হতে যাবে এমন সময় হঠাৎ দেখে পলেভোয়। পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে। খালি পা, গায়ে ডোরাদার গেঞ্জি, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। আস্তে আস্তে দরজার পাল্লাটা টেনে একটুখানি খুলে রেখে মিশা সেই সরু ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে লাগল। পলেভোয় উঠোনে ঢুকল। অযত্নে পড়ে থাকা একটা কুকুর-খোপের সামনে খানিক থমকে দাঁড়াল, তারপর এদিক-ওদিক চাইতে লাগল খুব মনোযোগের সঙ্গে।

মিশা অবাক হয়ে ভাবছিল, 'ঘুম-টুম নেই, অমন অদ্ভুতভাবে ঘোরাফেরা করছে কেন পলেভোয়?'

পলেভোয়কে সবাই ডাকত 'কমরেড কমিসার' বলে। লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা, চুলগুলো কটা, চোখদুটো চতুর, হাসিমাখা। এক সময় নাবিক ছিল, তাই সবসময়

চওড়া কালো পাৎলুন আর কোর্তা পরে। কোর্তাটায় তামাকের গন্ধ, জামার নিচে কোমরের পেটিতে একখানা রিভলভার গোঁজা। পলেভোয় এবাড়িতে থাকত বলে পাড়ার ছেলেরা সবাই হিংসে করত মিশাকে।

মিশা ভাবছিল, 'বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে কেন পলেভোয়? এখন তো দেখছি এখান থেকে আমার বেরুনোই হয়ে উঠবে না!'

কুকুরের বাক্সের কাছে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে পলেভোয়। উঠোনের চারদিকটা আর একবার চেয়ে দেখল। দরজার যে ফাঁকটা দিয়ে মিশা তাকিয়ে দেখছিল সেটার ওপরে ওর কড়া নজর এসে পড়ল একবার। বাড়ির জানলাগুলোর ওপরও একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল।

কুকুরের বাক্সটার নিচে হাত ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আতিপাতি করে দেখল — বোঝাই যাচ্ছে কিছু একটা যেন খুঁজছে। তারপর অবশেষে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ফিরে চলল বাড়ির ভেতরে। পলেভোয়ের ঘরের দরজায় খর খর করে একটা আওয়াজ হল। ওর ভারি দেহটার চাপে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল বিছানা। ব্যস্, তারপর আবার সব নিঝুম।

মিশা ভেবেছিল এখুনি গুল্‌তিটা বানাতে শুরু করবে, কিন্তু পলেভোয় কুকুরের বাক্সটার তলায় কী খুঁজছিল সেটাও তো জানা দরকার। চুপিসারে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। তারপর থেমে ভাবতে লাগল:

দেখবে নাকি? কিন্তু যদি কেউ ওকে দেখে ফেলে? কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে জানলাগুলোর দিকে তাকাল মিশা। 'নাঃ, এতটা কৌতূহল ভাল নয়!' কিন্তু মাটি খুঁড়ে হাত চালিয়ে দিল কুকুরের বাক্সের নিচে। 'কিছু তো নেই দেখতে পাচ্ছি,' নিজের মনেই ভাবল মিশা। পলেভোয় যে তবে কিছু একটা খুঁজছিল সেটা তাহলে ওর নেহাৎই কল্পনা। বাক্সের নিচে হাতড়াতে থাকে মিশা। নাঃ, কিচ্ছু না! শুধু মাটি, শাওলা ঢাকা কাঠের টুকরো। মিশার আঙুলগুলো একটি ফাঁকে ঢুকল। যদি সেখানে কিছু লুকোনোও থাকে তাহলেও অবিশ্যি মিশা বের করে দেখবে না জিনিসটা, ও শুধু নিশ্চিতভাবে জানতে চায় এইমাত্র! আঙুলে কী যেন একটা নরম কাপড়ের মতো ঠেকল। তাহলে কিছু আছে বলে

মনে হচ্ছে যেন? বের করে দেখবে নাকি? ঘরের দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাপড়টায় মারল এক টান, মাটি সরিয়ে টেনে বের করল একটা পুঁটলি।

মাটি ঝেড়ে মিশা পুঁটলিটা খুলল। রোদে ঝক্‌মক্‌ করে উঠল একটা ছোরার ইস্পাতের ফলা। ছোরা! এ রকম ছোরা তো জাহাজের অফিসারদের কাছে থাকে। তিনটে দিক ধারালো, খাপ নেই। হলদে-হয়ে-যাওয়া বাঁটটার ওপর পেঁচিয়ে রয়েছে একটা ছোট্ট ব্রোঞ্জের সাপ—সাপটার মুখ হাঁ করা, জিভটা লকলকিয়ে বাড়িয়ে রেখেছে ওপর পানে।

নেহাৎই সাধারণ একটা জাহাজী ছোরা। কিন্তু এটা লুকিয়ে রেখেছে কেন পলেভোয়? আশ্চর্য তো! খুবই অদ্ভুত ব্যাপারটা। আরেকবার ছোরাটা খুঁটিয়ে দেখল মিশা। তারপর কাপড়ে জড়িয়ে কুকুরের বাক্সের নিচে যেমন ছিল তেমনি মাটি চাপা দিয়ে রেখে ফিরে গেল দরজার দিকে।

আশেপাশের বাড়ির উঠোনের ফটকগুলো খুলে যেতে থাকে খটাস্‌ খটাস্‌ করে। লেজ দোলাতে দোলাতে গরুগুলো ভারিক্কি চালে হেলে দুলে রাস্তায়-চলা পালের সঙ্গে গিয়ে মিলল। গরুগুলোর পেছন পেছন আসছে একটা ছেলে। গায়ের লম্বা ধুকড়ি কোটটা ওর খালি পায়ের গোড়ালি অবধি নেমে এসেছে। মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি। গরুগুলোকে চেঁচিয়ে হুকুম-হাকাম করছে আর বেশ পাকা হাতে একটা চাবুক ঘোরাচ্ছে শপ্‌ শপ্‌ করে। চাবুকের ছিলাটা ধুলোর মধ্যে ওর পেছন পেছন সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে।

অলিন্দে বসে মিশা গুল্‌তি বানাচ্ছিল আর ভাবছিল ছোরাটার কথা। ছোরাটার এমনিতে কোনো বিশেষত্ব নেই, কেবল ওই ব্রোঞ্জের ছোট সাপটা ছাড়া। কিন্তু পলেভোয় ওটা লুকিয়ে রেখেছে কেন?

গুল্‌তি বানানো শেষ হল। গেঙ্কার চেয়েও যে ভালো হয়েছে, তাতে ওর কোনো সন্দেহই নেই। পরখ করবার জন্য একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ল রাস্তার দিকে যেখানে একদল চড়ুই লাফালাফি করছিল। তাক্‌টা ফস্কে গেল! উড়ে গিয়ে চড়ুইগুলো বসল পাশের বাড়ির বেড়াটার ওপর। আরেকবার তাক্‌ করতে

গিয়েছিল মিশা, কিন্তু সামলে গেল বাড়ির ভেতর পায়ের শব্দ শুনে। চুল্লির ঢাকনার খর খর আওয়াজ আর জলের টবের ছপ্‌ছপানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। জামার নিচে গুল্‌তিটা লুকিয়ে রান্নাঘরে চলল মিশা।

বেঞ্চির ওপর থেকে বড়ো বড়ো চেরীফলের ঝুড়িগুলো টেনে সরাচ্ছিলেন দিদিমা। তেলচিটে একখানা ড্রেসিং গাউন পরেছেন, চাবির ভারে পকেটগুলো ঝুলে পড়েছে। ফুলো মুখখানার মধ্যে দুশ্চিন্তার ছাপ, কুঁচকে ভাঁজ পড়ে গেছে চামড়ায়। চোখে কম দেখতে পান বলে সামান্য ট্যারা ছোট ছোট চোখগুলো পিট পিট করছে।

মিশা ঝুড়িতে হাত দিতেই দিদিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ্যাই হাত সরা! দেখ না আস্পদ্দা... নোংরা হাত লাগিয়েছে!'

'কি কঞ্জুষ! খেতে চাই আমি!' বিড়বিড়িয়ে উঠল মিশা।

'পরে পাবি অখন। যা তো, আগে হাত মুখ ধুয়ে আয় তো।'

চৌবাচ্চার কাছে গেল মিশা। চৌবাচ্চার নিচে হাতের তেলোদুটো অল্প ভিজিয়ে নিয়ে নাকের ডগাটা ছুঁল। তোয়ালের গায়ে হাত মুছে ঢুকল খাবার ঘরে।

দাদামশাই আগেই এসে বসেছিলেন তাঁর চিরদিনের সেই বাঁধা আসনটিতে— ফুলের নক্‌শা-আঁকা বাদামি অয়েলক্লথে ঢাকা লম্বা টেবিলের মাথায়। সাদাচুলো বুড়ো মানুষ। পাতলা দাড়ি, গোঁফজোড়া লালচে। যখন মিশা এল উনি তখন এক টিপ নস্যি তুলে নাকের গর্তে পুরছিলেন আর হলদে একখানা রুমালে নাকটা চেপে হাঁচ্‌ছিলেন। ঝলমলে চোখে হাসি যেন উপচে পড়ছে, দরদমাখা উজ্জ্বলতায়-ভরা চোখের ভাঁজগুলো। গায়ের কোর্তা থেকে একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে— গন্ধটা একান্তই তাঁর নিজস্ব।

তখনো সকালের খাবার দেওয়া হয়নি। সময়টা কাটাবার জন্য মিশা ওর নিজের প্লেটখানা ঠেলে দিল অয়েলক্লথে আঁকা একটা গোলাপফুলের ঠিক মাঝখানটায়, তারপর কাঁটা দিয়ে ওটার ধারে গোল একটা নকশা কাটল।

অয়েলক্লথে একটা কড়া আঁচড় পড়ল। পেছন থেকে জোরে শোনা গেল পলেভোয়ের ফুর্তিভরা গলা, 'মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ মশাই, প্রাতঃপেন্নাম জানবেন!'

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পলেভোয়।

ধূর্ত চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে মিশা জবাব দিল, 'নমস্কার সের্গেই ইভানভিচ্।' পলেভোয় নিশ্চয় আঁচই করতে পারেনি মিশা ওই ছোরাটার খবর রাখে!

দিদিমা যখন সামভার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিশা তখন কনুই দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল অয়েলক্লথের আঁচড়-কাটা দাগটা।

দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'সেনিয়া কোথায়?'

দিদিমা জবাব দিলেন, 'গুদামঘরে। সময় আর পেল না! এখন মাথায় ঢুকেছে বাইসিকেলখানা মেরামত করবে।'

দিদিমার কথা শুনে আঁতকে উঠল মিশা। টেবিল থেকে কনুইটা সরিয়ে নিল। এখন আর আঁচড়-কাটার কথা খেয়াল নেই। বাইক মেরামত করতে গেছে? কপালে যে কী আছে! সারা গরমকালটা একবার বাইকের কাছে যাবার নামও করেনি আর ঠিক আজই কিনা মনে পড়ল মেরামত করার কথা। এখন তো টিউবটা তার চোখে পড়বেই। তারপরেই শুরু হবে এক মহা ঝামেলা।

সেনিয়ামামা সত্যিই এক আপদ! মিশা যদি দিদিমার কোনো লোকসান করত তাহলে কথা ছিল না — দু-চারটে ধমক, গালিগালাজ, ব্যস্। কিন্তু সেনিয়ামামা? সে বান্দাই নয়! তার কায়দাটা হল ঠোঁট কুঁচকে একটা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়া। এরকম ব্যাপার ঘটলেই সে তাকিয়ে থাকে মিশার মাথার ওপর দিয়ে অন্য কোনো দিকে, চশমাজোড়া হরদম নাড়াচাড়া করে আর অনবরত একবার পরে আর একবার খোলে, আর ওর ইস্কুল-জীবনের পোষাকটার গিল্টি-করা বোতামগুলো ধরে খালি টানে। মিশা বুঝতেই পারে না, এখনো কেন সে ওই পোষাকটা পরে? ইস্কুল থেকে তো অনেকদিন হল তাকে তাড়ানো হয়েছে 'গোলমাল বাধানোর' অভিযোগে। সেনিয়ামামার মতো অমন একটি ভদ্রস্বভাব মানুষ কী গোলমাল

বাধাতে পারে জানতে পারলে মন্দ হত না! মামার মুখখানা ফ্যাকাশে, গম্ভীর। ছোট্ট একজোড়া গোঁফ আছে। খেতে বসে সাধারণত সে বইয়ের ওপর আড়চোখে চেয়ে খুব অন্যমনস্কভাবে খায়।

গুদামঘরে বাইসিকেলের ঝন্‌ঝনানি শুনে মিশা আবার চমকে ওঠে।

হাতে সেই ছেঁড়া টিউবখানা নিয়ে সোনিয়ামামা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই মিশা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে, চেয়ারটা উল্‌টে ফেলে দিয়ে মারে ভোঁ দৌড় বাড়ির বাইরে।

২

অগরোদনায়া আর আলেক্সেয়েভস্কায়া পাড়ার ছেলেরা

উঠোনের ভেতর দিয়ে ছুটে বেড়াটা ডিঙিয়েই মিশা পাশের অন্য এক পাড়ার রাস্তায় গিয়ে পড়ে — অগরোদনায়া*। ওর নিজের পাড়ার রাস্তা আলেক্সেয়েভ্‌স্কায়া থেকে এ রাস্তা মাত্র একশ গজ দূরে। কিন্তু তাহলে কী হয় — অগরোদনায়া পাড়ার ছেলেরা আলেক্সেয়েভস্কায়া পাড়ার ছেলেদের চিরকালের দুশমন। মিশাকে দেখতে পেয়েছে কি চারদিক থেকে ছুটে এল ওরা মহাফুর্তিতে হৈ-হৈ করে, শিস্‌ কেটে — আলেক্সেয়েভস্কায়া পাড়ার একটি ছোকরাকে পেটানো যাবে, তার ওপর ছোকরা আবার মস্কোওয়ালা — সোনায় সোহাগা!

চট্‌পট্‌ বেড়াটার ওপর ফের উঠে মিশা দু'পা দুদিকে ঝুলিয়ে দিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

'কীরে? ধরতে পারলি তো? হতচ্ছাড়া সব্‌জি-বাগানের কাগতাড়ুয়া রে!'

এর চেয়ে মারাত্মক অপমানের কথা আর হয় না। এক ঝাঁক ঢিল এসে পড়ল ওর ওপর। বেড়া ডিঙিয়ে সুট্‌ করে নেমে দাঁড়াল মিশা। কপালটা যেন ফুলে ঢোল

---

* অগরোদনায়া — রুশ কথা 'অগরোদ' থেকে, মানে সব্‌জি-বাগান।

হয়ে উঠেছে মনে হল। কিন্তু তখনো ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর। ঢিলগুলো পড়েছে ওদের বাড়িটার সামনেই। আর তখুনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ওর দিদিমা। ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য চোখ কুঁচকে একবার দেখেই উনি বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে কাকে যেন ডাকলেন। খুব সম্ভব সেনিয়ামামাকে। বেড়ার ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াল মিশা।

চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'এ্যাই-ও। দাঁড়া একটু! তোদের একটা কথা বলতে চাই।'

বেড়ার ওপাশ থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'কীসের কথা?'

'আগে ঢিল ছোঁড়া তো থামা!' বেড়ার ওপর আরেকবার উঠে সাবধানে ছেলেগুলোর হাতের দিকে চেয়ে বলল মিশা। 'একজনের সঙ্গে এতজনে মিলে লাগলে চলবে কেন? ন্যায্য বিচার কর — একজনের সঙ্গে একজন।'

পেৎকা — 'মোরগ' নামে বছর পনেরোর একটা গাঁট্টাগোট্টা ছেলে ছেঁড়া কোর্তাটা ছুঁড়ে ফেলে মারমুখো হয়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে বলল, 'বেশ তো, আয় না দেখি!'

মিশা আগে থেকে বলে রাখল, 'ঠিক করে নিস আমরা যখন লড়ব আর কেউ যেন মাথা গলাতে না আসে।'

'বেশ, বেশ, নেমে আয়!'

অলিন্দে ততোক্ষণে সেনিয়ামামা এসে দাঁড়িয়েছে দিদিমার পাশে। বেড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল মিশা। সঙ্গে সঙ্গে 'মোরগ' এসে রুখে দাঁড়াল সামনে। লম্বায় সে মিশার প্রায় দু'গুণ।

পেৎকার বেল্টের লোহার বকলসে আঙুলের খোঁচা দিয়ে মিশা বলল, 'এই! এটা আবার কেন?' লড়াইয়ের কানুনে আছে লড়িয়েদের পোষাকের ভেতর কোনোরকম লোহা-টোহার জিনিস থাকা চলবে না। 'মোরগ' তাই বেল্ট্‌খানা খুলে ফেলল। তার বাপের ঢিলে পাৎলুনটা প্রায় খসে পড়ার জোগাড়। একহাতে সেটা চেপে ধরে ও যখন অন্য কারুর দেওয়া একগাছি দড়ি বাঁধছে কোমরে, সেই

ফাঁকে মিশা চারপাশের ছেলেদের ধাক্কা দিয়ে হঠিয়ে লড়াইয়ের গণ্ডিটা আরো বড়ো করে নিচ্ছিল।

বলছিল, 'আরো একটু জায়গা ছাড় দিকিনি বাপু!' তারপর হঠাৎ একটা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সটান দে লম্বা।

ছেলেরা হৈ-হৈ করে শিস কেটে ছুটে এল পেছন পেছন। দলের পেছনে পাৎলুন ধরে ছুটল 'মোরগ' — হতাশ হয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি!

যতোজোর পা চলে ছুটতে লাগল মিশা। রোদে ওর খালি পায়ের গোড়ালিগুলো অবধি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পেছন থেকে পায়ের দুপ্দাপ্ আওয়াজ কানে আসছিল মিশার, ওরা সবাই দারুণ হাঁপাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। চট্ করে হঠাৎ মোড় ঘুরেই মিশা একটা ছোট্ট গলির ভেতর গিয়ে পড়ল — নিজের রাস্তায় এসে পড়েছে এবার। আলেক্সেয়েভস্কায়া পাড়ার ছেলেরা ছুটে এল ওকে উদ্ধার করতে, কিন্তু লড়াই না দিয়েই পিঠ্টান দিল ভিন্ পাড়ার ছোকরাগুলো।

লাল-চুলো গেংকা জিজ্ঞেস করল, 'কীরে, কোত্থেকে এলি?'

মিশা জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল।

যেন গ্রাহ্যিই নেই এমনিভাবে বলল, 'অগরোদনায়া পাড়ায়। "মোরগের" সঙ্গে জোর একহাত লড়ে প্রায় জিতে গিয়েছি এমন সময় ওরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

অবিশ্বাসের সুরে গেংকা বলল, '"মোরগের" সঙ্গে লড়েছিলি? তুই?'

'তা না তো কে? তুই? বড্ড শক্ত চীজ কিন্তু ছোকরা, কেমন গুঁতো দিয়েছে দ্যাখ্ না,' বলে কপালে হাত বুলোল মিশা।

বীরত্বের পুরস্কার কালসিটে দাগটার দিকে বন্ধুরা সবাই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়ে দেখল।

মিশা তখন বলেই চলেছে, 'আমায় যাতে না ভোলে সেরকম একখানা আমিও অবিশ্যি কষিয়েছি ওকে। আর ওর গুল্তিটাও কেড়ে নিয়েছি।'

জামার ভেতর থেকে লম্বা লাল রবারওয়ালা একখানা গুলতি টেনে বের করল মিশা।

'তোরটার চেয়ে অনেক গুণ ভালো এটা, বুঝলি!'

তারপর গুলতিটা লুকিয়ে রেখে যে মেয়েরা কাদামাটি দিয়ে পিঠে বানাচ্ছিল তাদের দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকাল।

ঠাট্টা করে গেঙকাকে বলল, 'আর তুই এদিকে কী কচ্ছিস? লুকোচুরি খেলা, চোর-চোর খেলা — অ্যাঁ? "বাঘ দেখে কে ভয় পেয়েছ, বাঘ দেখে কে ভয় পেয়েছ ..." '

'কী ভেবেছিস আমায়!' কপালের ওপরের লাল চুলগুলো ঝাঁকিয়ে গেঙকা বলে উঠল। তারপর কী ভেবে মুখখানা লাল করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, 'আয়, চাকু খেলি!'

'আঙুল দিয়ে পাঁচটা টোকা, কিন্তু থুতু দিয়ে ভিজিয়ে!'

'ব্যস্, তাই হবে।'

তক্তার পাটাতনে বসে একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি পালা করে মাটিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল দু'জন: সোজা মার, হাতের তেলো দিয়ে মার, দূর থেকে মার, কাঁধের ওপর দিয়ে মার, সাদাসিধে মার ...

মিশাই প্রথম দশটা মার শেষ করল। গেঙকা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল হাতটা। এবার মিশা ভয়ানক চেহারা করে দুটো আঙুলে থুতু লাগিয়ে উঁচু করে ধরল। পাঁয়তারা কষে দাঁড়াতে যে ক'সেকেণ্ড সময় লাগে গেঙকার কাছে সেটুকুই মনে হচ্ছিল বুঝি অনন্ত কাল! কিন্তু মিশা ওকে ঘায়েল করল না।

হাতটা নামিয়ে বলল, 'থুতুটা শুকিয়ে গেছে।'

আবার নতুন করে ভিজিয়ে নিতে লাগল আঙুল। প্রত্যেকটা মারের আগেই এইভাবে থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া চলতে থাকল। শেষ অবধি পাঁচটা দানই কাবার করল মিশা। গেঙকার চোখে জল ঠেলে আসছিল — ব্যথায় টন্‌টন-করা হাতে ফুঁ দিতে দিতে কেবলই চেষ্টা করছিল জলটা ঠেকিয়ে রাখতে। হাত একেবারে নীল হয়ে গেছে।

আকাশ বেয়ে সূর্য যতোই উপরে উঠছে, ছায়াগুলো ততো ছোট হতে হতে যেন বেড়ার গায়ে লেপ্‌টে যেতে চাইছে। রাস্তাটা নিঝুম — নিস্তব্ধ গরমে যেন নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। দম-আটকানো হাওয়া। ছেলেরা ঠিক করল সাঁতার কাটতে যাবে। দুদ্দাড় করে তারা ছুটল দেস্না নদীর দিকে।

চাকার শুকিয়ে দাগ বসে যাওয়া সরু রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গেছে ক্ষেতজমির ভেতর দিয়ে—সব্‌জে-হলুদ চারকোণা জমিগুলো ছড়িয়ে আছে সবদিকে। মাঝে মাঝে যেন নিচু হয়ে নেমে গেছে, আবার কখনো পাহাড় বেয়ে উঠেছে চৌকোগুলো, তারপর ক্রমান্বয়ে গোল গোল হয়ে দূরে গিয়ে মিশেছে ধনুকের মতো একটা চওড়া বাঁক নিয়ে — সেই বাঁকের পিঠে দাঁড়িয়ে আছে বনজঙ্গল, দূরে দূরে ছড়ানো-ছিটোনো গোলাঘর আর থম্‌থমে মেঘ।

মাথা উঁচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গমগাছগুলো। ছেলেরা গমের শিষ ছিঁড়ে দানা চিবোল, জিভের তালুতে খোসা আট্‌কে গেলে সজোরে থুতু করে ফেলে দিল। গমের ক্ষেতে খর খর আওয়াজ ওঠে, ভয় পেয়ে পাখির ঝাঁক উড়ে যায় — বলতে গেলে ওদের পায়ের তলা থেকেই।

নদীর ধারে ছেলেরা একটা বালিভরা জায়গা বেছে নিল। কাপড়-চোপড় খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। প্রকাণ্ড ফোয়ারার মতো জল ছিটকে ওঠে। ওরা সাঁতার কাটে, ডুব দেয়, কুস্তি লড়ে। নড়বড়ে একটা পোলের ওপর থেকে জলে ঝাঁপ দেয়। শেষ-মেষ ফের নদীর ধার বেয়ে উঠে এসে গরম বালির ভেতর গা ডুবিয়ে শুল।

গেংকা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মিশা, মস্কোতে নদী আছে?'

'হ্যাঁ। মস্কো নদী। সে তো তোকে প্রায় হাজার বার বলেছি।'

'মানে শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কেমন করে সাঁতার দিস?'

'লেঙ্গট পরে। লেঙ্গট না হলে নদীর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবি না। ঘোড়ায় চড়ে মিলিশিয়ার* লোক নজর রাখে কিনা।'

অবিশ্বাসভরে মুখ টিপে হাসল গেঙ্কা।

'অমন মুখ বেঁকিয়ে হাসছিস যে বড়ো?' চটে গিয়ে মিশা বলল, 'জীবনে তো কোনোদিন তোদের এই রেভ্স্ক ছাড়া আর কিছু দেখিস্নি, তবে মুখ বেঁকিয়ে হাসছিস কেন!'

কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকল মিশা। তারপর নদীর দিকে একপাল ঘোড়া এগিয়ে আসছে দেখে বলল, 'আচ্ছা এবার বল্তো দেখি: কোন্ ঘোড়া সবচেয়ে ছোট?'

কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই জবাব দিল গেঙ্কা, 'কেন, ঘোড়ার বাচ্চা।'

'এই তো, বলতে পাল্লি না! সবচেয়ে ছোট ঘোড়া হল টাট্টু। শেট্ল্যাণ্ডের টাট্টু কুকুরের মতো, জাপানের টাট্টুগুলো তো প্রায় বেড়ালের মতো।'

'যাঃ, চাল্ মারছিস!'

'কে? আমি? যদি কোনোদিন সার্কাস দেখতে যেতিস তাহলে আর তক্কো তুলতিস না। কোনোদিন তো সার্কাসে যাসনি, অ্যাঁ? স্বীকার কর্ — যাসনি তো?.. এই তো! ফের আবার তক্কো করিস!'

একটু থেমে কী যেন ভাবল গেঙ্কা।

বলল, 'ওরকম ঘোড়ায় কোনো কাজ হয় না। ঘোড়সওয়ার সেপাইদের কাজে লাগে না, কোনো কাজে লাগে না।'

'ঘোড়সওয়াররা কী করবে ও দিয়ে? তুই কি ভাবিস লোকে শুধু ঘোড়ায় চেপেই যুদ্ধ করে? তাহলে শুনে রাখ্ — একজন নাবিক তিন-তিনটে ঘোড়সওয়ারের সমান।'

---

* সোভিয়েত দেশে পুলিশ নেই। শান্তিরক্ষকদের 'মিলিশিয়া' বলে ডাকা হয়।

গেঙ্কা বলল, 'আমি তো নাবিকদের কথা তুলছি না। কিন্তু ঘোড়সওয়ার বাদ দিয়ে কেমন করে চলবে? নিকিৎস্কির দলের সব্বাই তো ঘোড়ায় চড়ে।'

বিদ্রূপ করে ঠোঁট কুঁচকে মিশা বলল, 'বেশ তো, তাতে কী হয়েছে! পলেভোয় ওই নিকিৎস্কিটাকে শীগগিরই পাকড়াবে দেখে নিস।'

'অতো সোজা নয়।' গেঙ্কাও সমান তালে জবাব দিল, 'এই তো একবছর ধরে চেষ্টা করছে পাকড়াও করতে। পেরেছে?'

'নিশ্চয় পারবে।' মিশা জোর দিয়ে বলল।

'বলতেই সোজা।' মুখটা তুলে জবাব দিল গেঙ্কা, 'কিন্তু রোজই তো ট্রেন ওড়াচ্ছে নিকিৎস্কি। বাবাও ইঞ্জিন চালাতে ভয় পাচ্ছেন আজকাল।'

'ঘাবড়াসনি। ও ঠিক ধরা পড়বে।'

হাই তুলে মিশা আরও বেশি বালির ভেতর ঢুকে গেল। চোখ বুজে পড়ে থাকে। গেঙ্কাও ঝিমুচ্ছিল। এই গরমে ওদের আর ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছিল না। নিস্তব্ধ স্তেপের মাঠ যেন অলসভাবে সরে সরে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে — কাঠফাটা রোদটাকে এড়িয়ে পালাতে চায় যেন।

৩

ঘটনা আর কল্পনা

গেঙ্কা বাড়ি গেছে খেতে। মিশা কিন্তু ছুটল উক্রেনীয় বাজারের ভীড় আর হৈ-হট্টগোলের মধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে বাজারের ভেতর ঘোরাঘুরি করল।

গাড়ির ওপর গাদা করে রাখা সবুজ শশা, লাল টমেটো আর বেতের ঝুড়ি বোঝাই বেরি। শুয়োরের গোলাপী বাচ্চাগুলো চ্যাঁ চ্যাঁ করে চিৎকার করছে, বড়ো বড়ো ডানা ঝাপ্টাচ্ছে সাদা রাজহাঁস, একটানা জাবর কাটছে কুঁড়ে বলদগুলো, মুখের চটচটে লালা গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। এ সবই দেখল মিশা। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ে গেল মস্কোর সেই টক রুটির কথা, আলুর খোসা দিয়ে তার বদলে জোলো দুধ মিলত, সেই কথা। মস্কোর জন্য ওর

মনটা কেমন করে উঠল — সেই ট্রামগাড়ি, সন্ধেবেলায় রাস্তার বাতির সেই অস্পষ্ট আলো।

অথর্ব একটি লোক বসে বেঞ্চির ওপর তিনটে পুঁতি গড়াচ্ছিল। সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিশা। পুঁতি তিনটের রকমারি রং — লাল, সাদা আর কালো। অঙ্গুস্তানা দিয়ে একেকটা পুঁতি ঢেকে রেখে লোকটা রং জিজ্ঞেস করছিল, বলতে পারলে পুরস্কার। কিন্তু ঠিক রংটা ধরাই যাচ্ছিল না।

যারা হেরে যাচ্ছিল তাদের বিনীতভাবে জানিয়ে দিচ্ছিল পঙ্গু লোকটা, 'বন্ধুগণ, আমি যদি প্রত্যেকের কাছেই হার মানতে থাকি তাহলে যে আমার শেষ পাখানাও বেচে দিতে হবে! সেটা আপনাদের বোঝা উচিত!'

মিশা এক মনে পুঁতিগুলো লক্ষ্য করছে, এমন সময় হঠাৎ ওর কাঁধের ওপর কে যেন হাত রাখল। ঘুরেই দেখে দিদিমা দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে।

নাছোড়বান্দার মতো মিশার কাঁধটা চেপে ধরে উনি কড়া গলায় বললেন, 'সারাদিন কোথায় ছিলি রে?'

'সাঁতার কাটছিলাম।' বিড়বিড় করে বলল মিশা।

'সাঁতার কাটছিলাম!' দিদিমা ওর কথাটাই উচ্চারণ করলেন আবার। 'দ্যাখ না মজাটা! বলে কিনা সাঁতার কাটছিল! বেশ, চল বাড়ি, কথা হবে।'

সওদার ঝুড়িটা ওর হাতে দিলেন। দু'জনে বাড়ির দিকে চলল।

দিদিমা হাঁটছিলেন নীরবে। গায়ে রসুন পেঁয়াজ আর ভাজাভুজি সেদ্ধ জিনিসের গন্ধ — রান্নাঘরের সব গন্ধ মিলে যেমন হয়ে থাকে।

দিদিমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মিশা ভাবল, 'আমায় নিয়ে কী করবে ওরা?' ফ্যাসাদে পড়েছে, সে তো দেখতেই পাচ্ছে। ওর সঙ্গে লাগবে এখন দিদিমা আর সেনিয়ামামা। ওর দিকে আছে দাদু আর পলেভোয়। কিন্তু পলেভোয় যদি বাড়িতে না থাকে? তার মানে শুধু দাদু। আর দাদু যদি ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে? ওর পক্ষে দাঁড়াবার কেউ থাকবে না, দিদিমা আর সেনিয়ামামা তো একেবারে স্বরাজ পেয়ে যাবে। দু'জনে মিলে পালা করে বক্তৃতা ঝাড়বে।

সেনিয়ামামার বলার সময় দিদিমা জিরিয়ে নেবেন, আবার দিদিমা বলতে থাকলে সেনিয়ামামা জিরোবে।

এহেন কথা নেই যা ওরা না শুনিয়ে ছাড়বে! বলবে ভদ্রতা কি বস্তু ও জানে না, বলবে কোনো কাজই কোনোদিন হবে না ওর দ্বারা। পরিবারের কলঙ্ক ও। মা ওকে নিয়ে আর পারে না — এতদিন মাকে মরণের দুয়ারে ঠেলে দিতে না পারলেও এবার বাকি ক'টা দিনের মধ্যেই সে কাজ সারবে (মিশা ভালো করেই জানে এ তারা বলবেই, যদিও মা রয়েছে মস্কোয় আর প্রায় দু'মাস হল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই)। ও যে কেমন করে বেঁচে আছে দুনিয়ায় সেইটেই নাকি এক আশ্চর্য ব্যাপার। এমনি আরও কতো কিছুই বলবে তারা ...

বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে ঝুড়িটা রাখল মিশা, তারপর গেল খাবার ঘরে। জানলার কাছে বসে সোফায় শুয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দাদামশাই শুনছিলেন সেনিয়ামামার কথা। রাজনীতির হালচাল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। মিশা যখন ঢুকল, চোখ ফিরিয়ে একবার দেখলও না ওরা। ইচ্ছে করেই বোধ হয়! মিশাকে লজ্জা দেবার জন্য, দেখাবার জন্য যে ওর দিকে নজর দেওয়াটা নেহাৎই সময়ের অপব্যয়। মানুষকে কষ্ট দেবার এই হল কায়দা সেনিয়ামামার। মিশার দিক থেকে বলতে গেলে অবিশ্যি ও এখন যা খুশি তাই করতে পারে। বরং এতে ওর উপকারই হল, কারণ সেনিয়ামামা যতোক্ষণে বক্তৃতার জন্য তৈরী হবে ততোক্ষণে পলেভোয়ও এসে পড়বে। একটা চেয়ারে বসে মিশা ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকে।

দুয়েকটা কথা শুনেই বোঝা গেল সেনিয়ামামা আবার একটা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। মাখ্‌নো ডাকাত নাকি অনেক কটা শহর দখল করে নিয়েছে, আর আন্তোনভ নামে আরেক দস্যু তাম্বভ্‌ শহরের একেবারে কিনারায় এসে হাজির হয়েছে। এই নিয়ে এত ঘাবড়াবার যে কী আছে! গেল বছরেও পোল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীরা যখন কিয়েভ শহর দখল করে আর ভ্‌রাঙ্গেল্‌ ঢোকে দন্‌বাস্‌ এলাকায়, তখনও সেনিয়ামামা এমনি আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তারপর কী দাঁড়াল ব্যাপার? লাল ফৌজ সবগুলোকে গুঁড়ো করে দিল। এর আগেও ছিল দেনিকিন,

কল্‌চাক, য়ুদেনিচ, এবং আরো অনেক শ্বেতরক্ষী সেনাপতি। তাদেরও লাল ফৌজ খতম করেছিল। এবারও এদের খতম করে দেবে।

মাখনো আর আন্তোনভের পর নিকিৎস্কির কথা তুলল সোনিয়ামামা।

ছাত্র-পোষাকের কলারের বোতামটা খুলতে খুলতে বলল, 'নিকিৎস্কিকে কিন্তু ডাকাত বলা চলে না। তার ওপর শুনতে পাই ও নাকি রীতিমতো লেখাপড়া-জানা মানুষ, এককালে জাহাজী ফৌজের অফিসার ছিল।'

কী বলল? নিকিৎস্কি ডাকাত নয়? রাগে রী রী করে উঠল মিশার শরীর। তবে যে নিকিৎস্কি গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কমিউনিস্টদের মারছে, কমসমোলের সদস্য আর কারখানার মজুরদের মারছে— সে তাহলে কী? ডাকাত আর কাকে বলে? সোনিয়ামামার বক্‌বকানি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়!

অবশেষে পলেভোয় এল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মিশা। নাহোক্ কাল অবধি তো ওর শাস্তিটা পেছিয়ে যাবে এবার!

জুতো জামা খুলে হাত-মুখ ধুল পলেভোয়। তারপর সবাই বসল খেতে। পলেভোয়ের হাসিতে গম্ গম্ করে ওঠে ঘরখানা। দাদামশাইকে ও 'বাবা' বলে আর দিদিমাকে ডাকে 'মা' বলে। মজা করে মিশার দিকে তাকিয়ে চোখ মট্‌কায় আর ডাকে 'মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ' বলে। খাওয়ার পর ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দরজার সিঁড়িতে বসল।

সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসে মাটিতে। দূরে একদল মেয়ে গান গাইছে, ওদের গানের একেকটা কলি শোনা যাচ্ছে সিঁড়ি থেকে। সব্‌জি-বাগানে কোথাও কুকুরগুলো এক নাগাড়ে চেঁচাচ্ছে।

মাখোরকায় ঠাসা একখানা পাইপে টান দিতে দিতে পলেভোয় গল্প করছিল — দেশবিদেশে ভ্রমণের গল্প, সমুদ্রের জাহাজে বিদ্রোহের গল্প, ক্রুজার আর সাবমেরিনের গল্প। ইভান পদ্দুবনি আর কালো, লাল, সবুজ মুখোস-পরা নামজাদা সব কুস্তিগীরদের কথাও বলছিল সে। পালোয়ানরা নাকি গাড়ি সমেত তিন-তিনটে ঘোড়া মাথার ওপর টেনে তুলত — প্রত্যেকটা গাড়িতে থাকত দশজন করে লোক।

মিশা অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। নিস্তব্ধ রাস্তাটার পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কালো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। টিমটিমে নারঙ্গী আলো আসছে সেই অন্ধকার থেকে।

পলেভোয় এবার 'সম্রাজ্ঞী মারিয়া' জাহাজের কথা তুলল। মহাযুদ্ধের সময় ওই জাহাজটিতেই কাজ করত সে।

'সম্রাজ্ঞী মারিয়া' ছিল প্রকাণ্ড জাহাজ। কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ। ১৯১৫ সালের জুন মাসে জাহাজটা প্রথম জলে ভাসে আর ১৯১৬ সালের অক্টোবরে সেভাস্তোপলের কাছে ডাঙা থেকে আধমাইল দূরে বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়।

পলেভোয় বলল, 'ব্যাপারটার পেছনে খারাপ চক্রান্ত ছিল। মাইন কিংবা টর্পেডোর ঘায়ে জাহাজটা ডোবেনি, ভেতর থেকেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পয়লা নম্বরের বুরুজের ভেতর প্রায় আটচল্লিশ টন বারুদ ছিল, আর সেটাই প্রথম ফাটে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা বারুদ রাখার জায়গা ফাটতে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে গোটা জাহাজটাই তলিয়ে যায় জলের নিচে। নাবিকদের অর্ধেকেরও কম বেঁচে ছিল, সবাই সাংঘাতিক রকম পুড়ে যায় নয় জখম হয়।'

মিশা জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজটা তাহলে উড়িয়ে দিয়েছিল কারা?'

চওড়া কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে পলেভোয় বলল, 'বহু লোকই তো চেষ্টা করেছিল ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তারপর এল বিপ্লব।

কৈফিয়ৎ যদি চাইতে হয় তো জারের নৌসেনাপতিদের জিজ্ঞেস করতে হবে।'

হঠাৎ মিশা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সের্গেই ইভানভিচ, বলুন তো কে বড়ো — সম্রাট না জার?'

তামাকে হলদে থুতু ফেলে পলেভোয় বলল, 'হুম!.. ও দুই-ই সমান।'

'আর সব দেশেও কি এখনো জার আছে?'

'হ্যাঁ, দুয়েকটা দেশে আছে বৈকি।'

মিশা ভাবল, 'ছোরার কথাটা জিজ্ঞেস করব নাকি? নাঃ, না বলাই ভালো। হয়তো ভাববে আমি ইচ্ছে করেই ওর পেছু নিয়েছিলাম।'

একটু বাদে সবাই বাড়ির ভেতর ঢোকে। দিদিমা রোজকার মতো সন্ধ্যের সময় ঘুরে ঘুরে জানলার খড়খড়ি টেনে দিতে থাকেন। লোহার ছিট্‌কিনিগুলো যেন হুঁশিয়ারি জানিয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। খাবার ঘরে ঝোলানো কেরোসিন-বাতিটা নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোর আশেপাশে ভিড়-জমানো প্রজাপতি আর অদ্ভুত পোকার দল অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ বিছানায় জেগে থাকে মিশা।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পান্ডুর চাঁদের আলো সরু রেখার মতো নেমে এসেছে। রান্নাঘরের উনোনের পেছনে একটা উচ্চিংড়ে চিক্‌ চিক্‌ করতে লাগল।

ওদের মস্কোতে কিন্তু উচ্চিংড়ের বালাই নেই। অতো বড়ো ঘর, ওইরকম হট্টগোলে রাতবিরেতেও লোকজন আসছে যাচ্ছে, দরজায় দড়াম্‌ দড়াম্‌ শব্দ করছে, ইলেকট্রিকের বোতাম টিপছে — তার মধ্যে উচ্চিংড়ে আসবেই বা কোথা থেকে? তাই ওর দাদামশাইয়ের বাড়িতেই শুধু শান্ত ঘরে একা শুয়ে নানা কিছু কল্পনা করতে করতে ও উচ্চিংড়ের আওয়াজ শুনতে পায়।

পলেভোয় যদি ওকে ছোরাটা দিত তাহলে কী মজাই না হত! এখন ওর হাতিয়ার নেই বটে, কিন্তু ছোরাটা পেলে? সময়টাও এখন বড়ো ভয়ানক, দেশে ঘরোয়া লড়াই চলছে। উক্রেনের গ্রামগুলোতে ডাকাতের দল হানা দিচ্ছে, শহরগুলোয় অবধি শান্তি নেই। স্থানীয় আত্মরক্ষা বাহিনীর ফৌজীদল রাস্তায়

রাস্তায় টহল দিচ্ছে রাতে। বুলেটশূন্য, মরচে-পড়া ঘোড়াওয়ালা পুরনো রাইফেলই তাদের হাতিয়ার।

মিশা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে একদিন ও লম্বা চওড়া জোয়ান হবে, ঢোলা-বেড়ওয়ালা উর্দি পাৎলুন পরবে, কিংবা তার চেয়েও ভালো হবে পায়ে পট্টি লাগালে — খাকি রঙের চোস্ত ফৌজী-পট্টি।

রাইফেল কাঁধে নেবে, হাত-বোমা, মেশিনগানের বেল্‌ট নেবে আর মশ্‌মশে চামড়ার কোমর-পেটিতে গুঁজবে একখানা রিভলভার।

যে ঘোড়াটায় চড়বে তার রং হবে দাঁড়কাকের পালকের মতো কালো, পাগুলো হবে ছিমছাম, চোখা নজর, পেছনটা সবল তেজীয়ান্, গলাটা খাটো আর গা দিয়ে যেন মাছি পিছলে পড়ে।

তারপর ও ধরবে নিকিৎস্কিকে, নিকিৎস্কির গোটা দলটাকে ভেঙে দেবে। পলেভোয় আর ও যাবে লড়াইয়ে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়বে। বীরের মতো পলেভোয়ের জীবন বাঁচাবে, তারপর নিজে প্রাণ দেবে — সারা জীবন ওর বন্ধু ওর জন্য শোক করবে, কিন্তু মিশার মতো অমন একটি ছেলে সে আর খুঁজে পাবে না কোথাও ...

ভাবতে ভাবতে মিশা ঘুমিয়ে পড়ল।

৪

শাস্তি

সেনিয়ামামার মাথা থেকেই যে শাস্তির এই ফন্দিটা বেরিয়েছে তাতে মিশার সন্দেহ নেই। ও ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল দাদুও ওর দলে ভিড়েছেন।

সকালের খাবার খেতে বসে মিশার দিকে তাকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'কাল খুব মনের সুখে টো টো করে বেরিয়েছিলি তো? বেশ, অন্তত এক হপ্তার মতো সখ মিটে গিয়েছে নিশ্চয়। আজ কিন্তু বাছাধন ঘরের বার হতে পারছিস না।'

সারাদিনটা ঘরে কাটাতে হবে বেফালতু! ঠিক আজকের দিনটাই! রোববারের দিন! সঙ্গীসাথীরা সবাই বনে বেড়াতে যাবে, হয়তো-বা নৌকোয় চেপে ওপারের দ্বীপেও যাবে, অথচ ওকে কিনা ... মুখ বেঁকিয়ে মিশা খাবারের থালার দিকে চেয়ে রইল।

দিদিমা বললেন, 'অমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? বড্ড বেশি শয়তান হয়ে যাচ্ছিস দিনকে দিন।'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাদু বললেন, 'ব্যস্, ঢের হয়েছে। ওর শাস্তি ও পেয়ে গেছে। এখন সব চুকে গেল।'

হতাশ হয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরঘুর করে বেড়াল মিশা। 'কী বিচ্ছিরি পচা জায়গা এটা,' মনে হল ওর।

খাবার ঘরের দেয়ালে তেলরঙা ছবি আঁকা। রঙে চিড় ধরেছে, জলুস চলে গেছে। একটা ছবিতে আছে — প্রকাণ্ড সাদা একটা গাঙচিল নীল ঢেউয়ের ওপর ডানার ঝাপ্টা দিয়ে যাচ্ছে। আরেকটাতে লম্বা ডালের মতো শিঙওয়ালা একটা হরিণ, সিধে পাইনগাছের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে। তিন নম্বরের ছবিতে কয়েকটা এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো পানকৌড়ি দেখা যাচ্ছে। আরেকখানায় উঁচু বুট-পরা দাড়িওয়ালা কয়েকজন শিকারী, মাথার টুপিতে তাদের পালক, কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রাখা বন্দুক আর কার্তুজ-বেল্ট, সামনে কতগুলো শেয়ানা কুকুর মাটিতে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে।

সোফার পেছনের দেয়ালটায় টাঙানো আছে দাদু আর দিদিমার ছবি — ওঁদের যৌবনকালের। দাদুর ইয়া বড়ো গোঁফ, পরিষ্কার কামানো থুতনিটাকে যেন ওপর দিকে ঠেলে রেখেছে কলপ-দেওয়া কোণা তোলা কলারটা। দিদিমার পরনে গলা অবধি ঢাকা কালো পোষাক, গলায় লম্বা চেন, তাতে একটা পদক। মাথার ওপর চুলগুলো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রাখা, প্রায় ছবির ফ্রেমটাকে ছোঁয় আর কি!

মিশা বাড়ির উঠোনের মধ্যে ঢোকে। দুজন করাতী জ্বালানির কাঠ ফালা করছে। করাতের আওয়াজটা ভারি মজার। এদিকে হলদে কাঠের গুঁড়োর একটা আস্তর পড়ে যাচ্ছে করাত-কলের আশপাশের মাটিতে খুব তাড়াতাড়ি।

কুকুরের বাক্সের কাছে সেই কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে মিশা দেখতে লাগল করাতী দু'জনকে। বয়স্ক লোকটার মনে হয় গোটা চল্লিশ বয়েস। মাঝামাঝি চেহারা, গাঁট্টাগোট্টা। ঘেমে-ওঠা কপালটার ওপর কোঁকড়া কালো চুল সেঁটে আছে। অন্য লোকটার বয়েস কম। কটা চুল, বসন্তের দাগ মুখে। ভুরু জোড়া সাদাটে। দেখলে কেন যেন মনে হয় লোকটা ঢিলেঢালা ভোঁতা গোছের।

চুপিচুপি বাক্সের নিচে হাত ঢুকিয়ে মিশা পুঁটলিটা খোঁজে। বের করবে নাকি? আড়চোখে চেয়ে দেখে করাতীদের দিকে। করাত থামিয়ে ওরা কাঠের ওপর বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। বয়স্ক লোকটা একটুকরো কাগজ চটপট করে পাকিয়ে সরু দিকটা বাঁকিয়ে ধরে হাতের তেলো থেকে তামাক ভরে নিল ওর মধ্যে। তারপর ধরাল আগুন। ও যখন সিগারেট টানছে, দ্বিতীয় লোকটা তখন ঝিমোচ্ছে।

চোখ খুলে হাই তুলল লোকটা। বলল, 'ধুত্তোর, বড্ড ঘুম পাচ্ছে!'

বুড়ো লোকটা জবাব দিল, 'তোর ঘুম পেলে তো আর স্থান কাল জ্ঞান থাকে না।'

দু'জনেই চুপ করল। আঙিনাটার ভেতর সবই এখন চুপচাপ। শুধু একটা কাঠের গামলার ওপর তাড়াতাড়ি টুকটুক করে ঠোকরাচ্ছে একদল মুরগি। জল খাচ্ছে ওরা, একেক ঢোঁক খাচ্ছে আর ছোট ছোট লাল ঝুঁটিওয়ালা মাথাগুলো বেশ মজা করে পেছনে হেলাচ্ছে।

করাতীরা উঠে ফের কাঠ ফাড়তে শুরু করল, মিশা সেই ফাঁকে সাবধানে পুঁটলিটা বের করে খুলল। ধারাল ফলাটা হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে — নজরে পড়ে একদিকে একটা নেকড়েবাঘের মূর্তি খোদাই করা — চোখেই পড়ে না এত আবছা সেটা। আরেক দিকে একটা কাঁকড়াবিছা, অন্যদিকে একটা পদ্ম।

নেকড়েবাঘ, কাঁকড়াবিছা, পদ্ম! এ সবের মানে কী?

হঠাৎ ওর কাছেই একটা কাঠের গুঁড়ি এসে পড়ল। ভয়ে ছোরাটা বুকের কাছে চেপে ধরে ও হাত দিয়ে সেটা ঢেকে রাখল।

বয়স্ক লোকটা বলল, 'ওহে খোকা, সরো, নয়তো চোট লেগে যাবে।'

মিশা পাল্‌টা জবাব দিল, 'আমি খোকা নই।'

'ও-হো! জিভে তো দেখছি বেশ ধার!' লোকটা হাসল, 'তা, তুমি কে শুনি? কমিসারের ছেলে?'

'কে কমিসার?'

'পলেভোয়।' বলেই লোকটা কোনো কারণে বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

'না। ও তো আমাদের সঙ্গে থাকে এইমাত্র।'

'বাড়িতে এখন আছে নাকি?' কুড়ুলটা রেখে মিশাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'না। খাবার সময় হলে আসে। তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'না। এই জিজ্ঞেস করব মনে করেছিলাম, তাই।'

সব কাঠ ফাড়া হয়ে যাবার পর দিদিমা ওদের জন্য এক থালায় চর্বির টুকরো, রুটি আর একটু ভদ্‌কা নিয়ে এলেন। কটা-চুলো লোকটা ভদ্‌কাটুকু খেল নীরবে। কিন্তু বয়স্ক লোকটি বেশ তোড়জোড় করেই খেল। 'জয় ভগবান!' বলেই লোকটা গেলাস খালি করল। মুখ কুঁচকে রুটির গন্ধ শুঁকে সজোরে গলা খাঁকারি দিল। বলল, 'হ্যাঁ, এই না হলে খাওয়া!' আর মিশার দিকে চোখ মটকাল।

খাবারটা ধীরে ধীরে খেল দু'জনে—আলগোছে চর্বিটাকে টুকরো টুকরো করে, চুষে চুষে। শেষে একেক পাত্র করে জল খেয়ে চলে গেল।

দিদিমা কিন্তু উঠোনেই রয়ে গেলেন। একটা তেপায়ার ওপর লম্বা কাঠের হাতলওয়ালা প্রকাণ্ড এক পেতলের গামলা রেখে, পালা করে জ্বালানি কাঠ রাখলেন নিচে, ইট দিয়ে হাওয়া আড়াল করার ব্যবস্থা করলেন। তার মানে উনি এখন মোরব্বা জাল দেবেন। কিছুক্ষণ এখানেই থাকবেন তাহলে। মিশা দেখলে ছোরাটা আর আগের সেই জায়গায় রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই, তাই জামার হাতার ভেতর সেটাকে লুকিয়ে ঘরের দিকে চলল।

মিশা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় দিদিমা বিড়বিড় করে বললেন, এই, গোলমাল করিসনে। দাদামশাই ঘুমোচ্ছে।'

মিশা জবাব দিল, 'আস্তে আস্তে যাব।'

ঘরে এসে সোফার গদির তলায় ছোরাটা লুকিয়ে রাখল। দিদিমা উঠোন থেকে সরে গেলেই যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দেবে এই ওর ইচ্ছে। আর যদি তাও না হয় তাহলে সন্ধ্যের সময় অন্ধকার হলে রেখে আসবে।

বাড়িটা এমন নিঝুম যে দেয়ালঘড়ির টক্ টক্ আওয়াজটা অবধি শুনতে পাচ্ছে মিশা। জানলার কাঁচের ওপর একটা মাছি ভোঁ ভোঁ করছে সেটাও। সময় যেন আর কাটতে চায় না।

সেনিয়ামামার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মিশা, দরজায় আড়ি পাতল। সেনিয়ামামা কাশছে, কী সব কাগজপত্র ওল্টাচ্ছে।

ঘরের ভেতর ঢুকে মিশা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সেনিয়ামামা, নাবিকরা কেন ছোরা রাখে বলুন তো?'

আলুথালু একটা সরু বিছানায় শুয়ে সেনিয়ামামা বই পড়ছিল। চশমার ওপর দিয়ে তাকাল মিশার দিকে।

একটু যেন হতভম্ব হয়ে বলল, 'কোন্ নাবিকরা? কী ছোরা?'

'জানেন না? নাবিকদেরই তো শুধু ওই ছোরা থাকে। কেন রাখে বলুন না শুনি।' মিশা একটা চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসল — মনে মনে ঠিক করেছে খাবার সময় হবার আগে আর উঠবে না এ জায়গা ছেড়ে।

সেনিয়ামামা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ও সব জানি না বাপু। উর্দির সঙ্গেই হয়তো ওদের ওটা রাখতে হয়, নিয়ম। ব্যস্, হয়েছে?'

তার মানে মিশাকে এবার সোজা দরজা দেখতে হবে।

'এখানে খানিক থাকতে দিন না আমায়। একদম চুপচাপ বসে থাকব।' সাধাসাধি করে মিশা।

'বিরক্ত করতে পারবি না কিন্তু।' আবার বইটা তুলে নিল সেনিয়ামামা।

হাঁটুর নিচে হাত রেখে বসে থাকে মিশা। সেনিয়ামামার কামরাটা ছোট, এর মধ্যে আছে একটা বিছানা, একটা বইয়ের আলমারি, লেখার টেবিল আর তার ওপর পিস্তলের আকারের একটা দোয়াতদানি। দোয়াতটা খুলতে হলে পিস্তলের ঘোড়া টিপতে হবে। মিশার বড়ো লোভ আছে এ জিনিসটার ওপর, এটা পেলে পরে ইস্কুলের ছেলেরা কি হিংসেটাই না করবে ওকে !

দেয়াল ভরে ছবি আর প্রতিকৃতি। একটা হচ্ছে কবি নেক্রাসভের। ইস্কুলে উৎসবের দিনে 'ধেড়ে' শুরা নেক্রাসভের কবিতা আবৃত্তি করবেই করবে। প্রত্যেকবার আবৃত্তির আগে ওর ঘোষণা করা চাই — নেক্রাসভের লেখা 'রাশিয়াতে কারা সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে' — ভাবখানা যেন কেউ আর জানে না কবিতাটা নেক্রাসভের লেখা! কী বড়াই করে এই শুরা।

নেক্রাসভের ছবির পাশেই শিল্পী রেপিনের আঁকা যে ছবিটা রয়েছে তার নিচে লেখা: 'অপ্রত্যাশিত অতিথি'। ছবিটায় দেখানো হয়েছে — একজন রাজবন্দী হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে আর ওকে দেখে বাড়িশুদ্ধ লোক একেবারে থ'। ওর মেয়েটা হয়তো বা ভুলেই গিয়েছিল ওকে — অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে। মিশা ভাবে ওর নিজের বাপের কথা — উনি তো আর কখনো ফিরবেন না। জারের কয়েদী শিবিরে উনি মারা গেছেন। মিশার ভালো মনেও পড়ে না ওঁর কথা।

সেনিয়ামামার ঘরে বই আছে অঢেল। আলমারির ওপর, আলমারির ভেতর, বিছানার নিচে, টেবিলের ওপর, সব জায়গায় রেখেছে ছড়িয়ে ... কিন্তু মিশাকে কোনোদিন কিছু পড়তে দেয় না। যেন মিশা জানেই না কেমন করে বই নাড়াচাড়া করতে হয়। অথচ মস্কোতে ওর নিজস্ব একটা লাইব্রেরি ছিল। ওর একখানা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার জগৎ' পত্রিকা সেনিয়ামামার প্রায় সবগুলো বইয়ের সমান!

মিশার দিকে একটুও মনোযোগ না দিয়ে সেনিয়ামামা একটানা বই পড়ে চলল। ও যখন ঘর ছেড়ে চলে গেল তখনো মামা একবার মাথা তুলে অবধি দেখল না।

কী বিচ্ছিরি একঘেয়ে! মিশা ভাবে তাড়াতাড়ি খাওয়ার সময় হয় না কেন, মোরব্বাটা তৈরী হয়ে গেলেও তো হয়। দিদিমা যেটুকু ছেঁকে বাদ দিয়েছেন সেটুকু তো অন্তত সে পাবে নিশ্চয়ই ... জানলার কাছে গেল মিশা। জানলার কাঁচের ওপর ধূসর ডানাওয়ালা একটা প্রকাণ্ড সবুজ মাছি কেবলই গুঁড়ি মেরে উঠছে আর নামছে। আর যতোবারই নিচে গড়িয়ে পড়ছে প্রত্যেকবারই কাঁচের ওপর ডানার ঝাপ্‌টা মেরে জোর ভন্‌ ভন্‌ আওয়াজে ঘর ভরে তুলছে। এতক্ষণে করার মতো কিছু কাজ পাওয়া গেল! মাছিটার দিকে ও তাকিয়ে থাকবে, অথচ সেটাকে না ধরে জোর করে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখবে — এইভাবে নিজের মনের জোরের খানিকটা পরখ করতে পারবে মিশা।

কিছুক্ষণ মিশা তাকিয়ে রইল। ভন্‌ ভন্‌ করে কী আওয়াজই না করছে মাছিটা! এভাবে চলতে দিলে দাদামশাইয়ের ঘুমই যে ভেঙে যাবে। আচ্ছা! মাছিটাকে না ধরলে নয়। তারপর তাকে না মেরে বাইরে ছেড়ে দেবে।

কাঁচের ওপরে মাছি ধরার মতো সোজা কাজ দুনিয়ায় আর নেই। এক লহমায় মাছিটা এসে পড়ল ওর হাতের মুঠোয়। সাবধানে হাতটা খুলে একদিকের ডানা ধরে বের করে নিল মিশা। পালাবার জন্য আলগা ডানাটা পাগলের মতো ঝাপটাতে লাগল মাছিটা, কিন্তু মিশা ধরে রয়েছে শক্ত করে।

জানলা খুলল মিশা। কিন্তু তারপরেই চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবল ছেড়ে দিলে সে বড়ো দুঃখের কথা হবে। ওটাকে ধরার জন্য যে সময়টুকু ও ব্যয় করেছে সেটা বৃথা হবে। তারপর আরও ভেবে দেখ — মাছিগুলো তো আবার রোগের বীজও ছড়ায়। ও যখন ঠিক করতে পারছে না মাছিটাকে ছেড়ে দেবে না মেরে ফেলবে, এমন সময় হঠাৎ মনে হল কেউ যেন ওকে লক্ষ্য করছে। মাথা তুলতেই দেখে জানলার নিচে দাঁড়িয়ে গেঙ্কা।

'এই মিশা!' গেঙ্কা মুখ বেঁকিয়ে হাসল।

'এই যে।' সাবধানে জবাব দিল মিশা।

'আজ বুঝি অনেক মাছি ধরলি?'

'যে কটা আমার দরকার সে কটাই ধরেছি।'

‘বেরুচ্ছিস না যে?’

‘ইচ্ছে করছে না।’

‘মিছে কথা। আসলে বেরুতে দিচ্ছে না, তাই বল্।’

‘ভারি তো জানিস! খুশি হলেই বেরতে পারি।’

‘তাহলে একটু খুশিই হ’!’

‘কিন্তু আমি বেরুব না।’

‘বেরুবি না!’ হাসল গেঙ্কা, ‘তার চেয়ে বল্ বেরুতে পারবি না।’

‘পারব না?’

‘না, পারবি না!’

‘তাই যদি মনে করিস!’ জানলার চৌকাঠে উঠে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল মিশা গেঙ্কারই পাশে।

‘এবার তাহলে কী বলবি বল্?’

কিন্তু গেঙ্কা জবাব দেবার আগেই দিদিমা জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

‘মিশা! এক্ষুনি ফিরে আয় বলছি!’

ফিস্‌ফিস্ করে মিশা বলল, ‘দৌড়ো!’

রাস্তা ধরে ছুটল ওরা, পাশের গলিটাতে গিয়ে পড়ল। তারপর গেঙ্কাদের বাগানের বেড়া টপ্‌কে গিয়ে লুকোল একটা গাছের নিচে আড়াল করা কুঁড়েঘরে।

৫

ডালপালার কুঁড়েঘর

গেঙ্কার কুঁড়েঘরটা তক্তা ডালপালা আর পাতা দিয়ে তৈরি। তিনটে গাছের মাঝখানে পাতায় পাতায় আড়াল হয়ে থাকে। মাটি থেকে চার পাঁচ হাত উঁচুতে। কুঁড়েঘর থেকে গোটা শহরটাই দেখা যায় — রেল স্টেশন, দেস্না নদী, মায় নোসভ্‌কা গাঁয়ের সড়কটাও। কুঁড়ের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। পাইনগাছের গন্ধ। জুলাই মাসের পড়ন্ত রোদে পাতাগুলো অল্প অল্প কাঁপে।

গেঙকা বলল, 'এখন তুই ফিরবি কেমন করে? দিদিমা আচ্ছা মতো দেবে কিন্তু জেনে রাখিস।'

মিশা জানিয়ে দিল, 'বাড়ি আমি যাবই না মোটে।'

'তার মানে?'

'তার মানে যাব না, ব্যস্। কেন যাব? কাল পলেভোয় তার ফৌজী দলটাকে নিয়ে যাচ্ছে নিকিৎস্কির গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। কাজটা তো হওয়া চাই কিনা।'

'ফৌজী দলে গিয়ে তুই কী করবি শুনি? বুড়ো ছাগলের ঢাক পেটানোর কাজ?' হো হো করে হেসে উঠল গেঙকা।

নির্বিকারভাবে মিশা জবাব দিল, 'হাসতে পারিস যতো খুশি। কিন্তু পলেভোয় আমাকে স্কাউট বানিয়ে নেবে। যুদ্ধের সময় স্কাউটের কাজ তো ছেলেরাই করে। পলেভোয় বলেছিল আরো দু'চারজন ছেলে জোগাড় করে নিতে, কিন্তু ...' গেঙকার দিকে করুণভাবে চেয়ে বলল, 'কিন্তু যুৎসই লোকই পাচ্ছি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিশা। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে একলাই যেতে হবে আমাকে।'

গেঙকা এমনভাবে মিশার চোখের দিকে তাকাল যেন ভিক্ষে চাইছে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' রাজি হবার ভঙ্গি করে নিঃশ্বাস ফেলে মিশা বলল, 'আমার জন্য কিছু খাবার তো নিয়ে আয়, তারপর ভেবে দেখা যাবে। তবে হ্যাঁ, কারুকে যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিস না, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।'

গেঙকা চেঁচিয়ে উঠল, 'কী মজা! আমরা স্কাউট হব!'

চটে গিয়ে মিশা বলল, 'এই তো! এরই মধ্যে চ্যাঁচাতে লেগে গেলি! সব ফাঁস করে দিলি! নেব না তোকে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে!' গলার স্বরটা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল গেঙকা। তারপর গাছ থেকে নেমে বাগানের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাঠের পাটাতনে গা এলিয়ে হাতের মুঠোর ওপর থুতনি রেখে মিশা অপেক্ষা করে গেঙকার জন্য। মুশকিলে পড়া গেল তো! রাস্তায় গিয়েও ঘুমোতে পারে না

আবার বাড়ি ফিরতেও লজ্জা করে, বিশেষ করে দাদামশাইয়ের সামনে মুখ দেখানো! মনে পড়ল ছোরাটার কথা... হয়তো কারুর হাতে পড়ে যাবে, তার মানে একটা মহা গণ্ডগোলের ব্যাপার দাঁড়াবে তখন!

গাছের পাতার আড়াল থেকে মিশা বাগানের দিকে তাকায়। নিচু নিচু আপেল গাছ, ডালওয়ালা নাসপাতি গাছ, রাস্পবেরীর বেত-লতা আর গুজ্‌বেরীর ঝোপ। ও মনে মনে ভাবে, 'আচ্ছা, একই জমিতে পাশাপাশি গাছগুলো রয়েছে, অথচ একেক গাছে কেন একেক রকমের ফল ধরে?'

মিশার হাতের ওপর একটা পোকা উড়ে এসে বসল। ছোট্ট গোল পোকাটা, লাল শক্ত গা, কালো আলপিনের মতো মাথা। সাবধানে তুলে নেয় মিশা, আলগোছে হাতের তেলোয় রেখে ছড়া কাটে: 'ছোট্ট পোকা রে, ছোট্ট পোকা, ঘর যে তোর গেল পুড়ে, খোকা রইল একা!' সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ডানা মেলে পোকাটা উড়ে গেল।

কুঁড়ের মধ্যে একটা বোলতা এসে ঢুকল। ভোঁ ভোঁ করে মাথার ওপর খানিক ঘুরপাক খেয়ে চুপচাপ বসল মিশার পায়ের ওপর। কামড়াবে নাকি? ও যদি স্থির নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে তাহলে কামড়াবে না নিশ্চয়। পা বেয়ে বেয়ে উঠল বোলতাটা, তারপর আবার উড়ে গেল আগের মতো একঘেয়ে ভোঁ ভোঁ করে।

মিশার আশেপাশে ছড়িয়ে আছে বিরাট অথচ অদৃশ্য এক প্রাণীজগৎ।

পাইনগাছের কাঁটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা পিঁপড়ে, মাটিতে তার ছোট্ট ছায়া পড়েছে ট্যারচা হয়ে — সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ছায়াটাও। ঘাসের মধ্যে লাফাচ্ছে একটা খুদে গঙ্গাফড়িং—লম্বা পাগুলো এমন বাঁকিয়ে রেখেছে যে মনে হয় সেগুলোর গিঁট বুঝি ভাঙা। বাগানের রাস্তায় একটা চড়ুইপাখি লাফাচ্ছে — পাশের দিকে চলা ওর বেয়াড়া ভঙ্গিটা নজর করছে একটা বেড়াল, কুঞ্জের সিঁড়িতে বসে ঢুলুঢুলু আধবোঝা চোখে তাকিয়ে আছে বটে কিন্তু দেখছে বেশ মন দিয়েই। বাতাসে ভেসে আসছে ঘাসের গন্ধ আর ফুলের সুবাস। মিশার কেমন যেন ঘুম ঘুম পেতে লাগল। চোখের পাতা বুজে এল। আজকের সব ঝামেলার কথা ভুলে গেল ও...

হাঁপাতে হাঁপাতে কুঁড়েঘরে উঠে এল গেঙ্কা। জামার নিচে লুকিয়ে এনেছে মস্ত একটা গরম আধ-সেদ্ধ মাংসের টুকরো।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ্, ঝোলের গামলা থেকে তুলে এনেছি।'

মিশা আঁতকে উঠে বলল, 'পাগল হলি নাকি? বাড়ির কারুরই যে আজ খাওয়া হবে না সে খেয়াল আছে তোর?'

বেপরোয়া ভঙ্গিতে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে গেঙ্কা বলে উঠল, 'তাতে কিছু আসে যায় না! স্কাউট হয়ে তো চলেই যাচ্ছি! দরকার হলে নিজেরা আরেক প্রস্থ রেঁধে নিক্ গে!' নিজের মনেই বেশ খুশি হয়ে চুমকুড়ি কাটল গেঙ্কা।

দাঁত আর হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসটা খেল মিশা। গেঙ্কাটা একটা আস্ত ডাবই বলতে হবে! ওর বাবা খুব কড়া লোক, তার হাতে ও যে চাবকানি খাবে তাতে সন্দেহ নেই। গেঙ্কার বাবা ঢ্যাঙা রোগা মানুষ, পাকা গোঁফ আছে। ইঞ্জিন ড্রাইভার। গেঙ্কার সৎমাও যে মুখ বুজে থাকবে তা নয়!

গেঙ্কা বলল, 'খবর শুনেছিস?'

'কী খবর?'

'হুঃ, বলে দিলাম আর কি!'

'সে তোর মর্জি। তবে তুই স্কাউট হবার যুগ্যি নোস। তখনো কি তুই এমনি করে আমার কাছে কথা চেপে রাখবি?'

মিশার গলার স্বরে যে ধমকানিটুকু ছিল তার ফল ফলল। গামলা থেকে মাংস চুরি করার পর গেঙ্কার সামনে এখন একটাই রাস্তা খোলা—স্কাউট হতে হবে। তার মানে ওকে বাধ্য হতে হবে।

বলল, 'একটু আগেই বাড়িতে একজন লোক এসেছিল নোসভ্‌কা থেকে। সে বলল নিকিৎস্কির দল নাকি খুব কাছেই এসে পড়েছে।'

'তাতে কী হয়েছে?' সজোরে মাংসটা চিবোতে চিবোতে মিশা বলল।

'বুঝতে পারছিস না? ওরা যে রেভস্ক আক্রমণ করবে।'

'আর তুই তাই বিশ্বাস করেছিস?' হেসে বলল মিশা, 'হায় রে বুদ্ধু! তুই আবার স্কাউট হতে চাস!'

'কেন হব না?' তোৎলাতে থাকে গেঙ্কা।

'কারণ নিকিৎস্কি আছে চের্নিগভ শহরের কাছে। হামলা সে করতে পারবে না, কারণ আমাদের একটা গ্যারিসন রয়েছে। বুঝলি তো! একটা গ্যা-রি-সন্...'

'গ্যারিসন আবার কী?'

'গ্যারিসন কী জানিস না? সেটা হল... এই... কেমন করে বোঝাই তোকে... এই একটা...'

'সবুর কর্ তো একটু! শুনতে পাচ্ছিস?' হঠাৎ ফিস্ফিসিয়ে উঠল গেঙ্কা।

মাংস চিবোনো বন্ধ রেখে মিশা কান খাড়া করল। বাড়িগুলোর ওপাশে কোথায় যেন গুলির আওয়াজ হল — আকাশের নীল গম্বুজটার মধ্যে যেন মিলিয়ে যায় সে শব্দ। তারপরেই রেল স্টেশনে সাইরেনের চিৎকার আর মেশিনগানের দ্রুত কট্ কট্ আওয়াজ ওঠে।

ভয়ে ভয়ে চুপ করে বসে থাকে ছেলেদুটো। তারপর পাতা সরিয়ে উঁকি দেয় কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে।

নোসভ্কার রাস্তা থেকে ধুলোর মেঘ উঠেছে। রেল স্টেশন থেকে গুলির আওয়াজ এল। ছেলেদুটো কিছু বুঝে ওঠবার আগেই লাল চুড়োওয়ালা ভেড়ার চামড়ার টুপি-পরা একদল ঘোড়সওয়ার চিৎকার করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে জনশূন্য রাস্তাটার ওপর দিয়ে—সাঁই সাঁই করে বাতাসে চাবুক হাঁকায় ওরা। শহরে ঢুকে পড়েছে শ্বেতরক্ষী দুশমন।

৬

হামলা

গেঙ্কার ওখানে লুকিয়ে রইল মিশা। তারপর গুলি গোলা থামতে রাস্তাটা একবার দেখে নিয়েই ছুটল বাড়ির দিকে বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন দাদামশাই। কেমন হতভম্ব আর বিবর্ণ হয়ে গেছেন।

বাড়ির কাছেই কসাকী জিন আঁটা কতগুলো ঘোড়া——ঘেমে উঠে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

দরজার কাছে দৌড়ে গেল মিশা। বাড়ির ভেতর চেয়ে যা দেখল তাতে আর চৌকাঠ ডিঙোতে পা সরল না ওর।

খাবার ঘরে গুন্ডাগুলোর সঙ্গে মরীয়া হয়ে লড়ছে পলেভোয়, ছ'জন মিলে একসঙ্গে চেপে ধরেছে ওকে। জোরালো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে রুখবার চেষ্টা করছে পলেভোয়, কিন্তু তবু ওকে মেঝের ওপর ফেলে উল্টেপাল্টে গড়াগড়ি দিচ্ছে ওরা। ধাক্কা খেয়ে চেয়ার টেবিল ছিটকে পড়ছে। টেবিলঢাকা কাপড়, পাপোষ, পর্দা সব খসে যাচ্ছে।

আরেকজন শ্বেতরক্ষী, দলের সর্দার নিশ্চয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে। পলেভোয়ের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি সে লক্ষ্য করে যাচ্ছে একমনে।

র‍্যাকের ওপর ঝোলানো একগাদা কোটের আড়ালে লুকোল মিশা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল কখন পলেভোয় গুন্ডাগুলোকে ওর প্রকান্ড কাঁধের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়—কতোবার স্বপ্নে দেখেছে মিশা পলেভোয়কে এমনিধারা।

কিন্তু উঠল না তো পলেভোয়। গুন্ডাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেন দুর্বল হয়ে আসছে সে। অবশেষে গুন্ডারা ওকে সোজা করে দাঁড় করাল। হাতদুটো পিছমোড়া করে ওকে ঠেলে নিয়ে চলল জানলার কাছে সেই শ্বেতরক্ষীটার সামনে। ভয়ানক হাঁপাচ্ছে পলেভোয়, কটা চুল বেয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ওর পাদুটো খালি, ডোরাদার গেঞ্জি পরনে। মিশা বুঝল, ঘুম থেকে আচমকা ঠেলে তোলা হয়েছে ওকে। ডাকাতগুলোর হাতে কার্বাইন, পিস্তল, আর তলোয়ার। মেঝের ওপর ওদের জুতোর নালের কাঁটাগুলো আওয়াজ তুলেছে।

চোখের পলক না ফেলে শ্বেতরক্ষীটা সোজা চেয়ে রইল পলেভোয়ের দিকে। হেলিয়ে বসানো ফারের টুপির তলা দিয়ে একগাছি কালো চুল বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে তীক্ষ্ন ধূসর চোখজোড়ার ওপর। ডান গালের ওপর দগ্‌দগে লাল

একটা কাটা দাগ। ঘরের ভেতর একমাত্র আওয়াজ শোনা যাচ্ছে লোকগুলোর জোরে জোরে হাঁফ ছাড়ার আর ঘড়িটার নির্বিকার টিক্ টিক্ শব্দ।

তীক্ষ্ন খন্‌খনে গলায় শ্বেতরক্ষী সর্দারটা হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'ছোরাটা!' ফের বলল, 'ছোরা!' আর পলেভোয়ের দিকে এমনভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল যে চোখদুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড়।

কোনো জবাব দিল না পলেভোয়। লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে কাঁধটা খালি ঝাঁকাল আস্তে আস্তে। শ্বেতরক্ষীটা ওর দিকে এগিয়ে এসে চাবুক তুলল। সজোরে পলেভোয়ের মুখের ওপর একটা ঘা কষাল সে। শিউড়ে উঠে মিশা শক্ত করে চোখের পাতাদুটো বুজল।

'নিকিৎস্কির কথা ভুলে গিয়েছিস! তাহলে আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোকে!' খেঁকিয়ে উঠল শ্বেতরক্ষীটা।

তাহলে এই নিকিৎস্কি! আর এরই কাছ থেকে ছোরা পলেভোয় লুকিয়ে রেখেছে!

হঠাৎ যেন নিকিৎস্কির গলার স্বরটা খুব নরম হয়ে পড়ল, 'শোনো পলেভোয়, রেহাই তুমি পাচ্ছ না। ভালো চাও তো ছোরাটা ফিরিয়ে দাও, তারপর চলে যাও যেখানে তোমার খুশি। যদি না দাও, আমার লোকরা তোমায় ফাঁসি ঝোলাবে!'

পলেভোয় একটা কথাও বলল না তবু।

নিকিৎস্কি বলল, 'বেশ! তাহলে মর্ এবার!'

দুটো গুন্ডাকে ইশারা করতেই তারা পলেভোয়ের কামরার দিকে ছুটল। মিশা ওদের চিনতে পেরেছে—সকালের সেই করাতী দু'জন। সারা ঘর হাতড়াতে লাগল ওরা—জিনিসপত্র উল্টে তছনছ করে মেঝের ওপর ফেলে ছড়িয়ে

আলমারির দরজা ভেঙে ফেলল কার্বাইনের বাঁট দিয়ে। বালিশের মধ্যে ছুরি চালাল চুল্লী থেকে ছাই ঝেড়ে দেখল।

মিশার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল — এবার বুঝি ওর ঘরেও ঢোকে লোকদুটো। আড়াল ছেড়ে ও চুপিচুপি এগিয়ে যায় হলঘরের দিকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে এর মধ্যে। অন্ধকারে মিশার হাত সোফার গদির নিচে ছোরার ঠাণ্ডা ইস্পাত ফলাখানা চেপে ধরল। টেনে বের করে জামার আস্তিনের ভেতরে সেটাকে লুকিয়ে ফেলল মিশা। হাতের মুঠোয় আস্তিন আর ছোরার বাঁট দুটোই একসঙ্গে চেপে রেখে ফের চলে এল প্রবেশপথে সেই ঝোলানো কোটগুলোর আড়ালে।

গুণ্ডারা ইতিমধ্যেই পলেভোয়ের কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, আর পলেভোয় শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে হাতদুটো পিছনমোড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ রাস্তায় ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ আওয়াজ শোনা গেল। অলিন্দের সিঁড়িতে

দ্রুত পায়ের শব্দ। একটা শ্বেতরক্ষী দস্যু ভেতরে এসে নিকিৎস্কিকে কী যেন বলল চাপা গলায়।

নিকিৎস্কি নড়ল না একটুও।

পরক্ষণেই চাবুক হাঁকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ঘোড়ায় চাপো!'

গুন্ডারা পলেভোয়কে টানতে টানতে নিয়ে চলল রাস্তা আর খিড়কির উঠোনে যে অন্ধকার প্রবেশপথটা গিয়ে পড়েছে সেইটের মধ্যে। প্রবেশপথের ভেতরে পলেভোয় ঢুকেছে, সেই ফাঁকে মিশা ওর হাত ধরে তার মুঠিটা খুলল।

পলেভোয়ের হাতের তলায় ঠেকল ছোরার বাঁটটা। ছোরাটা টেনে নিয়েই সামনের দিকে এক পা এগিয়ে গেল পলেভোয়। ধাঁ করে হাত উঁচু করে সামনেই যে গুন্ডাটা ছিল তার ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দিল ছোরাটা। এর মধ্যে মিশাও লাফিয়ে পড়ল আরেকটা গুন্ডার পায়ের কাছে। গুন্ডাটা পড়ে গেল মিশার ওপর, আর পলেভোয় প্রবেশপথ থেকে লাফিয়ে উঠোনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু পলেভোয় পালাতে পারল কিনা তা আর মিশার দেখা হল না। রিভলভারের বাঁটের একটা সাংঘাতিক ঘা খেয়ে ও এক কোণায় গড়িয়ে পড়ল বস্তার মতো—র‍্যাকে ঝোলানো একটা ক্যান্‌ভাসের বর্ষাতি কোটের নিচে।

৭

মা

ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মিশা চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানায়। লেসের পর্দা অল্প দুলছে। পর্দা পেরিয়ে কানে আসছে রাস্তার দূরের সব আওয়াজ।

রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে। কাঠের হাঁটাপথের ওপর দিয়ে ওদের চলাফেরার শব্দ শুনতে পায় মিশা। উক্রেনীয় ভাষায় কথা বলছে ওরা ভরা দরাজ্ গলায়...

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে গাড়ি চলেছে...

কাঠি দিয়ে চাকা চালাচ্ছে একটা ছেলে।

কেমন একটা আবছা আবছা মতো শব্দগুলো কানে আসছে মিশার। ওর ছোট ছোট তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া স্বপ্নের সঙ্গে মিলে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যেন। পলেভোয় ... শ্বেতরক্ষীগুলো ... সেই আঁধার রাতে পলেভোয় কোথায় অদৃশ্য হল... নিকিৎস্কি... ছোরা... পলেভোয়ের মুখে রক্ত, ওর নিজের মুখেও... গরম চট্‌চটে রক্ত...

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল দাদামশাইয়ের মুখে শোনে মিশা। রেল মজুরদের একটা ফৌজীদল শহরটাকে ঘিরে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালিয়েও ডাকাতরা সবাই পালাতে পারেনি। কিন্তু নিকিৎস্কি পালিয়েছে। লড়াইয়ে জখম হয়েছে পলেভোয়। রেল স্টেশনের হাসপাতালে আছে সে।

মিশার মাথায় আদর করে চাপড় দিয়ে দাদামশাই বললেন, 'তুই বাহাদুর বটে!'

কিন্তু বাহাদুর আর কোথায় হতে পারল সে। বাহাদুর হলে সবগুলো ডাকাতকে সাবাড় করে নিকিৎস্কিকে গ্রেপ্তার করত ও।

মিশা ভাবে দেখা হলে পলেভোয় কী করবে কে জানে। হয়তো ওর পিঠ চাপড়ে বলবে, 'এই যে মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ, কেমন হালচাল?'

কিংবা হয়তো ওকে একটা রিভলভার দেবে, ঝোলাবার বেল্‌ট্‌ও দেবে। ওরা দুজনে মিলে চলে যাবে রাস্তায় — ঠিক সত্যিকারের পল্টনদের মতো — হাতিয়ার নিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। হ্যাঁ, দেখবার মতোই হবে বটে দৃশ্যটা! এমন কি পেৎকা-মোরগটাও তখন আর ওকে ভয় দেখাতে সাহস পাবে না।

ঘরে ঢুকল মা। দাদামশাই তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। কয়েকদিন হল এসেছে মা মস্কো থেকে।

বিছানার চাদরটা গুছিয়ে টেবিল থেকে প্লেট আর রুটি সরিয়ে গুঁড়োগাঁড়াগুলো সাফ করল মা।

মিশা বলল, ‘মা! আমাদের বাড়ির সেই সিনেমাটা চলছে, মা?’
‘হ্যাঁ।’
‘কী ছবি হচ্ছে এখন?’
‘মনে পড়ছে না। তুই চুপ করে শো তো।’
‘শুয়ে তো আছিই। আমাদের ঘণ্টাটা মেরামত হয়ে গেছে?’
‘না। ও তুই বাড়ি ফিরে গিয়ে ঠিক করবি।’
‘তা তো করবই। ছেলেদের কাউকে দেখোনি? স্লাভাকে দেখেছিলে?’
‘হ্যাঁ।’
‘আর ধেড়ে শুরা?’
‘হ্যাঁ, ওদের সব্বাইকে দেখেছি। এখন চুপ করে শো বলছি!’

ব্যাণ্ডেজগুলো বাদ দিয়েই মস্কো যেতে হবে ওকে! কী দুঃখের কথা! ব্যাণ্ডেজ থাকলে ওর সঙ্গীসাথীরা কি হিংসেটাই না করত ওকে! যদি ওগুলো না খোলা হত আর এই অবস্থাতেই ও মস্কো যেতে পারত — তোফা হত কিন্তু! তাছাড়া স্নান-টান বাদ দিয়েই বেশ চলত ...

জানলার কাছে বসে মা কী যেন সেলাই করছিল।
‘আর কতোদিন বিছানায় থাকব মা?’
‘যতোদিন না ভালো হয়ে ওঠ।’
‘কিন্তু আমার তো বেশ ভালোই বোধ হচ্ছে। বেরুব মা?’
‘অমন হাঁদার মতো করিসনে তো! চুপ করে শো, কথা বন্ধ কর্।’

মিশা বিষণ্ণ হয়ে ভাবে, ‘একটু হাঁটব, তাতেও দোষ! আমাকে এই বিছানাটার মধ্যে আটকে রাখতে চায়! উঠে না পালিয়েছি তো কী বলেছি, দেখোই না!’

মনে মনে কল্পনা করে — মা ঘরে এসে যেন দেখবে মিশা চম্পট দিয়েছে। তখন খুব কাঁদবে মা, অসহ্য দুঃখে। কিন্তু অতো কেঁদেও কোনো ফল হবে না, কারণ মিশাকে মা আর কোনোদিন দেখতে পাবে না।

মায়ের দিকে আড়চোখে চাইল মিশা। সেলাইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মা। মাঝে মাঝে থেমে দাঁত দিয়ে সুতো কাটছে।

মিশা না থাকলে মার ভয়ানক কষ্ট হবে — একেবারে একা। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে এসে কাউকে পাবে না কাছে। ঘরটা থাকবে খালি, অন্ধকার। রোজ সন্ধ্যেয় বসে বসে মা ভাববে মিশার কথা। মিশার মনে হয় যেন ওর গলার কাছে কিছু একটা ঠেকছে ...

মা গম্ভীর ধরনের রোগা পাতলা মানুষ। চোখদুটো ধূসর, উজ্জ্বল। খাটতে পারে অসম্ভব, নিরলসভাবে। কারখানা থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরে, রান্নাবান্না সারে, ঘরদোর গোছায়, মিশার জামা কাচে, ওর মোজা রিফু করে। মিশার বাড়ির পড়াটাও তৈরি করায় সাহায্য করে মা। কিন্তু তাহলে কী হবে? যখনই মা ওকে কিছু করতে বলে, কাঠ ফাড়া, দোকান থেকে রুটি আনা কিংবা খাবারটা গরম করা—সঙ্গে সঙ্গে ও একটা ছুতো খুঁজে বাড়ির বাইরে চলে যায়।

মা গো, তুমি কতো ভালো! কতোবার মিশা মাস্টারমশাইদের অবাধ্য হয়ে, ইস্কুলে খারাপ ব্যবহার করে মার মনে কষ্ট দিয়েছে! মাকে ইস্কুলে ডাকা হয়েছে, মিশাকে ক্ষমা করার জন্য হেডমাস্টারকে অনুরোধ করতে হয়েছে। কতো জিনিস ভেঙেছে সে, ছিঁড়েছে, নষ্ট করেছে বই, কাপড় ... ওর সব খারাপ কাজের ভার এসে চেপেছে রোগা মার ওপর। কিন্তু তবু তো মা মুখ বুজে সেলাই করে, রিফু করে। আর মিশা কিনা রাস্তাঘাটে ওর মায়ের পাশে চলতে লজ্জা পায় লোকে 'কচি বাচ্চা' ভাববে বলে। কোনোদিন মাকে চুমু খায়নি ও — মিশার কাছে ওসব ন্যাকামি। আর আজও ও ফিকির খুঁজছে মাকে কোনো রকম কষ্ট দেবার — অথচ মা বাড়িতে সব কিছু ফেলে ছড়িয়ে, একহপ্তা মালগাড়িতে চেপে অসহ্য দুর্ভোগ সয়ে এসেছে, ওর জন্য প্রত্যেকটা দরকারী জিনিস সঙ্গে করে এনেছে। সবকিছু নিজে বয়ে এনেছে, আর একবারও মিশার বিছানার ধারটি ছেড়ে ওঠেনি ...

মিশা চোখদুটো অর্ধেক বুজল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। যে কোণটিতে মা বসে আছে, শুধু সেখানেই পড়ন্ত বেলার সোনালি আলোটুকু এসে পড়েছে। মা সেলাই করছে, সেলাইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে গান গাইছে।

শোনো...
বেইমানির চেয়ে কালো,
অত্যাচারীর মনের চেয়ে কালো
শরতকালের রাত,
আর এই রাতের চেয়ে কালো কয়েদখানা
দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশায়।

গানের ধুয়োর শুরুতেই 'শোনো ...' কথাটা যেন যন্ত্রণা ভরা গোঙানির মতো করুণ আর টেনে টেনে গাওয়া।

গানটা হল একজন জোয়ান সুপুরুষ বন্দীর গাওয়া গান, — কয়েদখানার লোহার গরাদে দুহাতে চেপে ধরে এই গান সে গেয়েছিল আর তাকিয়ে ছিল বাইরের পৃথিবীটার দিকে—সে পৃথিবীতে কতো না সুখ, অথচ সেখানে তার প্রবেশ নেই।

মা গেয়ে চলেছে তো গেয়েই চলেছে। মিশা চোখ মেলল। অন্ধকারে মায়ের ফ্যাকাশে মুখখানা আবছা আবছা দেখতে পেল ও। একটার পর একটা গান গাইছে মা। প্রত্যেকটা গানই বড়ো করুণ, বিষাদ ভরা।

মিশা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। মা ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কীরে মিশা, কী হল?'

একটা কথাও না বলে দুহাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল মিশা, নিজের কাছে টেনে নিল তাকে, কতোদিনের চেনা উষ্ণ জামাটার মধ্যে মাথা গুঁজল।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'মা মণি, তোমায় আমি কতো যে ভালোবাসি!'

৮

রোগীর শুভার্থী

দেখতে দেখতে সেরে উঠল মিশা। শুধু ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটাই রয়ে গেল তখন পর্যন্ত। মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য উঠে বিছানায় বসতে পেত। তারপর একদিন প্রাণের বন্ধু গেঙ্কাকেও ঘরে আসতে দেওয়া হল মিশাকে দেখবে বলে।

ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটার কাছে দাঁড়াল গেঙ্কা। মিশা মাথা ফেরাল না।

চিঁ চিঁ করে বলল, 'বস্ না!' আড়চোখে চাইল গেঙ্কার দিকে।

চেয়ারের এক কিনারায় খুব আলগোছে বসল ওর বন্ধু। হাঁ করে, চোখ ছানাবড়া করে চেয়ে রইল মিশার দিকে। নোংরা পাদুটো বৃথাই চেয়ারের নিচে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল গেঙ্কা।

সিলিঙের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মিশা। ওর মুখের প্রত্যেকটা ভাঁজে ব্যথা আর যন্ত্রণার ছাপ। মাঝে মাঝেই কপালের ব্যাণ্ডেজটায় হাত বুলোচ্ছে—ব্যথার জন্যে নয়, গেঙ্কাকে তো ওটার যথোচিত মূল্য বোঝাতে হবে!

শেষমেষ সাহস করে গেঙ্কা বলল, 'কেমন আছিস?'

'ভালোই।' ক্ষীণ গলায় জবাব এল। কিন্তু যে গভীর নিশ্বাসটা সেই সঙ্গে বের হল তাতে বেশ বোঝাবার চেষ্টা, যে সত্যিসত্যিই ও অসুস্থ, বীরের মতো ওকে অসহ্য যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে।

'মস্কোতে ফিরে যাচ্ছিস?' একটু থেমে ফের বলল গেঙ্কা।

'অ্যাঁ-হ্যাঁ।' আরেকটা নিশ্বাস ছেড়ে মিশা জবাব দিল।

'পলেভোয়ের ফৌজী ট্রেনে করে নাকি যাচ্ছিস শুনলাম?'

'কোথায় শুনলি?' সঙ্গে সঙ্গে বসল মিশা, 'কে বলেছে?'

'কেউ একজন।'

চুপচাপ। গেঙ্কার দিকে তাকাল মিশা।

'আর তুই নিজে কী ঠিক করেছিস?'

'কিসের কী ঠিক করব?'

'মস্কোতে যাওয়ার?'

'এসব কথা কেন যে তুলিস?'

চটে গিয়ে মাথা নেড়ে গেঙ্কা বলল:

'জানিস তো কিছুতেই বাবা আমায় যেতে দেবেন না।'

'কিন্তু তোর আগ্রিপ্পিনা তিখনভ্না পিসি তো কতবার তোকে যেতে লিখেছেন। তারপর যে চিঠিটা মা এনেছে তাতেও তো উনি বলেছেন এবার যাবার জন্য। গেলে আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকতিস।'

গেঙ্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'বললাম তো বাবা যেতে দেবেন না। মাও না।'

'কিন্তু নিউরা মাসি তো আর তোর আসল মা নয়।'

'তাহলেও তিনি ভালো লোক।'

'আগ্রিপ্পিনা পিসি কিন্তু আরো ভালো।'

'কিন্তু যাব কেমন করে শুনি?'

'সে তো খুব সোজা রে! গাড়ির তলার বাক্সে লুকিয়ে থাকবি। তারপর রেভস্ক ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বসবি আমাদের সঙ্গে।'

'যদি বাবা ইঞ্জিন চালান তাহলে?'

'তাহলে বাখ্মাচে যখন ওরা ইঞ্জিন বদলাবে তখন বেরিয়ে আসবি।'

'মস্কোতে গিয়ে কী করব?'

'কেন, তোর যা খুশি! ইস্কুলে ভর্তি হতে পারিস, কারখানার কাজে ঢুকতে পারিস।'

'কারখানার কাজ মানে কী বলছিস? কেমন করে কাজ করতে হয় সে কি আমি জানি?'
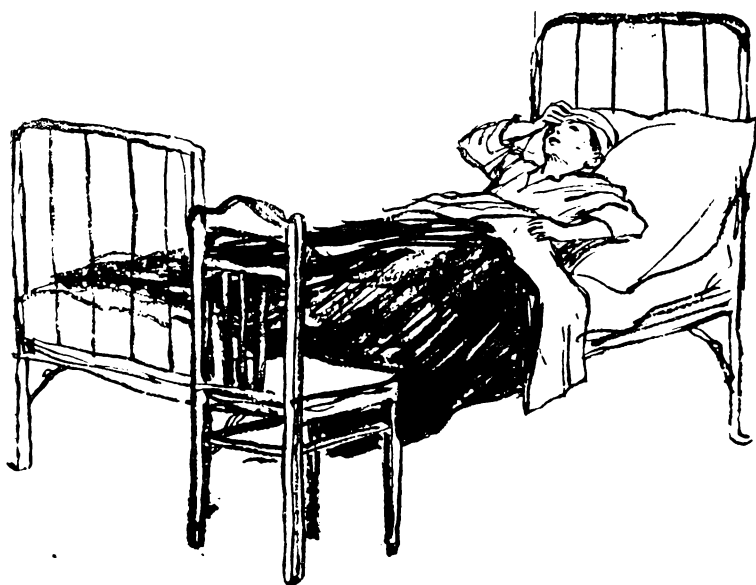
'তার মানে কারখানায় কী করতে হবে জানিস না, এই বলছিস তো? রাবিশ্। শিখবি রে শিখবি। ভেবে দ্যাখ্ একবার। আমি কিন্তু ঠাট্টা করে বলছি না।'

'সেই স্কাউটদের কথাও তো তুই ঠাট্টা করে বলিসনি। তারপর যা ঠ্যাঙানিটা খেয়েছি সেই মাংসের জন্য, সে আমি ভুলিনি।'

'নিকিৎস্কি যদি রেভস্কে হামলা করে সে কি আমার দোষ? ও ব্যাপারটা না হলে এ্যাদ্দিনে আমরা আলবৎ স্কাউট হয়ে যেতাম। মস্কোতে পেঁাছেই স্বেচ্ছাসেবক হব শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়বার জন্য। যাবি তো?'

'কোথায়?' সাবধানে প্রশ্ন করল গেঙ্কা।

'প্রথমে মস্কো। তারপর শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়তে।'

'যদি শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়তে হয় তাহলে অবিশ্যি যেতে রাজি আছি।' এড়িয়ে যাবার মতো জবাব দিল গেঙ্কা।

গেঙকা চলে যাবার পর মিশা চিৎ হয়ে শুয়ে পলেভোয়ের কথা ভাবে। কেন এল না ও? ছোরাটার গোপন রহস্যটাই বা কী? ছোরার ফলার ওপর নেকড়ে, কাঁকড়াবিছা আর পদ্ম — এগুলোর নিশ্চয় কোনো অর্থ আছে। হাতলের কাছে ব্রোঞ্জের সাপটারও। এ সবের কী মানে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল সেনিয়ামামা আসতে। ঘরে ঢুকেই মামা প্যাস্‌নেটা খুলল। প্যাস্‌নে খোলার ফলে চোখদুটো ছোট-ছোট লাল-লাল দেখাচ্ছে, যেন ভয় পেয়েছে কোনো কারণে।

প্যাস্‌নেটা আবার চোখে এ'টে সেনিয়ামামা বলল, 'কেমন বোধ হচ্ছে মিখাইল?'

'ভালোই। এখন তো ইচ্ছে করলেই উঠতে পারি।'

মিশা ওঠার চেষ্টা করতেই হাঁ হাঁ করে মামা বলে উঠল, 'আরে না, না, উঠিসনি।' বেখাপ্পাভাবে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে মামা কামরার ভেতর পায়চারি করতে লাগল। তারপর ফের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলল:

'মিখাইল, তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

মিশা ভাবল, 'টিউবের কথা নয়তো?'

'তুই তো বেশ বড়োসড়ো হয়েছিস এখন ... উম্‌ ... মানে কিনা ... আমার কথা তো নিশ্চয় বুঝবি, আর যা বলব তা শুনে দরকার মতো সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারবি।'

'এই সেরেছে!' ভাবল মিশা।

সেনিয়ামামা বলেই চলেছে, 'তা, এই যে সম্প্রতি বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল এর মধ্যে কিন্তু ছেলেখেলা কিছু নেই। আমার তো মনে হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে তুই একটু আগেভাগেই মাথা ঘামাতে শুরু করেছিস।'

'মানে? কী বলছেন আপনি?' সেনিয়ামামার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল মিশা।

'বুঝতে পারছিস না? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা রাজনৈতিক লড়াই হয়ে গেল, আর সে লড়াই তুই দেখলি। তা, ছেলে-ছোকরা মানুষ তুই

এখনো কাঁচা, অথচ সে ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলি। কোনো দরকারই ছিল না।'

'কী বলছেন আপনি?' অবাক হয়ে যায় মিশা। 'গুণ্ডাগুলো পলেভোয়কে খুন করতে যাচ্ছে, আর আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব, এই বলতে চান আপনি? তাই বোঝাচ্ছেন?'

'নীতিজ্ঞানওয়ালা মানুষ হিসেবে অবশ্য তুই যে কোনো লোক বিপদে পড়লেই তাকে সাহায্য করতে পারিস। তবে সেটা কখন? যেমন ধর, পলেভোয় যদি রাস্তায় ডাকাতের হাতে পড়ত তাহলে। কিন্তু আমি যে ঘটনাটার কথা এখন বলছি সেখানে এমন কোনো ব্যাপার ঘটেনি। লাল বাহিনী লড়ছে শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে, কিন্তু রাজনীতিতে মাথা গলাবার পক্ষে তুই নিতান্ত নাবালক রয়েছিস এখনো। তোর কাজ হল এ সবের বাইরে থাকা।'

মিশার মনে ভয়ানক আঘাত লেগেছে কথাটায়। ও বলল, 'কেন বাইরে থাকব? আমি লাল বাহিনীর পক্ষে, তা জানেন?'

'লাল কি সাদা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু তোকে আত্মীয় হিসেবে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করি — রাজনীতির ব্যাপারে না থাকাই ভালো।'

'তার মানে আপনার মতে আমরা ধনী পুঁজিপতিদেরই রাজত্ব চালাতে দেব?' চিৎ হয়ে কম্বলখানা থুতনি অবধি টেনে নিয়ে মিশা বলল। 'না, সেনিয়ামামা, আপনার যা খুশি করুন, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।'

সেনিয়ামামা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই একমত হচ্ছিস কি না-হচ্ছিস তা নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই। গুরুজন যা বলে তা একটু কান দিয়ে শোন্ শুধু।'

'ঠিক সেইটেই তো আমি করছি। পলেভোয় আমার গুরুজন। আমার বাবাও ছিলেন তাই। আর লেনিনও তাই। ওঁরা সব্বাই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। আমিও পুঁজিপতিদের শত্রু।'

সেনিয়ামামা হাত দিয়ে একটা শাপান্ত ভঙ্গি করে বলল, 'তোর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব!' তারপর দুম্‌দাম্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

৯

'সম্রাজ্ঞী মারিয়া' যুদ্ধজাহাজ

রেভস্কে একটা অস্বস্তির আবহাওয়া। চলে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি তৈরি হচ্ছে মিশার মা।

মিশা তখন সেরে উঠেছে, কিন্তু মা তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দিত না। শুধু জানলার কাছে বসে রাস্তায় বন্ধুদের খেলা দেখবার হুকুম পেয়েছে ও।

সবাই খুব সমীহ করছে মিশাকে। এমন কি সেই অগোরদনায়া পাড়ার পেৎকা-মোরগও এসেছিল ওকে দেখতে। একটা ছড়ি উপহার দিয়ে গেছে, ছড়িটায় নানারকম নক্‌শা কাটা — প্যাঁচালো, পাঁচকোণা, চারকোণা জাফরি। যাবার আগে বলে গেছে:

'মিশা, তোর যতো ইচ্ছে আমাদের পাড়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়াস। ঘাবড়াসনি, আমরা কেউ তোর গায়ে হাতও দেব না।'

কিন্তু পলেভোয় তো এল না এখনো। মিশার মনে পড়ল সেই মজার দিনগুলোর কথা — পলেভোয় আর ও মিলে অলিন্দে বসত, মিশা শুনত সমুদ্দুর, মহাসাগর আর বিরাট এই চলমান পৃথিবীটার কথা। মিশা ভাবল একবার নিজেই হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসবে কিনা। চাইলে ডাক্তার নিশ্চয়ই ওকে ভেতরে ঢুকতে দেবেন ...

কিন্তু হাসপাতালে যেতে হল না মিশাকে। পলেভোয় নিজেই এল। রাস্তার অনেক দূর থেকেই ওর ফুর্তিভরা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল মিশা। শুনে বুকটা ওর উত্তেজনায় দুর দুর করে উঠেছিল। ফৌজী উর্দি আর উঁচু বুট পরে পলেভোয় এসেছে। রাস্তার রোদ ঝল্‌মলে তাজা ভাবটাকে যেন ও সঙ্গে করে এনেছে মিশার কামরার মধ্যে। আর এনেছে উষ্ণ গ্রীষ্মের সুবাস। মিশার বিছানার ধারের চেয়ারটা পলেভোয়ের দেহের চাপে করুণভাবে আর্তনাদ

করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সামলে গেল চেয়ারটা। পলেভোয় আর মিশা দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

পলেভোয় কম্বলের ওপর চাপড়ে দুষ্টুমি করে চোখদুটো কুঁচকে বলল:

'তারপর মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ! কেমন আছ এখন? ভালো তো?'

মিশা খুশি হয়ে শুধু হাসল একবার।

'শীগ্‌গিরই উঠবে তো?' পলেভোয় জিজ্ঞেস করল।

'মা বলেছে কাল বাইরে যেতে দেবে।'

'শুনে খুশি হলাম!' তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে ফেলল পলেভোয়। 'দু'নম্বরটাকে বেশ কায়দা করে ল্যাং মেরেছিলে কিন্তু। একেবারে মোক্ষম! বেড়ে হয়েছিল — জোর ফ্যাসাদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। তোমার কাছে আমার ঋণ থাকল হে খোকা। লড়াই থেকে ফিরে ঋণটা শোধ করে দেব।'

'লড়াই থেকে?' মিশার গলাটা কেঁপে উঠল, 'সেরিওজা কাকু ... রাগ করবেন না তো ... আমাকে নিয়ে যান না সঙ্গে। নেবে বলুন?'

'ব্যবস্থা হয়তো করা যেতে পারে।' যেন মিশার অনুরোধটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে এমনিভাবে ভুরু কুঁচকে বলল পলেভোয়। 'কী করতে হবে সেটা তোমাকে বলছি। আমার ফৌজী ট্রেনে চেপে তোমরা বাখ্‌মাচ অবধি যাবে। তারপর সেখান থেকে তোমাদের মস্কো পাঠিয়ে দেব। বুঝেছ এবার?' বলেই হো হো করে হেসে উঠল পলেভোয়।

হতাশ হয়ে মিশা টেনে টেনে বলল, 'খালি বাখ্‌মাচ পর্যন্ত? আমাকে খ্যাপাবার জন্যে বললেন তো কথাটা?'

কম্বলের ওপর আবার চাপড়ে পলেভোয় বলল, 'দুঃখ কোরো না। বড় হয়ে যতো খুশি লড়াই কোরো। তার চেয়ে বরং এখন বলো, সেই ছোরাটা কী করে তুমি পেলে?'

মিশা লাল হয়ে উঠল।

পলেভোয় হেসে বলল, 'ভয় নেই, তোমাকে খেয়ে ফেলব না আমি।'

বিব্রত হয়ে মিশা বলল, 'সত্যি বলছি, হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল জিনিসটা। একেবারেই আচম্‌কা। দেখবার জন্য হাতে নিয়েছি এমন সময় দিদিমা এসে পড়লেন, তাই সোফার গদির নিচে লুকিয়ে রাখলাম, যেখানে ছিল সেখানে রাখার ফুরসৎই পেলাম না। ইচ্ছে করে করিনি কাজটা, সত্যি বলছি!'

'ছোরাটার কথা আর কাউকে বলেছ?'

'না, দিব্যি করে বলছি!'

'ব্যস্, ব্যস্ ঠিক আছে। তোমাকে ভরসা করি আমি।' ওকে শান্ত করে পলেভোয়।

'সেরিওজা কাকু, নিকিৎস্কি কেন ছোরাটা খুঁজছে?'

জবাব দিল না পলেভোয়। পিঠটা অদ্ভুত রকম কুঁজো করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোমাকে সেই "সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজের কথা বলেছিলাম মনে আছে?' যেন একটা ঘোর কাটিয়ে উঠল এমনিভাবে গভীর নিশ্বাস ফেলে পলেভোয় বলল।

'হ্যাঁ।'

'শোনো তবে। নিকিৎস্কি ওই জাহাজেরই একজন লেফটেন্যান্ট। লোকটা একটা ঘাঘী বদমায়েশ ছিল। অবিশ্যি এ গল্পের সঙ্গে সে ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই। জাহাজে বিস্ফোরণ হবার আগে নিকিৎস্কি এক অফিসারকে খুন করে — বিস্ফোরণের মিনিট তিনেক আগে। সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিলাম আমি। অফিসারটি সবে চাকরিতে বহাল হয়েছিল, আমি তার নামও জানতাম না। তার কেবিনের কাছে ছিলাম আমি। কেন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম সে কথা বলতে গেলে অবিশ্যি মহাভারত হয়ে যাবে। তবে নিকিৎস্কির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কতগুলো ব্যাপার ফয়সালা করার কথা ছিল। যাহোক, আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের তর্কাতর্কি শুনছিলাম। অফিসারটিকে ভ্লাদিমির বলে ডাকছিল নিকিৎস্কি। এর মধ্যে হঠাৎ গুড়ুম্ করে একটা গুলির আওয়াজ! কেবিনের ভেতর ছুটে গেলাম। দেখি মেঝের ওপর পড়ে আছে অফিসার।

নিকিৎস্কি একটা সুটকেশের ভেতর থেকে সেই ছোরাখানা টেনে বের করছে। আমাকে লক্ষ্য করে ও গুলি ছুঁড়ল ... কিন্তু তাক ফস্কে গেল। তখন ও ছোরাটা তুলল। আমাদের দু'জনের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কোনো ফয়সালা হবার আগেই একটা সাংঘাতিক বিস্ফোরণে হঠাৎ কেঁপে উঠল জাহাজটা, তারপরেই আরো একটা বিস্ফোরণ। আমার মনে হল বুঝি গোটা পৃথিবীটাই ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে ... আমার জ্ঞান ফিরে এল জাহাজের ডেকে, দেখি আমার আশেপাশে সব কিছু ভাঙছে, প্রচণ্ড আওয়াজ করে ফাটছে, ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে। আমার হাতে সেই ছোরাখানা তখনো আঁকড়ে ধরা। ছোরার খাপটা নিশ্চয় নিকিৎস্কির সঙ্গেই রয়ে গেছে। কিন্তু নিকিৎস্কি তখন উধাও।'

পলেভোয় থামল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'এই ঘটনার পর কিছুদিন হাসপাতালে ছিলাম। তারপর বিপ্লব শুরু হয়ে গেল, আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ। এই নিকিৎস্কিটা তখন এক ডাকাত দলের সর্দার হয়েছে। যাহোক, এবার তো আমাদের মোলাকাৎই ঘটল। নিশ্চয় আমার নাম শুনেছিল রেভস্কের লোকের মুখে। তাই খুঁজে খুঁজে বেরও করেছে আমায়। আগেকার ব্যাপারটার ফয়সালা করার জন্যই শহর আক্রমণ করেছে ও। বিপদে পড়ার ভাবাচিন্তা ছিল না। তাই এখন যে ওর ছোরাখানাও খুব দরকার সেটা বেশ পরিষ্কার। তবে পাবে না। দুশমনের কাছে যেটা দরকারী জিনিস আমাদের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর। কিন্তু লড়াইটা তো আগে শেষ হোক। তারপর দেখা যাবে।'

আবার থামল পলেভোয়। তারপর যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে এমনিভাবে কী ভাবতে ভাবতে বলল, 'নিকিৎস্কির আর্দালীটি হল রেভস্কেরই লোক। তাকে এখানেই খুঁজে পাব ভেবেছিলাম ... কিন্তু হল না ... ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।' সোজা হয়ে দাঁড়াল পলেভোয়। 'আরে, কথা বলতে বলতে এদিকে যে সময় কতোটা হল খেয়ালই নেই। মাকে বলো জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। দুদিনের ভেতরে আমরাও রওনা হচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে চলি!'

নিজের প্রকাণ্ড হাতের মধ্যে মিশার ছোট্ট হাতখানা নিয়ে একটু দুষ্টুমি করে ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মট্‌কে বেরিয়ে গেল পলেভোয়।

১০

ছাড়াছাড়ি

ফৌজী ট্রেনখানা আগেই রেল স্টেশনে মোতায়েন ছিল। মিশা আর গেংকা অনেকবার এসে দেখে গেছে।

মালগাড়ির কামরায় পাটাতনের ওপর লাল ফৌজের সৈনিকরা নিজেদের বিছানা পেতে নিচ্ছিল। ঘোড়াদের খোঁয়াড়ও বানাচ্ছিল গাড়ির মধ্যেই। একমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ির নিচে একটা বড়ো লোহার বাক্স ছেলেদুটো আবিষ্কার করেছে।

বাক্সের ভেতর ঢুকে মিশা বলে উঠল, 'এই গেংকা দ্যাখ্, কেমন চমৎকার জায়গা। ঘুমোতে পারবি ভেতরে, যা খুশি করতে পারবি। ঘাবড়াবার কী আছে বল্ তো? একটা রাত শুধু কাটাবি এটার মধ্যে, তারপর বেরিয়ে এসে গাড়িতে ঢুকবি, তখন আমি যাব বাক্সে।'

'তোর তো আর বলতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু আমি কেমন করে ছোট বোনটাকে ফেলে আসব?' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল গেংকা।

'ভাবখানা দ্যাখ্ না! ছোট্ট বোন! বয়স তো মাত্তর তিন বছর, তুই চলে এলে ও নজর করেও দেখবে না। কিন্তু তার বদলে তুই কী পাচ্ছিস একবার ভেবে দ্যাখ্ তো। মস্কোতে যেতে পারছিস!' লোভ দেখাবার মতো করে মিশা চুমকুড়ি কাটল। 'আমার সঙ্গীদের সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে দেব। সেখানে সব জাঁদরেল জাঁদরেল ছেলে আছে। স্লাভাকে তুই পিয়ানোতে যা বাজাতে বলবি তাই বাজিয়ে দেবে, এমন কি স্বরলিপিও দেখবে না। তারপর শুরা অগুরেয়েভ্ — সে হল আবার অভিনেতা। যখন নকল দাড়ি গোঁফ লাগায় তখন তাকে চেনে কার সাধ্যি! তাছাড়া আমাদের বাড়িতে একটা সেরা "আর্ট" সিনেমা-হল রয়েছে — সেখানে সব বড়ো বড়ো সিরিয়াল্ ছবি দেখায়। ... কিন্তু, তুই যদি যেতে না চাস তো যাসনে। সার্কাসও দেখতে পাবি না। কিচ্ছুই দেখতে পাবি না। বুঝে দ্যাখ্।'

‘বেশ, তাহলে যাব।’ শেষ পর্যন্ত গেঙ্কা ঠিক করে ফেলল।

মিশা খুশি হয়ে বলল, ‘ব্যস্, এই তো চাই! বাখ্‌মাচ থেকে বাড়িতে চিঠি লিখে দিবি মস্কো যাচ্ছিস আগ্রিপ্পিনা পিসির কাছে, ওরা যেন চিন্তা না করে, ব্যস্।’

ফৌজী ট্রেনটা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই প্ল্যাটফর্ম ধরে ওরা দু’জন হাঁটতে থাকে। একটা গাড়ির গায়ে খড়িমাটি দিয়ে লেখা: ‘সদরদপ্তর’। গাড়িটার গায়ে অনেকগুলো পোস্টার আঁটা। গেঙ্কাকে ছবিগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে মিশা।

‘মুকুট আর জোব্বা পরা, লাল নাকওয়ালা ওই লোকটাকে দেখছিস ? ও হল জার। আর সাদা কোর্তা গায়ে চাবুক হাতে লোকটা হল পুলিশের একজন সার্জেণ্ট। চশমা আর খড়ের টুপি-পরা একজন মেন্‌শেভিক দলের লোকও আছে। আর এই তিনমাথাওয়ালা সাপটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে দেনিকিন, কলচাক আর য়ুদেনিচ, এই তিনজন সেনাপতিকে।’

‘আর ও লোকটা কে ?’ আরেকটা পোস্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে গেঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

পোস্টারটায় একজন পুঁজিপতিকে দেখানো হয়েছে। মাথায় সিল্কের টপহ্যাট, ভুঁড়ি ঝুলে পড়েছে, নাকটা হিংস্র শিকারী বাজের ঠোঁটের মতো বাঁকা। সোনায় ভর্তি বস্তার ওপর বসে আছে, মোটামোটা আঙুলের লম্বা নখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে।

মিশা বলল, ‘কাণা নাকি তুই ? দেখতে পাচ্ছিস না ও একটা পুঁজিপতি ? টাকার ওপর বসে আছে। ভেবেছে সারা দুনিয়াটাকে টাকা দিয়েই কিনে ফেলতে পারবে।’

‘ওখানে আবার “আঁতাত” লিখেছে কেন ?’

‘ওই একই মানে। আঁতাত হল সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সব পুঁজিপতিদের একটা জোট। বুঝলি তো ?’

'ওহো ...' একটু যেন অস্পষ্টভাবেই টেনে টেনে বলল গেঙ্কা। 'আর এটার ওপর "আন্তর্জাতিক" লিখেছে কেন?' একটা গাড়ির ওপর সাঁটা মস্তবড়ো একটা পাতলা তক্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

ছবিটাতে দেখানো হয়েছে — পৃথিবীটা শেকল দিয়ে বাঁধা, আর পেশীবহুল সবলদেহ একজন মজুর সেই শেকলটাকে বড়ো হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙছে।

'এই হল "আন্তর্জাতিক", দুনিয়ার সব মজুররা একসঙ্গে মিলে গড়েছে।' মিশা জবাব দিল। ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে মজুর, ও হল "আন্তর্জাতিক", আর শেকলটা হল "আঁতাত"। এই শেকল যখন ভাঙবে তখন সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে মজুররাই, তখন আর কোনো বুর্জোয়া থাকবে না।'

অবশেষে ওদের রওনা হবার দিন এল।

গাড়িতে মালপত্র তোলা হয়েছে। দাদামশাই আর দিদিমার কাছে বিদায় নিচ্ছে মা। অলিন্দে ওই ওঁদের দেখা যাচ্ছে — যেন কতো ছোট্টখাট্টো আর বুড়ো। দাদামশাই পরেছেন সুতো বের করা ফ্রককোট, আর দিদিমার পরনে তাঁর সেই তেলকালি মাখা ড্রেসিং গাউনটা। খালি চোখের জল মুছছেন আর কষ্টে তাঁর মুখের ভাঁজগুলো কুঁচকে উঠছে। দাদামশাই নস্যি নিচ্ছেন, চোখের জলের ভেতর দিয়েও হাসি ফুটে উঠেছে।

খালি বিড়বিড় করে বলছেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে রে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মিশা একটা সুটকেশের ওপর চড়ে বসল। তারপর উঁচুনিচু রাস্তার ওপর দিয়ে ঘড়ঘড় করে রওনা দিল গাড়ি, চলতে চলতে দোলে আর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

আলেক্সেয়েভস্কায়া পাড়া থেকে গাড়ি প্রিভক্‌জাল্‌নায়াতে এসে পড়তেই মিশা শেষবারের মতো একবার ফিরে তাকাল। সবুজ খড়খড়ি আর বেড়ার পেছনে তিনটে উইলো গাছ — ছোট্ট সেই কাঠের বাড়িটা।

১১

ফৌজী ট্রেন

গাড়ির কাঁচের জানলায় গাল রেখে মিশা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল — ফুটফুটে ছুঁচের ডগার মতো ছোট ছোট তারার দল আর স্টেশনের বাতিগুলো অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ইঞ্জিনের একটানা সিটি আর ফোঁস্‌ফোঁসানি, গাড়ি জুড়বার সময় খটাং খটাং আওয়াজ, গার্ড আর তেল-বরদারদের তাড়াতাড়ি হাঁটাচলা আর চিৎকার, জোনাকির মতো লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে ট্রেনের কাছে তাদের ছুটোছুটি করে বেড়ানো — সব মিলে রাতটাকে যেন রহস্যময় করে তুলেছে, একটা চাপা উদ্বেগে ভরে দিয়েছে।

জানলার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মিশা। জানলার কাঁচে যতোই সে গাল চেপে রাখে ততোই যেন বাইরের প্রত্যেকটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জোড়ের মুখে খটাং করে আওয়াজ করে ট্রেন পেছন দিকে ধাক্কা মেরে থামল। তারপর আর একটা ধাক্কা, এবার সামনের দিকে না থেমে ক্রমে ক্রমে গতি বাড়িয়ে ট্রেনটা সশব্দে ছুটে চলল টানা রেল কাটিয়ে। স্টেশনের বাতিগুলো এর মধ্যেই পেছনে পড়ে গেছে। ছেঁড়া মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে চাঁদ। একটা ধূসর ফিতের মতো পেছন দিকে সবেগে ছুটে চলেছে গাছপালা, গুম্‌টিঘর, ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। ... বিদায় রেভ্‌স্ক!

পরদিন ভোরে যখন মিশার ঘুম ভাঙল ট্রেন তখন চলছে না। লাফিয়ে পড়ে মিশা গাড়ির নিচের বাক্সটার দিকে ছুটল, গেংকা কেমন আছে দেখা দরকার।

একটা স্টেশনের সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিনবিহীন ফৌজী ট্রেনটা। একটা গাড়ির সামনে শুধু একজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে, তা ছাড়া গোটা জায়গাটাই জনশূন্য। দেয়ালের গায়ে খুরের গুঁতো মারছে ঘোড়াগুলো।

বাক্সটার গায়ে আঙুল দিয়ে টোকা মারল মিশা।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ‘এই গেঙ্কা, বেরিয়ে আয়!’

কোনো জবাব নেই। আঙুলের গাঁট দিয়ে ফের টোকা দিল। তবু সাড়াশব্দ নেই। গাড়ির নিচে মিশা হামাগুঁড়ি দিয়ে ঢুকে দেখল—বাক্স খালি। গেঙ্কা তাহলে কোথায়? কালই বাড়ি পালিয়ে যায়নি তো?

হঠাৎ একটা বিউগ্‌ল বেজে উঠল প্রভাত-সঙ্কেত জানিয়ে। ফৌজী ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে রেল স্টেশনে সাড়া জাগল। মালগাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে সৈন্যরা ছুটল ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুতে। যারা ডিউটিতে ছিল তারা বাসনকোসন কেতলি নিয়ে ব্যস্ত। বাতাসে পরিজের গন্ধ। একজন সৈনিক তার বন্ধুকে ডাকল, আরেকজন গাল পাড়ল কাউকে উদ্দেশ করে। তারপর সবাই ট্রেনের সামনে দুটো সারিতে লাইন বেঁধে দাঁড়াল। নাম ডাকা হচ্ছে।

সৈনিকরা ছন্নছাড়ার মতো পোষাক পরেছে, রঙ-বেরঙের সব উর্দি। মাথায় কারুর ঘোড়সওয়ারী টুপি, কারুর ধূসর পদাতিক টুপি, আবার কারুর বা জাহাজী টুপি। কেউ কেউ পরেছে কসাকদের গোল লোমের টুপি। কারুর পায়ে উঁচু বুট, কেউ পরেছে জুতো, ফেল্টবুট, গালোশ্‌। অনেকের পা আবার একেবারেই খালি। সৈনিক আছে, জাহাজী আছে, মজুর আছে, চাষীও আছে। বুড়ো, জোয়ান, বয়স্ক, নাবালক ছোকরা, সবাই দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি।

‘সদরদপ্তর’ গাড়িটার ভেতর উঁকি দিয়ে মিশা দেখল — ওই তো গেঙ্কা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জামার আস্তিনে চোখের জল মুছছে। গেঙ্কার সামনে টেবিলটার ওপাশে বসেছে নাক-বোঁচা এক ছোকরা। বড়ো বড়ো কানদুটো। দাঁতের ফাঁকে চেপে রেখেছে একখানা পাইপ। ছোকরার তালিমারা উর্দিটায় আবার আড়াআড়ি বেল্‌ট্‌ আঁটা। দারুণ চওড়া ঘোড়সওয়ারী ব্রিচেস্‌-এর দুপাশে লাল ডোরা। মাঝে মাঝেই মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মুখ গোমড়া করে থুতু ফেলছে টেবিলের ওপর দিয়ে প্রায় গেঙ্কার গা ঘেঁষে আর গেঙ্কাও প্রত্যেকবার এমন চমকে উঠছে যেন ওকে তাক করে কেউ বুলেট ছুঁড়ছে।

ছোকরাটা খুব কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা তোর নামটা কী বললি যেন?'

'পেত্রোভ্।' ফোঁস্‌ফোঁস্ করে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল গেঙ্কা।

'পেত্রোভ্! মিছে কথা বলছিস না তো?'

'ন্-ন্-না ...'

'আমার কাছে ফাঁকি দিয়ে পার পাবি না, মনে থাকে যেন!'

গেঙ্কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'সত্যি বলছি তো, দিব্যি দিয়ে বলছি!'

একটু চুপ করে পাইপ টেনে থুতু ফেলল ছোকরা। তারপর আবার চলতে লাগল জেরা। ঘুরে ফিরে একই সওয়াল জবাবের পুনরাবৃত্তি।

গেঙ্কা তাহলে গ্রেপ্তার হয়েছে! গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েই মিশা ছুটল পলেভোয়কে খুঁজতে। খোলা গাড়িগুলোর ওপর কামানের তদারক করছিল পলেভোয় একদল অফিসারের সঙ্গে।

মিশা অনুনয় করে বলল, 'সের্গেই ইভানভিচ্, গেঙ্কা যে ওদিকে গ্রেপ্তার হয়ে রয়েছে! ওকে ছাড়িয়ে দিন না। আমাদের সঙ্গেই তো মস্কো যাচ্ছিল।'

পলেভোয় অবাক হয়ে বলল, 'কে আবার তোমার গেঙ্কাকে পাকড়াল?'

'ওই তো ওখানে — সদরদপ্তরে। নীল ঘোড়সওয়ারী পাৎলুন-পরা এক ছোকরা।'

অন্য অফিসারদের সঙ্গে চোখাচোখি করে পলেভোয় হেসে ফেলল। ওদের একজন হো হো করে হেসে বলল 'স্তিওপা অফিসার বটে।'

পলেভোয় বলল, 'ঠিক আছে। এসো তো দেখি কী করা যায়। হয়তো অফিসার ছেড়ে দেবে ওকে।'

গেঙ্কার ওপর খবরদারি করছিল যে ছেলেটা সে যেই দেখল অফিসাররা গাড়িতে ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পাইপখানা পকেটে গুঁজেই ভাঙা টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল। পলেভোয়ের সামনে দাঁড়াল কাঠ হয়ে।

'কমরেড কম্যান্ডার। রিপোর্ট করতে অনুমতি দিন। সন্দেহক্রমে একটি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল গেঙ্কা, তাকে দেখিয়ে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে মোটা গলায় বলতে লাগল ছোকরা, 'আমার জেরা অনুসারে এ কবুল করেছে যে এর পদবী পেত্রোভ, নাম গেন্নাদি, বাপ মার কাছ থেকে পালিয়ে মস্কো যাচ্ছে পিসির বাড়িতে। এর বাপ হল ইঞ্জিন ড্রাইভার। এর কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়: তিনটে খালি কার্তুজের খাপ। গাড়ির নিচে একটা খালি বাক্সের মধ্যে ঘুমোনো অবস্থায় একে হাতে-নাতে ধরা হয়েছে।'

ছোকরাটা বেঁটেখাটো, গেঙ্কার চেয়ে সামান্য লম্বা। হাতখানা নামিয়ে আগের মতোই ফের কাঠ হয়ে দাঁড়াল এ্যাটেনশন্ ভঙ্গিতে। ওর আশেপাশে হাসি ঠাট্টা চলছে অথচ সেদিকে যেন খেয়ালই নেই।

কৌতুক চেপে রেখে গেঙ্কার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে পলেভোয় বলল:

'গাড়ির্ নিচে গিয়ে ঢুকেছিলে কেন?'

গেঙ্কার ফোঁপানিটা আরো বেড়ে গেল।

'দিব্যি গেলে বলছি খুড়োমশাই, মস্কোতে যাচ্ছিলাম পিসিমার কাছে। ও সাক্ষী রয়েছে।' মিশাকে দেখিয়ে দিল গেঙ্কা।

পলেভোয় বলল, 'যাক, সে আমি দেখে নিচ্ছি। স্তিওপা!' ছোকরার দিকে ফিরল পলেভোয়, 'যাও তো একবার সার্জেণ্টের কাছে, বলো আমার কাছে আসতে।'

স্তিওপা চট্‌পট্ সেলাম ঠুকে জবাব দিল, 'আচ্ছা!' তারপর বোঁ করে ঘুরেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গেল।

ছেলেদের দিকে ফিরে পলেভোয় বলল, 'আর তোমরাও যাও, বেরিয়ে যাও, কুইক্ মার্চ।'

গেঙ্কা গাড়ি থেকে নেমে গেল, কিন্তু মিশা এক মিনিট দাঁড়াল।

ফিস্‌ফিস্ করে পলেভোয়কে জিজ্ঞেস করল, 'ও লোকটা কে?'

পলেভোয় হাসল, 'ওরে ব্যস্! ও বলে এখানকার এক জাঁদরেল লোক! স্তেপান ইভানভিচ্ রেজনিকভ্, আমাদের সদরদপ্তরের চীফ্ মেসেঞ্জার বয়।'

১২

রেলগার্ডের গুমটিঘর

দু'হপ্তা ফৌজী ট্রেনটা আটকে রইল নিজ্‌কভ্‌কাতে।

গেঙকা জানিয়ে দিল, 'বাখ্‌মাচ হয়ে আমাদের যাওয়া চলবে না। ইঞ্জিন কমতি পড়ে গেছে।'

বাপ ইঞ্জিনের ড্রাইভার বলে নিজেকেও গেঙকা রেলগাড়ির ব্যাপারে খুব ওয়াকিবহাল মনে করে।

ফৌজী ট্রেনে গেঙকার উপস্থিতিটা এবার আইনগতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। ওর বাপ ওকে খুঁজে পেতে বের করে কান মলে দিয়েছিল। রেভ্‌স্কে আবার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু পলেভোয় আর মিশার মার জন্য পারেনি।

গেঙকার বাপকে পলেভোয় নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে যায়। ছেলেরা জানত না সেখানে ওদের কী কথাবার্তা হয়েছিল, কিন্তু বেরিয়ে এসে গেঙকার বাপ ভুরু কুঁচকে বলল গেঙকাকে আজ আর বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। রেভস্কে ফিরে গিয়ে ওর মা যা ঠিক করবে তাই করবে সে।

গেঙকার কাপড়জামা নিয়ে পরদিনই রেভস্ক থেকে ফিরে এল গেঙকার বাপ। আগ্রিপ্পিনা পিসির জন্য একটা চিঠিও আনে। ছেলেকে লম্বা এক বক্তৃতা শুনিয়ে বাপ রেভস্কে ফিরে গেল। যাবার সময় মিশার মার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে গেল যেন গেঙকাকে সে পিসির হাতে ভালোয় ভালোয় তুলে দেয়।

এদিকে ফৌজী ট্রেন যে কবে নিজ্‌কভ্‌কা ছাড়বে তার কোনো হদিসই নেই। লাল ফৌজের সৈনিকরা লাইনের মাঝে মাঝে আগুন জেবলে নিয়ে টিনের কড়ায় রান্না করত। আগুনের পড়ে-থাকা কালো ছাই সন্ধ্যের সময় লাল হয়ে ধিকিধিকি জবলত, আর গাড়িগুলোর মধ্যে কেউ তখন অ্যাকর্ডিয়ন বাজাত, কেউ বাজাত বালালাইকা, কেউ লোকসঙ্গীত গাইত। ছড়ানো কাঠের স্লিপারে, রেললাইন কিংবা স্রেফ মাটিতেই বসত সৈনিকরা, আলাপ করত রাজনীতি

নিয়ে, রেলওয়ের গণ্ডগোল, ভগবান নিয়ে, কিন্তু বেশির ভাগ আলাপই হত খাওয়ার কথা নিয়ে।

খাবারের ঘাটতি পড়েছে সত্যিই। একদিন মিশা আর গেঙকাও বেরিয়ে পড়ল জঙ্গল থেকে ব্যাঙের ছাতা জোগাড় করে আনবে বলে।

খুব ভোর থাকতে রওনা হল দু'জন। কারণ বন অনেক দূরে. স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ ভার্স্ট হবে। সন্ধ্যের মুখে ফিরে আসবে ভেবেছিল ওরা, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেল অন্যরকম।

কে একজন ওদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, তাই পাঁচ ভার্স্টেরও অনেক বেশি পথ হাঁটার পর ওরা বুঝতে পারল ভুল হয়েছে। সারাটা দিন মিশা আর গেঙকা বনে বনেই কাটাল। ব্যাঙের ছাতায় ঝুড়ি বোঝাই করে যখন ওরা ফিরছে ততোক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। তার ওপর আবার গোটা আকাশটা মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল।

গেঙকার পাশাপাশি রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মিশা অবাক হয়ে ভাবল, 'আচ্ছা, লাইনের নিচে স্লিপারগুলো এমন এলোমেলো পাতা হয়েছে কেন ? ঠিকমতো পা ফেলে চলাই মুশকিল। এর চেয়ে এমনি রাস্তা অনেক ভাল কিন্তু।'

ধুধু মাঠ — এপার থেকে ওপার একটা উঁচু বাঁধ চলে গেছে, রেল লাইনটা তারই ওপরে। ঝাপ্‌সা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে নজর চালালে মাঝে মাঝে দূরে, বহুদূরে একটা ছোট্ট গ্রাম দেখা যায়। ছেলেদুটোর মনে হল যেন গরুর ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কুয়োর ধারে হাঁসকলের ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা। বৃষ্টির সময় দূর থেকে জনবসতির চিহ্ন

চোখে পড়লে পথচলতি মানুষ সাধারণত এমনি ধরনেরই আওয়াজ শুনতে পায়।

ওরা যখন রেলগার্ডের গুমটিঘরটায় এসে পেঁছিল তখন আঁধার নেমে এসেছে। এখান থেকে নিজ্‌কভ্‌কা প্রায় আড়াই ভার্স্ট দূরে।

গেঙ্কা বলল, 'চল্ না ভেতরে যাই!'

'কেন? মিছিমিছি সময় নষ্ট।'

'বৃষ্টিতে ভিজে কী লাভ? এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব, তারপর সকালে চলে যাব।'

'না। মা আবার ভাববে। আমাদের ট্রেনটাও হয়তো ছেড়ে যেতে পারে।'

'ফুঃ!' গেঙ্কা শিস্ কাটল, 'এক হপ্তার মধ্যে একচুল নড়ছে না ট্রেনটা। আর যদি ছাড়েও, বাখ্‌মাচে যাবার এইটেই তো রাস্তা রে—আমরা ঠিক ধরে ফেলতে পারব। আয়, চলে আয়! অন্তত এক গেলাস করে জল তো খাওয়া যাক্।'

দরজায় ঘা দিল ওরা। বেড়ার কাছে বাঁধা একটা কুকুর রেগে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর দরজার ওপাশে মেয়ের গলার স্বর শোনা গেল, 'কী দরকার?'

সরু গলায় চিঁ চিঁ করে গেঙ্কা বলল, 'ও পিসিমা। আমরা শুধু দু'গেলাস জল চাই।'

কুকুরের ডাকটা এবার আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। কুকুরটা শেকল টানাটানি করছে।

খিলটা উঠে গেল, দরজা খুলল। সরু প্রবেশপথের ভেতর দিয়ে ছেলেদুটো ঢুকল একটা নিচু অথচ বড়োসড়ো ঘরে।

চুল্লীর ধারে কে যেন উশ্‌খুশ্ করে নড়ে উঠল। ঘুম জড়ানো গলায় এক বুড়ো বলল, 'কে রে মাত্রিওনা?'

গা চুলকে হাই তুলে স্ত্রীলোকটি বলল, 'দুটি ছেলে। জল খেতে এসেছে। ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে বেরিয়েছিলে বুঝি তোমরা?' ওদের জিজ্ঞেস করল।

'অ্যাঁ-হ্যাঁ।'

‘কোথায় চলেছ?’

‘নিজ্‌কভ্‌কা।’

‘বেশ খানিকটা দূর তো।’ টেনে টেনে বলল মেয়েমানুষটি, ‘রাতে ঘুরে বেড়াতে ভয় লাগে না?’

‘আমিও তো সেই কথাই বলছিলুম, পিসিমা!’ ওর কথার পিঠেই ফস্ করে বলে বসল গেঙ্কা, ‘রাতটা কাটাতে দেবেন আজকের মতো?’

‘কেন দেব না? কতো জায়গা ঘরে রয়েছে। রাতে বৃষ্টিতে তোমাদের যাওয়া অসুবিধে! ওদিকে মুষলধারে নেমেছে যে।’ চুল্লীর ধার থেকে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট টেনে নিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে দিল মেয়েমানুষটি। ‘আর তাছাড়া অনেক বদ লোকও আছে আশেপাশে। ট্রেনেও কাটা পড়তে পারতে। এই যে, শুয়ে পড়ো তো এখানে। যতোক্ষণ না ভোর হয় ঘুমোও। তারপর স্টেশনে যেতে বেশি সময় লাগবে না।’

দরজা আঁকড়া দিয়ে বন্ধ করে, মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে চুল্লীর ধারে উঠল মেয়েমানুষটি। ভেড়ার চামড়ার কোটে ভারি আরাম বোধ করছিল ওরা দু’জন। চট্ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

১৩

ডাকাতদল

মিশা বড়ো এলোমেলো স্বপ্ন দেখছে। একটা কালো ঘোড়ার বাচ্চা যেন ছোট লেজটা হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে খেলা করছে, চাট মারছে, তারপর যেন সে মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে গেল একটা খাড়া পাহাড়ের নিচে। সবাই হেসে উঠল। পলেভোয়, দাদামশাই, স্লাভা, নিকিৎস্কি... সব্‌বাই হাসছে মিশাকে দেখে। এবার ঘোড়ার বাচ্চাটা দাঁড়াল, পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে লাগল, তারপর আবার চাট মারতে মারতে ফের ছুটল মাঠের ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ দেখল ঘোড়াটা যেন আর বাচ্চা নেই, বড়ো একটা ঘোড়া হয়ে গেছে: প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া। উ‘চু পাহাড়টার ওপর লাফিয়ে চড়ে সে উঠতে লাগল বেয়ে বেয়ে...

উঠবার সময় ঘোড়াটাকে যেন বিশালকায় একটা কালো মাছির মতো দেখাচ্ছে, আর নিকিৎস্কি যেন তার চাবুকের হাতলটা একটা গাছের গায়ে ঘষতে ঘষতে চিৎকার করে বলছে, ‘ধর তো ওই ঘোড়াটাকে। ধর তো!’

ঘোড়ার গতি ক্রমে যেন শিথিল হয়ে এল। নিকিৎস্কি চে‘চায়, ‘ধর ঘোড়াটাকে, ধর!’ তারপর হঠাৎ ঘোড়ার পা হড়কে যায়, ভীষণ ঝট্‌পট্ করতে করতে সে গড়িয়ে পড়ে গভীর খাদের মধ্যে ...

ঝট্‌পটানিটা এসে থামে মিশারই পায়ের কাছে: আবার একটা বালতি ঘট্ ঘট্ আওয়াজ করেই স্থির হয়ে থেমে যায়।

কু‘ড়ের ভেতর থেকে আবার একটা চিৎকার ভেসে আসে উঠোনে, ‘ঘোড়াটাকে ধর।’ তারপর গাল পাড়ল, ‘চুলোয় যাক! বাল্‌তিটাকে কোন্ আক্কেলে রেখেছিল ওখানে?’

কে যেন দেশলাই জ্বালল। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল ভেড়ার লোমের ঝোলা জোব্বা-পরা একটা ঢ্যাঙা লোক। উঠোনে ঘোড়াগুলো চি‘হি চি‘হি করছে, কুকুরটাও ভয়ানক ডাকছে।

লোমের জোব্বা-পরা লোকটা কোণের দিকে চাবুক দেখিয়ে বলল, ‘ওরা কারা?’ ছেলেদুটো শুয়েছিল কোণটিতে।

রেলগার্ড ভুরু কু‘চকে জবাব দিল, ‘স্টেশন থেকে এসেছে ছোকরাদুটো। ব্যাঙের ছাতা কুড়োচ্ছিল।’ গার্ডের পরনে শুধু অন্তর্বাস, হাতে একখানা মোমবাতি। এলোমেলো দাড়ির ছায়া দেয়ালের গায়ে নাচছে। গার্ড বলল, ‘তবে ওরা ঘুমুচ্ছে, ভাবনার কোনো কারণ নেই।’

লোমের জোব্বা-পরা লোকটা খে‘কিয়ে উঠল, ‘চোপ রও!’

ছেলেদের দিকে এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে দেখতে লাগল ওদের। মিশা ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইল। নিমেষের জন্য হঠাৎ একবার চোখটা আধ খোলা

করেই দেখতে পেল কপালের ওপর ঝুলেপড়া একগোছা কালো চুল আর একটা চূড়োতোলা ফারের টুপি — তারই আড়াল থেকে জ্বল্ জ্বল্ করে তাকিয়ে আছে এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ।... নিকিৎস্কি!

গার্ডের দিকে এগিয়ে গেল নিকিৎস্কি।

'নিজ্‌কভ্‌কার ইঞ্জিন কি চলে গেছে এর মধ্যে?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীরভাবে জবাব দিল বুড়ো লোকটা।

'আরে বুড়ো শয়তান, আমায় ঠকাতে চাইছিস!' রেলগার্ডের কোর্তাটা খিম্‌চে মুচড়ে ধরল নিকিৎস্কি, তারপর এমন জোরে বুড়োটাকে টানল যে তার মাথা পেছন দিকে হেলে পড়ল।

'পাপ...' রুদ্ধশ্বাস ফেলে বুড়ো বলল, 'পাপ করব না...'

'করবি না?' বুড়োকে না ছেড়ে চাবুকের বাঁটটা দিয়ে ওর মুখে গুঁতো মেরে নিকিৎস্কি বলল, 'এক ঘণ্টার ভেতর ট্রেনটা পাস্ করার কথা, অথচ সে কথা তুই বলিসনি আমাদের?' বুড়োকে আরেকটা গুঁতো মেরেই সে ছুটল কুঁড়ের বাইরে। মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল বুড়ো।

উঠোনে চেঁচামেচি আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। তারপরেই সব চুপচাপ। কুকুরটাই শুধু সমানে চেঁচিয়ে শেকল টানতে লাগল।

যে কথাগুলো মিশা শুনেছিল সেগুলোই ওর মনে তোলপাড় করছে এখন। এক ঘণ্টার ভেতর ট্রেনটা পাস্ করার কথা! নিজ্‌কভ্‌কা থেকে! ইঞ্জিন এর মধ্যেই চলে গেছে সেখানে। ট্রেনটা ওদের সেই ফৌজী ট্রেন নয়তো? তারপরেই হঠাৎ মিশার মনে উঁকি দিল ভয়ঙ্কর চিন্তাটা—ডাকাতরা হয়তো ট্রেনটার জন্যই ওৎ পেতে রয়েছে! মিশা চট্ করে উঠল। এখন তাহলে কী করবে ও? পলেভোয়কে কেমন করে সাবধান করবে? একঘণ্টার ভেতর তো কিছুতেই নিজ্‌কভ্‌কায় পৌঁছুবে না ও আর গেঙ্কা।

মেঝেতে শুয়ে রেলগার্ড গোঙাচ্ছে। বুড়ি মেয়েমানুষটা ওকে নিয়ে কেঁদে কেটে অস্থির কাণ্ড বাধাল।

মিশা ঠেলল গেঙ্কাকে।

'এই ওঠ্! শুনতে পাচ্ছিস গেঙ্কা, উঠে পড়!'

ঘুমের ঘোরে বিড়বিড়িয়ে বলল গেঙ্কা, 'কী, কী চাই, অ্যাঁ?'

মিশা ওকে টেনে তুলল, কিন্তু গেঙ্কা লাথি ছুঁড়ে ফের ভেড়ার চামড়ার কোটটার ওপর গুটিশুটি মেরে শুতে চাইল।

মিশা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'ওঠ্, এই! ওঠ্ না!' গেঙ্কাকে সজোরে ঝাঁকুনি দিল। 'ওঠ্! এই দ্যাখ্ নিকিৎস্কি এখানেই রয়েছে। ফৌজী ট্রেনে হামলা চালাবার তালে আছে।'

নিঃশব্দে কুঁড়ের বাইরে গুটিগুটি বেরিয়ে এল দু'জন।

বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ উঠছে। ছাদ থেকে জল পড়ছে একঘেয়ে টপটপ করে। পাতলা হয়ে আসা মেঘের কিনারায় পূর্ণিমার চাঁদের ছোঁয়া, চক্‌চক্ করছে রেলের লাইন। কুকুরটার বিষণ্ণ ভুতুড়ে কান্নায় ছেলেদুটোর গা যেন শিরশির করে উঠল।

সভয়ে ওরা ছুটল রেল বাঁধের পাশের রাস্তাটা ধরে ধরে। বেশিদূর এগোয়নি, এমন সময় হঠাৎ দেখল লাইনের ওপর কতগুলো কালো কালো মূর্তি। ওরা থমকে দাঁড়াল। ভারি লোহার খটাং খটাং শব্দে ওরা বুঝতে পারল ডাকাতগুলো লাইন খুলে ফেলবার ফিকির করছে।

রেল বাঁধের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিতে ওরা কাজ হাসিল করছে; কাছেই একটা গভীর খাদ, তার ওপর ছোট্ট পুল। খাদটার পাশে একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঘোড়ার চিঁহি ডাক, ডালপালার মড়মড় পট্ পট্ শব্দ আর চাপা গলার

আওয়াজ ভেসে আসছে। বাঁধের ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এল ছেলেদুটো। ঝোপের ধার দিয়ে এগিয়ে এসেই দিল প্রাণপণ ছুট।

ঠাণ্ডা ভোর নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত যেন সরে যেতে থাকে আর প্রত্যেকটা জিনিস স্পষ্ট থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওরা দু'জন এর মধ্যেই স্টেশনের আলো দেখতে পাচ্ছে। স্টেশনের দিকে এমন মরীয়া হয়ে ছুটতে থাকে ওরা যে ধারালো কাঁকরে পা কেটে যাচ্ছে তার খেয়াল নেই, কানের ভেতর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দটুকু শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ওদের কানে আসে একটা ইঞ্জিনের একটানা সিটির আওয়াজ। এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ায় ওরা তারপর আবার ছুটে চলে সামনে—ইঞ্জিনের বাঁকা লোহার হাতল-দাঁড়গুলোর পাশ দিয়ে সাদা বাষ্পের কুণ্ডলী উঠছে, সেগুলোর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওরা। মিশা একটা হাতল ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই একটা ভারি হাত এসে চেপে ধরল ওর কাঁধটা। ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলেভোয়।

কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল পলেভোয়, 'এই, কোথায় টো টো করে বেড়াচ্ছিলে তোমরা?'

মিশা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সের্গেই ইভানভিচ্! নিকিৎস্কি, ওই ওখানে...'

'কোথায়?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল পলেভোয়।

'ওখানে! রেলগার্ডের গুমটিঘরে ... এখন সবাই খাদটার পাশে এসেছে।'

'খাদের পাশে?'

'হ্যাঁ।'

এক সেকেণ্ড কী ভাবল পলেভোয়, তারপর বলল, 'ও! তাহলে এই মতলব করেছে ওরা?.. আর আমরা ওদের অপেক্ষায় এখানে বসে রয়েছি! সাবাস, স্কাউটরা! এবার ছুট্টে চলে যাও তো নিজেদের গাড়িতে, আর দেখো যেন গাড়ি ছেড়ে বেরিও না, নয়তো তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখে দেব।'

১৪

বিদায়

লড়াই খুব তাড়াতাড়ি শেষ হল। ডাকাতরা খতম। পালাবার সময় ওরা ওদের মরা স্যাঙাৎদের পর্যন্ত নিয়ে যাবার ফুরসৎ পায়নি। সওয়ারহীন ঘোড়াগুলো পাগলের মতো মাঠে ছুটাছুটি করছিল, লাল ফৌজের সৈনিকরা ওদের ধরে জিন রেকাব সব খুলে নিল, তক্তা পেতে ঢোকাল গাড়ির ভিতরে। লাইনগুলো তাড়াতাড়ি মেরামত করেই ট্রেন আবার যথারীতি চলতে শুরু করে দিল।

বাখ্‌মাচে ফৌজী ট্রেনটা পেঁছিতেই যাত্রীবাহী গাড়িটা খুলে নেওয়া হল। মস্কোগামী কোনো ট্রেনের অপেক্ষায় থাকতে হবে তার। আর ফৌজী ট্রেনটা সেদিনই চলে যাবে ফ্রন্টের দিকে।

ফৌজী ট্রেন ছাড়ার আগে মিশাকে একবার ডেকে পাঠাল পলেভোয়। একটা গুদামঘরের ছায়ায় বসল দু'জনে। মিশা মাটিতে আর একটা খালি বাক্সের ওপর পলেভোয়। কথাবার্তা নেই, চুপচাপ বসে রইল দু'জন নিজের নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে—হয়তো ওরা দু'জনেই এক বিষয় নিয়ে ভাবছে। অবশেষে মিশার দিকে তাকিয়ে পলেভোয় হাসল।

'তাহলে, মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ, ছাড়াছাড়ির সময় এখন কী কথা বলবে বলো!'

মিশা জবাব দিল না, শুধু চোখদুটো নামাল।

পলেভোয় বলল, 'হ্যাঁ মিশা, এবার তো আমাদের বিদায় নেবার সময় হল। আবার যে কবে দেখা হবে জানি না। তাই, এই দ্যাখো তো...'

সেই ছোরাখানা বের করে বাঁ হাতের তেলোর ওপর রাখল পলেভোয়। ছোরাটার কোনো অদলবদল হয়নি, একই রকম হলদে-হয়ে-যাওয়া বাঁট, আর সেটাকে ঘিরে ব্রোঞ্জের সেই সাপ।

ডান হাত দিয়ে সাপের মাথার দিকে ছোরার বাঁটটা মোচড়াতে লাগল

পলেভোয়। সাপের শরীরের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে ঠেলে উঠতে লাগল বাঁটটা, তারপর একেবারেই আল্‌গা হয়ে খসে বেরিয়ে এল।

সাপ থেকে বাঁটটা আলাদা করে একটান দিতেই খুব পাতলা ধাতুর পাতে তৈরি একটা ছোট্ট নল্‌চে বেরিয়ে এল। সেটার ওপর আবার কী সব দুর্বোধ্য অদ্ভুত চিহ্ন: ফুটকি, ড্যাশ্‌ আর গোল দাগ।

'এটা কী বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল পলেভোয়।

মনে একটু খট্‌কা নিয়ে জবাব দিল মিশা, 'সাঙ্কেতিক লেখা।' তারপর পলেভোয়ের দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল।

'ঠিক!' পলেভোয় ওর সন্দেহ ঘুচিয়ে দিল, 'সাঙ্কেতিক লেখাই বটে। তবে এ লেখাটার অর্থ যা দেখে উদ্ধার করা যেত সেটি রয়েছে ছোরার খাপটার মধ্যে, আর সে খাপ এখন নিকিৎস্কির দখলে। এবার তো বুঝতে পারছ কেন সে ছোরাটা চায়?'

মাথা নাড়ল মিশা।

ধাতুর নল্‌চে ঠিক জায়গায় ঢুকিয়ে বাঁটটা আবার পাক দিয়ে পলেভোয় বলল:

'এই ছোরাটার জন্য একটি লোকের প্রাণ গেছে। তার মানে কিছু রহস্য আছে এর ভেতরে নিশ্চয়ই। ভেবেছিলাম সমাধানটা খুঁজে বের করব, কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে আর তা করা যাচ্ছে না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পলেভোয়। 'আর এ ছোরাটাও তো বেশিদিন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলা যাবে না। কে জানে কখন কী ঘটবে, বিশেষ করে লড়াইয়ের সময়। এই নাও তাহলে এটা।' মিশার দিকে ছোরাটা এগিয়ে দিল সে। ফের বলল, 'নাও না! যদি ফ্রণ্ট থেকে ফিরে আসি তাহলে না হয় এটাকে আবার দেখব, কিন্তু যদি না ফিরি,' মিশার দিকে তাকিয়ে সে সকৌতুকে চোখ পিট্‌পিট্‌ করল, 'যদি না ফিরি তো এটাই তোমাকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবে।'

ছোরাটা নিল মিশা।

পলেভোয় বলল, 'কিছু বলছ না যে বড়ো? ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

'না। ভয়ের আবার কী আছে!' জবাব দিল মিশা।

'তাহলে মনে রেখো, যখন তখন জিভ নাড়া একটু বন্ধ রাখতে হবে। বিশেষ করে একজন সম্পর্কে খুব সাবধান।' মিশার দিকে তাকিয়ে পলেভোয় বলল।

'নিকিৎস্কি?'

'তুমি যে এ ব্যাপারের মধ্যে আছো তা নিকিৎস্কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তাছাড়া আর কোনোদিন তাকে দেখবে কিনা সন্দেহ। আরেকজন লোক আছে। তাকে এখানে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সে লোকটাও রেভস্কেরই বাসিন্দা। তুমি হয়তো তার সামনাসামনি পড়ে যেতে পারো ... তাই সাবধানে থাকবে, মনে থাকে যেন।'

'কে লোকটা?'

মিশার দিকে আরেকবার তাকাল পলেভোয়।

'তার সম্পর্কে সাবধানে থাকতে হবে তোমায়। তুমি যে এ সব ব্যাপারে আছো তা জানতে দিও না। লোকটার নাম ফিলিন্।'

'ফিলিন, ফিলিন,' ভাবতে ভাবতে বলল মিশা, 'এক ফিলিন তো আছে মস্কোতে, আমাদেরই বাড়ির কাছে।'

'তার পুরো নাম আর পদবী কি?'

'তা জানি না। তবে তার ছেলেকে চিনি—বর্কা। ছেলেরা তাকে "হাড়কিপ্টে" বলে ডাকে।'

'হাড়কিপ্টে?' পলেভোয় হাসল, 'ফিলিন তো রেভস্কের বাসিন্দা?'

'তা বলতে পারি না।'

'ফিলিন নামটা খুবই সাধারণ বুঝলে।' পলেভোয় আপন মনে বলতে থাকে, 'আমার ধারণা রেভস্কের প্রায় অর্ধেক লোকেরই ওই নাম। তবে যার কথা আমি বলছি সে যে মস্কোতে আছে তা মনে হয় না। আরো অনেকটা দূর গ্রাম এলাকায় লুকিয়ে আছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবু হুঁশিয়ার থেকো কিন্তু। ওদের দলবলও বড়ো ভয়ানক, বিপজ্জনক। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে জবাব দিল মিশা।

পলেভোয় ওর পিঠ চাপড়ে বলল, 'আরে, ভয় কি মিশা! তুমি তো এর মধ্যেই লায়েক হয়ে গেছ বলা যায়। যাত্রা শুরু করে দিয়েছ। এখন শুধু মনে রেখো...'

পলেভোয় উঠল। সেই সঙ্গে মিশাও।

'শুধু মনে রেখো মিশা ভাইটি, জীবনটা একটা সমুদ্দুরের মতো। যদি কখনো ভাবো নিজেরটা নিয়েই থাকবে সবসময়, তাহলে তোমার অবস্থা হবে ভাঙা ফুটো নৌকোর ওপর একলা এক মাঝির মতো: চিরকাল পাড়ের কাছেই থাকবে, একই ডাঙার দিকে চেয়ে থাকবে দিনরাত আর ছেঁড়া পাৎলুন দিয়ে খালি ফুটোই বোজাবে। কিন্তু যদি সব মানুষের জন্য বাঁচো, সে হবে প্রকাণ্ড জাহাজে পাল খাটিয়ে পাড়ি দেবার মতো, বিশাল সমুদ্র সামনে থাকবে খোলা। কোনো ঝড়েই তখন তোমার বুক দুরদুর করবে না। সারা দুনিয়াটাই তোমার—তুমি তোমার সাথীদের দেখবে, তোমার সাথীরা দেখবে তোমাকে। বুঝেছ? সাবাস্!' মিশার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল পলেভোয়। আবার হাসল। তারপর লাইনের এবড়োখেবড়ো স্লিপারগুলোর ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল উন্নত সবল চেহারার মানুষটা, কাঁধের ওপর ধূসর ফৌজী ওভারকোট ফেলে।

ট্রেন ছাড়ার আগে একটা জনসভা হল। শহরের অনেক বাসিন্দা আর ডিপোর মজুররা জড়ো হয়েছিল স্টেশনে। মেয়েরা সূর্যমুখীর বিচি চিবোতে চিবোতে প্ল্যাটফর্মে ঘুরতে লাগল আর পল্টনদের দিকে তাকিয়ে হাসল, পল্টনরাও হাসল।

পলেভোয়ই শুরু করল সভার কাজ। সদরদপ্তর গাড়ির ছাদের ওদের 'আন্তর্জাতিক' প্রতীক আঁকা সেই ঢালটার ওধারে দাঁড়াল সে। বলল, সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর আজ বিপদ হানা দিচ্ছে, নতুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে সারা পৃথিবীর পুঁজিপতিরা আক্রমণ করেছে। তবু মজুর আর চাষীদের শক্তি সমস্ত দুশমনকেই চূর্ণবিচূর্ণ করবে, মাতৃভূমির ওপর স্বাধীনতার পতাকা উঠবেই। পলেভোয় শেষ করতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল 'হুর্‌রে'।

এর পরের বক্তা একজন সৈনিক। সে বলল, সেনাবাহিনীতে রসদ যথেষ্ট নেই, কিন্তু সেনাবাহিনীর অটুট মনোবল আর নিজেদের ন্যায় উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসই তাদের অপরাজেয় করে তুলেছে। এ বক্তাকেও তারিফ করে লোকে

চেঁচাল 'হুর্‌রে'। গাড়ির ছাদে বসেছিল মিশা আর গেঙকা, মহা উৎসাহে হাততালি দিয়ে ওরা 'হুর্‌রে-হুর্‌রে' করে এমন চেঁচাল যে ওদের গলাই উঠল সবার ওপরে।

সভার পর ফৌজী ট্রেন স্টেশন ছাড়ল। মালগাড়ির খোলা দরজাগুলোর সামনে লাল ফৌজের সৈন্যরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কেউ বসে বসে পা দোলাচ্ছে ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো আর ছেঁড়া পট্টি দেখিয়ে দেখিয়ে, আর সবাই গাইছে 'আন্তর্জাতিক' গান। গানের সুরে প্রথমে গম্‌গম্‌ করে উঠল স্টেশনটা, তারপর সে সুর ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তজোড়া স্তেপের মাঠে, সীমাহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে ভেসে গেল গানের সুর।

প্ল্যাটফর্মের লোকেরা গলা মিলিয়ে নিজেরাও গেয়ে উঠল। পরিষ্কার গলায় গান ধরল মিশা। গাইতে ওর বুকটা যেন ভরে ওঠে, শিরদাঁড়ায় গর্বের শিহরণ জাগে, গলাটা যেন কিসে বুজে আসতে চায়, চোখের জল বাগ মানে না, জলে ভরে ওঠে চোখদুটো। ট্রেন ক্রমে ছোট থেকে আরো ছোট হতে থাকে, তারপর অবশেষে লম্বা বাঁকা লেজ ঘুরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্ধ্যের আকাশে মিট্‌মিটে তারা ফুটে ওঠে। প্ল্যাটফর্ম খালি করে ভিড়টা সরে যায়।

কিন্তু মিশা নড়ল না।

ট্রেনটা যেখানে মিলিয়ে গেল সেই দিকটায় তাকিয়ে মিশা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। চক্‌চকে জট পাকানো লাইনগুলো সেখানে একটা সরু ইস্পাতের রেখায় মিশে কুয়াশাভরা ঢিবির মতো দিগন্ত ভেদ করে চলে গেছে। মনে মনে যেন মিশা দেখতে পায় ফৌজী ট্রেনের ভেতরে লাল ফৌজের সৈনিকদের। ধূসর ফৌজী ওভারকোট-পরা পলেভোয় আর সবল পেশীবহুল-দেহ সেই মজুর যেন ভারি হাতুড়ির ঘায়ে পৃথিবীর শেকলটাকে ভেঙে ফেলছে।

দ্বিতীয় পর্ব

আরবাত স্ট্রীটের আঙিনা

১৫

এক বছর বাদে

বারান্দায় চলাফেরা হতেই মিশার ঘুম ভেঙে গেল। একবার চোখ খুলেই আবার চট্ করে চোখ বুজল। আশেপাশের উঁচু উঁচু বাড়ির ধার ঘেঁসে ছোট্ট একফালি রোদ কামরার ভেতরে এসে ঢুকেছে। জানলা আর মেজের গালিচাটার মাঝামাঝি অসংখ্য অগণন ধুলোর কণা নেচে বেড়াচ্ছে ওই রোদটুকু গায়ে মেখে। গালিচার ওপর ছুঁচের নকশা করা ডোরাদার বাঘটাও যেন ঝিমোচ্ছে চোখজোড়া

কু'চকে, থাবা মেলে দিয়ে মাথাটা রেখেছে থাবার ওপর। বাঘটা জরাজীর্ণ, বুড়ো, নেহাৎই নিরীহ।

রোদের রেখাটা সরু হতে হতে ক্রমে সরে আসে গালিচা ছেড়ে টেবিলের কিনারায়। মার খাটের নিকেলের অংশগুলোতে পড়ে রোদটা ঝক্‌মক্‌ করে ওঠে, তারপর সেলাইয়ের কলটায়, তারপর হঠাৎ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায় — যেন কোনো কালেই এঘরে তার অস্তিত্ব ছিল না।

ঝাপ্‌সা হয়ে যায় কামরাটা। একটা খোলা জানলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় আল্‌তোভাবে ক্যাঁচ্‌ করে ওঠে। নিচ থেকে, আরবাত স্ট্রীট আর আঙিনাটা থেকে ট্রামগাড়ির ঘণ্টার আওয়াজ, মোটরগাড়ির ভেঁপু আর ছেলেপিলেদের উল্লসিত কলরব ভেসে আসে। ছুরি-কাঁচি শাণওয়ালা আর পুরনো কাপড় ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনা যায়। সব মিলে ঠিক বসন্তদিনের শহুরে রাস্তার বেসুরো কোলাহলের মতো।

মিশা ঝিমোচ্ছে। ইচ্ছে হয় আবার ঘুম দেবার, কারণ ছুটির প্রথম দিনটাতেই এভাবে নিত্যিকার মতো ওঠার কোনো মানে হয় না। ইচ্ছে করলেই সারাটা দিন সে কুঁড়েমি করে কাটাতে পারে। কী মজা!

একটা ইস্তিরি হাতে মা ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর ভাঁজ করা কম্বল বিছিয়ে ইস্তিরিখানা রাখল একটা উল্টোনো সামভারের আংটার ওপর। মার পাশে একটা চেয়ারে রয়েছে এক গাদা শুকনো খরখরে কাচা কাপড়।

মা বলল, 'ওঠ্‌রে মিশা, ওঠ্‌!'

মিশা নড়লই না। ও ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে মা সেটা সবসময় ধরে ফেলে কেমন করে? ও তো চোখ বুজেই থাকে ...

বিছানার কাছে এসে মা বলল, 'নে ওঠ্‌, আর ঘাপ্‌টি মেরে থাকিস না ...'

হাসি চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল মিশা। মা যেই কম্বলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল, অমনি মিশা হাঁটুজোড়া থুতনি অবধি গুটিয়ে নিল, কিন্তু মার ঠাণ্ডা হাতটা ঠিক ওর গোড়ালি ধরে রয়েছে। আর মিশা পারে না। হি হি করে হেসে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল।

চট্‌পট্‌ গায়ে জামা চড়িয়ে রান্নাঘরে গেল।

আবছা আলোয় সাদা টালির মেজেটা চক্‌চক্‌ করছে। মেজের জায়গায় জায়গায় কাঠ কাটার ফলে ক্ষয়ে-যাওয়া দাগ। শীতের সময় জলের পাইপটা ফেটে গিয়েছিল, তাই ময়লাটে দেয়ালটার গায়ে এখনও লম্বা লম্বা কালো দাগ রয়েছে। মিশা জামা খুলে ফেলল; ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ঠাণ্ডা জলে যেমন করে হোক গা ধুয়ে ফেলবেই। অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক করেছিল এ অভ্যেসটা ও করে ফেলবে, শুরু করবে ইস্কুল ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

কাঁপতে কাঁপতে জলের কলটা খুলে দিল, হাত ধোবার গামলায় হুড়হুড় করে পড়তে লাগল জল, মিশার ঘাড়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের ছিটে এসে লাগল।

বর্‌র্‌র্‌ ... বড্ডো বেশি ঠাণ্ডা যেন! ও অবিশ্যি ঠিক করেছিল ছুটির প্রথম দিন থেকেই শুরু করবে, তবে ... ছুটি তো আবার দু'হপ্তা আগে থেকেই শুরু হয়ে গেল কিনা! ছুটি হবার কথা ছিল পয়লা জুন তারিখে, আর আজকে তো মোটে মে মাসের পনেরোই। ইস্কুল যদি মেরামতের কাজের জন্য আগেভাগেই ছুটি দিয়ে দেয় সে কি ওর দোষ? বেশ, ঠিক আছে: পয়লা জুন থেকেই তাহলে গা হাত ঠাণ্ডা জলে মাজাঘষা শুরু করবে। জামাটা আবার গায়ে ঢোকাল মিশা ...

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল নিজের চেহারাটা।

ওর ওই থুতনিটা বড্ডো বিশ্রী! ওটা যদি একটু সামনে বাড়ানো থাকত তাহলে ওর মনের জোরও হত খুব বেশি। জ্যাক লণ্ডন তো তাই লিখে গেছেন। আর মিশার এখন মনের জোর বাড়ানো খুবই দরকার। এই তো মাত্র কয়েক মিনিট আগেও ও ঠাণ্ডা জলে গা হাত ধুতে পারল না! যখনই কিছু করবে বলে মনে মনে ভেবেছে প্রত্যেকবারই ওই এক ব্যাপার।

ওর যে ডায়েরীটা লিখবার কথা ছিল সেটার অবস্থাটাই দেখো না। একটা নোটবইয়ে লিখতে শুরু করল, অথচ প্রথম পাতার পর আর এগোতেই পারল না — ওর ধৈর্যেই কুলোয়নি। তারপর ধরো ভোরে উঠে ব্যায়াম — সেটাও ও বন্ধ করে দিয়েছে তো! আর অজুহাতও খুঁজে পায় কতো রকম! আসল কথা হল স্রেফ কুঁড়েমি, তা ছাড়া কিছু না। তারপর এই যে কথায় কথায় 'কাল হবে, কাল হবে' করে, সেটাই বা কী? সোমবারে করব, মাসের প্রথমে হবে, স্কুলের নতুন টার্ম তো শুরু হোক ...... যে কোনো কাজ করতে গিয়ে কাজটাকে ও ঠেলে দেবেই এই তারিখগুলোর ঘাড়ে। ভাবলেই তো মেজাজ খারাপ হয়ে যাবার কথা। মনে মনে মিশা বলল, 'তুমি একটি মিন্‌মিনে, শিরদাঁড়া বলে কিছু নেই। এসব বন্ধ করার এখন সময় হয়েছে।'

থুতনিটা বাগিয়ে ধরে মিশা। এই তো, এইরকম থুতনিই তো মনের জোরওয়ালা মানুষদের থাকা দরকার। বরাবর দাঁতটা এইভাবে চেপে রাখতে হবে, তাহলেই আস্তে আস্তে থুতনিটা ঠেলে বেরিয়ে আসবে ...

টেবিলে গরম আলুসেদ্ধ থেকে ধোঁয়া উঠছে। কালো রুটির দুটো টুকরো পাশের প্লেটটিতে — সারাদিনের বরাদ্দ খাবার। নিজের এক টুকরো রুটি মিশা তিনভাগ করে কাটল — সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, তিনবেলাই চলবে। এক টুকরো তুলে নিল। এত ছোট্ট টুকরোটা যে কেমন করে কোথা দিয়ে গলায় চলে গেল তা ও লক্ষ্যই করেনি। ভাবল, দ্বিতীয় টুকরোটা খাবে কিনা। রুটি ছাড়াই সন্ধ্যের খাবার চলতে পারে হয়তো ... না, না! তা কী করে হবে? এখুনি যদি ও সবটুকু সাবাড় করে দেয় তাহলে সন্ধ্যের সময় মা নিশ্চয়ই তার নিজের ভাগটা ওকে দিয়ে দেবে, আর নিজে না খেয়ে থাকবে।

মিশা রুটিটা আবার রেখে দিল। তারপর থুতনিটা বেশ জোর দিয়ে যখন ও বাগিয়ে রেখেছে তখন যে কোন্ ফাঁকে একটা গরম আলুও চিবিয়ে ফেলেছে খেয়ালই করতে পারেনি, যন্ত্রণায় জিভটা কামড়ে ফেলল ও।

১৬

বইয়ের আলমারি

মিশার ইচ্ছে ছিল সকালের খাবারটা খেয়েই বাইরে বেরুবে।

'কোথায় চলেছিস?' মা ওকে ধরে ফেলল যাবার মুখে।

'বেড়াতে।'

'আঙিনায়?'

'হ্যাঁ ... আঙিনায়ও যাব।'

'আর তোর বইগুলো?' আঙুল ভিজিয়ে ইস্তিরিটায় হাত দিল মা, 'বইগুলো কে গুছিয়ে রাখবে শুনি?'

'কিন্তু আমার যে একদম সময় নেই মা।'

'তার মানে তোর বইগুলো আমাকে গোছাতে হবে এই তো?' আংটার ওপর ইস্তিরিটা নামিয়ে রেখে মিশার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল মা।

মিশা বিড়বিড়িয়ে উঠল, 'বেশ, গুছিয়ে রাখছি। তোমার তো সবসময়ই এই! যখন আমার খুব তাড়া তখনই এসে বাগড়া দাও।'

বইয়ের আলমারির দ্বিতীয় তাকটা মিশার। গোটা আলমারিটা বানানো হয়েছিল বই রাখার জন্য, তবে ওদের তো আলমারি বা আল্‌না নেই, তাই এরই মধ্যে বাসনকোসন জামাকাপড় সবই থাকে।

বইগুলো বের করে মিশা তাকের ধুলো ঝাড়ল জুতোর বুরুশ দিয়ে। তারপর একখানা খবরের কাগজ পেতে দিল। মেজেয় বসে বইগুলো আলাদা আলাদা করে বাছল। এক এক করে ফের গুছিয়ে রাখল তাকের মধ্যে।

প্রথমে রাখল দু'খণ্ড ব্রোখাউস্‌ ও এফ্রনের 'বিশ্বকোষ'। মিশার কাছে এগুলোর কদর সবচেয়ে বেশি। এ বইয়ের পুরো বিরাশী খণ্ড সঙ্গে থাকলে কাউকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না। পুরো বিশ্বকোষটা মুখস্থ করে ফেলতে পারলেই বড়োদের পড়া শেষ হয়ে গেল।

বিশ্বকোষের পর দু'খণ্ডে 'অ্যাড্ভেঞ্চার জগৎ', নিকোলাই গোগলের 'রচনাসংগ্রহ' একখণ্ড, তলস্তয়ের 'শৈশব, কৈশোর ও যৌবন', গন্চারোভের 'ওব্লোমভ্' আর মার্ক টোয়েনের 'টম্ সয়ারের অ্যাড্ভেঞ্চার'।

কিন্তু এটা আবার কী? হুম্! চারস্কায়ার লেখা ... 'রাজকুমারী জাভাহা' ... বইটা রাখতে গিয়ে মিশা একটু ইতস্তত করল। বাজে বই। বাজে বলতে বাজে! রাজ্যের ন্যাকামি! মেয়েদের জন্য এ বই। একমাত্র ভালো জিনিস হল বইটার মলাট। স্লাভাটা হয়তো এটার সঙ্গে নিজের একটা বই বদলাবদলি করতে রাজি হবে। যতো সুন্দর সুন্দর মলাটওয়ালা বই-ই ও ভালোবাসে কিনা।

এগিয়ে গিয়ে জানলাটা খুলল মিশা। সঙ্গে সঙ্গে কামরার মধ্যে এল রাস্তার হট্টগোল আর গাড়ির আওয়াজ। লম্বা লম্বা ব্লকে ভাগ করা বাড়িগুলোর একেকটা একেক রকম উঁচু, সর্বদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। জাফরি-কাটা লোহার ঝুল্বারান্দাগুলো যেন আঠা দিয়ে বাড়িগুলোর গায়ে সেঁটে দেওয়া, সরু লোহার মইগুলোই ঠিক অমনিই দেখতে। নীল ফিতের মতো এঁকেবেঁকে গেছে মস্কো নদী, আর দূর থেকে দেখলে পুলগুলোকে মনে হয় ফিতেটার ওপর গিঁট দেওয়া একেকটা কালো বাঁধুনির মতো। সবচেয়ে কাছের গির্জাটার সোনালি গম্বুজে যেন হাজারটা সূর্য ঠিকরে পড়ছে। আর পেছনেই ক্রেমলিনের চূড়োর তীক্ষ্ন ফলাগুলো আকাশের গায়ে মাথা জাগিয়ে।

জানলা দিয়ে মাথা বের করে পাশের বাড়িটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মিশা ডাকল, 'স্লাভা-আ-আ!'

সরু সরু লম্বা আঙুল আর ফ্যাকাশে মুখওয়ালা একটা ছেলে স্লাভা। তেতলার জানলা থেকে মুখ বাড়াল। বন্ধুরা ওকে ঠাট্টা করে বলত 'বুর্জোয়া', কারণ ও সবসময় বো-নেকটাই পরত, পিয়ানো বাজাত আর মারামারি করত না কখ্খনো। ওর মা হলেন একজন নামকরা গাইয়ে আর বাবা স্ভের্দ্লভ্ কারখানার প্রধান ইঞ্জিনীয়র। ওই কারখানায় মিশার মা, গেঙকার পিসি আর এ বাড়ির অনেক বাসিন্দা কাজ করে। অনেকদিন ধরে কারখানাটা বেকার পড়ে ছিল, এখন আবার চালু করার যোগাড়যন্ত্র চলেছে।

মিশা বলল, 'স্লাভা! বদলাবদলি করবি?' বইখানা উ'চু করে দেখাল সে, 'একেবারে পয়লা নম্বরের! "রাজকুমারী জাভাহা"। একবার ধরলে আর ছাড়তে পারবি না।'

স্লাভা চে'চিয়ে বলল, 'না। আমার নিজেরই আছে।'

'তাতে আর কি হল! চেয়েই দ্যাখ্ একবার মলাটটা! বেশ, না? তোর "গ্যাড্ফ্লাই"টার বদলে এটা পেতিস কিন্তু।'

'না!'

'বেশ, তাহলে নিসনি! শেষে নিজেই একদিন চাইবি, তখন কিন্তু আর পাবি না।'

'কখন বেরুচ্ছিস?' স্লাভা জিজ্ঞেস করল।

'একটু বাদেই।'

'গেঙকাদের ওখানে আয় না। আমি থাকব'খন।'

'আচ্ছা।'

জানলার কাছ থেকে লাফিয়ে সরে এসে মিশা ফের বইটা তাকে রেখে দিল। থাক্ কিছু দিনের জন্য, তারপর হেমন্ত কালে একবার চেষ্টা করে দেখবে ইস্কুলের কেউ বদলাবদলি করতে রাজি হয় কিনা।

'সমুদ্রের ২০, ০০০ লীগ্ নিচে', 'আফ্রিকার জঙ্গলে', 'চামড়ার মোজা', 'কন্ধকাটা ঘোড়সওয়ার' ... সবই কাউবয়, প্রেইরি, রেড ইণ্ডিয়ান, মাথার খুলি আর মেক্সিকোর মুস্টাং ঘোড়া নিয়ে লেখা... হ্যাঁ, এগুলোই হচ্ছে বইয়ের মতো বই!

এবার পড়ার বইয়ে এসো: কিসিলেভ, রীব্‌কিন, ক্রায়োভিচ্‌, শাপশ্‌নিকভ আর ভাল্‌ৎসেভ ... এ সব বই গত বছরে ও খুলেছিল কদাচিৎ। শীতের সময় ইস্কুলে চুল্লীর ব্যবস্থা ছিল না, এমন ঠাণ্ডা গেছে যে ছেলেদের আঙুল অবধি জমে গিয়েছিল, লিখতে পারেনি। কিন্তু ইস্কুলে ওরা যেত ঠিকই। গরম জোলো স্যুপ খাবার লোভে। উনিশশো একুশ সালের সেই শীত—যেমন সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, তেমনি অনাহারে অনশনে কেটেছে।

এক্‌সারসাইজ খাতা, ডাকটিকিটের খাতা, বাঁকা ছুঁচওয়ালা কম্পাস, মাপের দাগ মুছে যাওয়া সেট্‌স্কোয়ার আর এ্যাঙ্গেল মাপা যন্তরটা সরিয়ে রাখল মিশা। তারপর মায়ের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে ওর গোপন পুঁটলিটার দিকে হাত বাড়াল। পুরনো পত্রিকার একটা বাণ্ডিলের পেছনে লুকোনো আছে পুঁটলিটা।

ওরই ভেতরে রয়েছে সেই ছোরা। কাপড়ের ওপর থেকেই ছোরার ফলার শক্ত ইস্পাতটা মিশা হাত দিয়ে পরখ করে দেখল। পলেভোয় এখন কোথায়? একবার একটা শুধু চিঠি এসেছিল, তারপর আর কোনো খবরই নেই। কিন্তু মিশা জানে, পলেভোয় আসবেই। বড়ো রকমের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এখানে ওখানে লড়াই চলেছে এখনো। মাত্র এই গত ফেব্রুয়ারি মাসে কারেলিয়া থেকে ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীদের তাড়ানো হয়েছে। দূর প্রাচ্যে সোভিয়েতের সৈন্য জাপানীদের হটিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু নতুন যুদ্ধের জন্য এর মধ্যেই আঁতাত তৈরি হতে শুরু করেছে। এখন সবকিছুরই লক্ষ্য সেইদিকে।

হয়তো বা এতদিনে নিকিৎস্কি মারাই

গেছে। কিংবা আর সব শ্বেতরক্ষী অফিসারদের মতো সীমান্ত পার হয়ে পালিয়ে গেছে। ছোরার খাপটা ছিল ওরই কাছে। সুতরাং ছোরার রহস্যটা বোধহয় আর কোনো কালেই ভেদ করা যাবে না।

মিশার এবার মনে হল ফিলিনের কথা। বরুকার বাবা ফিলিন, মালগুদামের দেখাশোনার ভার তারই ওপর। লোকটার পরিচয়টা কি? পলেভোয় যার কথা বলেছিল সেই ফিলিনই নয় তো? মিশা ভেবেছিল লোকটা বোধহয় রেভস্কেরই বাসিন্দা। অনেকবার মাকে জিজ্ঞেসও করেছে লোকটার সম্পর্কে, কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলতে পারেনি মা, গেঙকার পিসি আগ্রিপ্পিনা তিখনভনা অবিশ্যি জানেন। একবার কথায় কথায় তাঁকে ফিলিনের কথা জিজ্ঞেস করেছিল মিশা। জবাবে উনি শুধু চটে গিয়ে থুতু ফেলে বললেন, 'আমি জানি না, জানবার ইচ্ছেও নেই... বদ গোছের লোক... ওর গোটা পরিবারটাই ওইরকম...' আর কোনো কথাই আগ্রিপ্পিনা পিসির মুখ থেকে বের করতে পারেনি মিশা। কিন্তু 'পরিবারের' কথা বলেছেন যখন তখন নিশ্চয় কিছু খবর রাখেন—মিশার তো তাই ধারণা। ওঁর মুখ থেকে কিছু বের করাও অসম্ভব। লম্বা, শক্ত সমর্থ মেয়েমানুষ। বড়ো কঠিন ঠাঁই। গোটা বাড়িতে ও'র মতো কড়া লোক আর নেই। বাসিন্দারা ওকে বাঘের মতো ভয় করে, এমন কি বাড়ির নায়েবও তোষামোদ করে ওঁকে 'আমাদের ঠাঁই আগ্রিপ্পিনা তিখনভনা মহাশয়া' বলে উল্লেখ করে। তার ওপর উনি আবার মহিলা সংসদের প্রতিনিধিও* বটে, কারখানায় উনি তাই সবচেয়ে গণ্যমান্য মহিলা। শুধু গেঙকাটাই ভয় করে না ওর পিসিকে। সামান্য ঝগড়া হলেই অমনি কাপড়জামা বাঁধাছাঁদা শুরু করে দেয়, বলে রেভস্কে ফিরে যাচ্ছে। আগ্রিপ্পিনা পিসিও প্রত্যেকবারই হার মানেন।

...ফিলিনের পরিচয় জানার আর কোনো উপায় কি নেই? পলেভোয়কে লোকটার পুরো নামটা জিজ্ঞেস করতে ও যে কেন ভুলে গেল কে জানে!..

---

* সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে মেয়েদের ভেতর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সংসদ গঠিত হয় তারই কথা লেখক বলছেন।

মিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোরাটা আবার পত্রিকাগুলোর পেছনে রেখে দিয়ে বইয়ের আলমারিটা বন্ধ করল। এখন আর বাড়িতে আটকে থাকার কোনো কারণ নেই, তাই চলল গেঙ্কাদের ওখানে।

১৭

গেঙ্কা

চেয়ারে দাবার ছক আর বোড়ে সাজিয়ে খেলছিল ছেলেরা। স্লাভা দাঁড়িয়ে আছে আর গেঙ্কা বসে আছে তোষক ঢাকা একটা প্রকাণ্ড বিছানার ধারে। বালিশগুলো সব পিরামিডের মতো উঁচু করে রাখা। চুড়োটা প্রায় ছাদের কাছাকাছি ঝোলানো ছোট্ট আইকনটাতে গিয়ে ঠেকেছে।

ওদের পাশেই একটা টেবিলে গেঙ্কার পিসিমা ময়দা ঠাসছেন। কী একটা ব্যাপারে যেন তিতিবিরক্ত, তাই মিশা ঘরে ঢুকতে খুব কড়া নজরে ওকে দেখলেন।

মিশাকে দেখে গেঙ্কা বলে উঠল, 'আরে, তুই এতোক্ষণ ছিলি কোথায়? এই দ্যাখ্, এই দ্যাখ্! তিনচালে ওকে কিস্তি মাৎ করে দিচ্ছি ... এই যে, এই এক্কা, দুরি, তিরি।'

'দুরি, তিরি!' হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন পিসিমা, 'বিছানা থেকে নাম্ বলছি! বসার বেশ জায়গা পেয়ে গেছিস?'

যেন এই উঠবে এমনিভাবে একটু নড়ল গেঙ্কা।

'উশখুশ না করে উঠে বস্! যাকে বলছি তার কানে কথা যাচ্ছে না নাকি?'

বেলুনি নিয়ে মারমুখী হয়ে ময়দার কাইটাকে আক্রমণ করলেন আগ্রিপ্পিনা পিসি। তারপর ফের গেঙ্কার দিকে ঘুরে বললেন:

'লজ্জার কথা! এত বড়োটা হয়েছিস অথচ বাঁধাকপিটাকে কুপিয়ে কেটে একাকার কাণ্ড করলি! কেন কেটেছিস বল্‌তো?'

'বেশ তো, এই বলছি: কপির গোড়াটা আমার দরকার হয়েছিল। ওটা দিয়ে তোমার নিশ্চয়ই কোনো কাজ হত না?'

'কাটলি যদি তো সাবধানে কাটতে পারলি না, হতভাগা গর্দভ? কপির পুর-ভাজা বানাব বলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখলাম আর তুই কিনা গিয়ে সব পাতা-টাতা সাবাড় করে এলি, অ্যাঁ!'

গেঙ্কা পরের চালটার কথা ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, 'কপি পাতায় মাংসের পুর-ভাজা! ওটা হল কূপমণ্ডূকদের কুসংস্কার, পিসিমা। আমরা তো বুর্জোয়া নই যে কপি দিয়ে মাংসের পুর খাব। তাছাড়া জিনিসটা যে খুব পাকাপোক্ত হত তাও তো নয়—তুমি নিশ্চয়ই মাংসের জায়গায় পরিজের পুর দিতে, তাই না? মাংসের পুর দিলে সে এক আলাদা কথা ছিল।'

'হ্যাঁরে ছোঁড়া, তুই কি আমাকে শেখাবি নাকি?'

'তোমার ব্যাপার দেখে আমি থ'বনে যাচ্ছি পিসিমা, সত্যি বলছি,' বোড়েগুলোর দিকে তাকিয়ে সমানে বক্‌বক্‌ করে চলল গেঙ্কা, 'তুমি হলে একজন কেউকেটা মানুষ, অথচ তুমিই কিনা বাঁধাকপির পুর আর টুর নিয়ে এত মাথা গরম করছ। সামান্য একটা ছোট্ট কপির ডাঁটা নিয়ে এত অস্থির হয়ে উঠে শরীর খারাপ করছ।'

ময়দার কাইটাকে ছোট ছোট ছিলকে ছিলকে কেটে আগ্রিপ্পিনা তিখনভনা বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'দ্যাখ্‌, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। অনেক হয়েছে, এখন মুখ বন্ধ! মুখ বন্ধ কর বলছি, নয়তো দেখতে পাচ্ছিস এই বেলুনিটা?'

'বেশ। তবে বেলুনির ভয় দেখিও না যেন। তুমি আমায় মারতে পারবে না।'

'কেন, তুই কী মনে করিস?' মারমুখোভাবে একেবারে টানটান হয়ে মাথা উঁচু করে পিসিমা বললেন।

'তুমি পারবে না।'

'কেন পারব না জিজ্ঞেস করি?'

'কেন?' একটা বোড়ে হাতে তুলে নিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল গেঙ্কা, 'কারণ তুমি যে আমার ভালোবাসো পিসিমা-মণি, তুমি আমায় ভালোবাসো, আমার কদর করো।'

আগ্রিপ্পিনা পিসি হেসে ফেললেন, 'উঃ, কী পাজি ছেলেরে বাবা! তুই এত পাজি কেন রে?'

হঠাৎ স্লাভা বলল, 'কিস্তি মাৎ!'

ভয় পেয়ে গেঙ্কা বলল, 'কই? কোথায়? কোথায় দিলি দেখি? ঠিকই তো... পিসিমা, দেখলে?' অভিযোগের সুরে বলল গেঙ্কা, 'তোমার ওই বাঁধাকপির পুরের জন্য বাজিটা জিততে জিততেও হেরে গেলাম।'

রান্নাঘরে যেতে যেতে পিসিমা বললেন, 'তাতে কোনো লোকসান হয়নি, নিশ্চয়ই!'

স্লাভা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা গেঙ্কা, তোর ব্যাপারটা কি বল্‌তো? সব সময় খালি পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করিস? তোর লজ্জা হওয়া উচিত!'

'আমি? ঝগড়া করি? কী আবোলতাবোল বকছিস! এটাকে তুই ঝগড়া বলিস? ওঁর কথা বলার দস্তুরই তো এই।' ফের ঘুঁটি সাজায় গেঙ্কা, 'মিশা, আয় এক বাজি খেলি।'

মিশা বলল, 'না। চল্‌ তার চেয়ে আঙিনায় যাই। এখানে থেকে কী হবে?'

ঘুঁটিগুলো উঠিয়ে রেখে গেঙ্কা ছকটা গুটিয়ে ফেলল। তারপর ছেলেরা সবাই বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

১৮

হাড়কিপ্‌টে বর্‌কা

মে মাস পড়েছে অথচ আঙিনার বরফ এখনও গলে যায়নি।

শীতের সময় হাওয়ার টানে যে তুষারের স্তূপ জমেছিল সেগুলো ওইখানেই থিতু হয়ে কালো আর জমাট বেঁধে গেছে। আটতলা উঁচু ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলোর আড়াল পেয়ে সূর্যের তেজের কাছে আর মাথা নোয়ায়নি। আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে, সূর্যের আলো গুঁড়ি মেরে আঙিনায় ঢোকে, সরু একফালি

অ্যাস্‌ফালটের ওপর দাঁড়িয়ে ঝিমোয় ঠিক যেখানটায় মেয়েরা খড়ি-মাটি দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলার ঘর কেটে রেখেছে সেইখানে, তারপর দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে বাড়িগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জারের আমলের বড়ো বড়ো পাঁচ-কোপেকের পয়সা দিয়ে ছেলেরা 'পয়সা মারা' খেলছিল। যদ্দুর আঙুল বাড়ানো যায় বাড়িয়ে গেঙ্কা মিশার পয়সাটাকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করল।

মিশা বলল, 'ওতে লাভ নেই, পারবি না মারতে। তোর কম্ম নয়। এই হাড়কিপ্‌টে, মার। এবার তোর পালা।'

স্লাভার পয়সাটাকে তাক করতে করতে বর্‌কা বিড়বিড়িয়ে বলল, 'দ্যাখ্‌ না, ঠিক মাথার ওপরটায় লাগিয়ে দিচ্ছি একদম। এক্‌কেবারে মাথায়। এই চলল!' ওর ঢাউস চ্যাপ্‌টা পাঁচ-কোপেকটা ঠিক গিয়ে লাগল স্লাভার পয়সায়। 'বুর্জোয়া! এবার কড়ি ফ্যালো দিকি চাঁদ!'

স্লাভার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

বলল, 'আমি একেবারে ফতুর। তোর কাছে ধার রইল আমার।'

বর্‌কা চেঁচিয়ে উঠল, 'তা'লে যে বড়ো নাক গলাতে এসেছিলি? এখানে কোনো বাকির কারবার নেই হে। আমার পয়সা দে।'

'তোকে তো বললাম পয়সা নেই। যখন জিতব তখন শোধ করে দেব' খন।'

স্লাভার পাঁচ-কোপেকের পয়সাটা কেড়ে নিয়ে বর্‌কা বলল, 'ও, এই তাহলে মতলব! পয়সা শুধলে তবে এটা ফেরৎ পাবি।'

স্লাভা বলল, 'তোর নেবার কি এক্তিয়ার আছে শুনি?' ওর গলা কাঁপছে, ফ্যাকাশে গালে লাল আভা ফুটে উঠেছে। 'ওটা নেবার অধিকার তোকে কে দিয়েছে?'

পকেটে পয়সাটা গুঁজে বর্‌কা বিড়বিড় করে বলল, 'অধিকার আমার আছে। আবার খেলতে এলেই বুঝবি।'

বর্‌কাকে একটা কোপেক দিল মিশা।

‘নে, ওর পয়সাটা এবার ফিরিয়ে দে তো। আর শোন্ স্লাভা, পয়সা না নিয়ে কখ্খনো খেলতে আসবিনে।’

মাথা নাড়িয়ে বর্কা বলল, ‘এ পয়সা আমি নেব না। অন্য কারুর পয়সা চাই না। ও নিজেই দিক্।’

‘হাড়কিপ্টেমি করার শখ হয়েছে বুঝি?’

‘বেশ তো, তাই।’

‘আজ্ঞে, সেটি হবে না। স্লাভার পয়সাটা ফিরিয়ে দে মানে-মানে।’

চটেমটে খেঁকিয়ে উঠল বর্কা, ‘তুই নাক গলাস না! এ জায়গার মালিক কি তুই?’

বর্কার দিকে এগিয়ে গেল মিশা। ‘ফিরিয়ে দিবি কি না বল্?’

গেঙকাও বর্কার দিকে রুখে এল। চেঁচিয়ে বলল, ‘কষিয়ে দে না আচ্ছা করে, মিশা!’

গেঙকাকে হটিয়ে দিয়ে মিশা বলল, ‘তুই সর্ গেঙকা। আমি একাই সামলাব। এই শেষবারের মতো বলছি— ফিরিয়ে দিবি কি না?’

পেছিয়ে গিয়ে বর্কা অন্যদিকে তাকাল। পাথরে টুং করে পয়সাটার আওয়াজ হল।

‘ওই নে! দম বুঝি আটকে আসছিল রে! কী ভাবিস নিজেকে? লোককে রক্ষা করে বেড়াচ্ছিস?’ মিশার দিকে কটমট্ করে চেয়ে বর্কা পাশে সরে গেল।

খেলাটা ভেস্তে গেল। দেয়ালের কাছে গরম অ্যাসফাল্টের ওপর ছেলেরা একটু রোদ্দুরে বসে থাকে।

কাছের গির্জেটায় ঘণ্টা বাজছে। ভোঁতা গাছগুলোর ডগায় যেন ঘণ্টার আওয়াজটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। গাছে গাছে টাঙানো দড়ির ওপর ধোয়া জামাকাপড়গুলো ফরফর করে উড়ছে আর এপাশে ওপাশে দোলার তালে কাঠের আঁকড়াগুলোও নড়ছে। পাঁচতলার একটা কামরার জানলার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে ফ্রেম ধরে একজন দুঃসাহসী মেয়ে জানলার কাঁচ পরিষ্কার করছে।

গাদা করে রাখা মরচে-ধরা রেডিয়েটরের ওপর বসে মিশা বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে বর্কার দিকে তাকাল। মতলবটা মাঠে মারা গেল, তাই না? অন্যের পয়সা পকেটে গোঁজার সুযোগ হল না বুঝি। ‘হাড়কিপ্‌টে’ নাম কি আর লোকে সাধে দিয়েছে। স্‌মলেন্‌স্কি বাজারে গেলেই দেখবে ও সিগারেট আর টফি বেচছে, আর টফিগুলোকে চক্‌চকে দেখাবার জন্য জিভ দিয়ে চেটে রাখছে। ওর বাপ ফিলিন গুদামঘরের ম্যানেজার—সেও সবসময় তালে থাকে কখন কিভাবে দু’পয়সা কামাবে।

এর মধ্যে বর্কা আবার ছেলেদের সঙ্গে ‘লাফানে ডাকাতদের’ গল্প জুড়ে দিয়েছে, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবখানা।

নাক সিঁটকে সিঁটকে বর্কা বলছে, ‘লাফানে ডাকাতরা চাদরে গা জড়িয়ে দাঁতে বাল্‌ব চেপে ধরে আর পায়ে বাঁধে স্প্রিং। রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সিধে পাঁচতলায় ওঠে। ডাকাতি করে প্রত্যেকের ঘরে। বাড়ির ওপর দিয়েও ডিঙিয়ে যেতে পারে। সামনে পাহারাওলা পড়লেই অমনি মারে লাফ আর পড়ে গিয়ে পাশের রাস্তায়।’

‘বল্‌ বল্‌, বলে যা!’ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাত নাড়ল মিশা, ‘তুই একটা আস্ত গুল্‌বাজ! হুঁঃ, লাফানে ডাকাত!’ বর্কাকে নকল করে উচ্চারণ করল কথাটা, ‘তার চেয়ে বরং মাটির তলার ঘর আর মরা মানুষ কী দেখেছিস সেখানে তাই বল্‌!’

বর্কা বলল, ‘শোন্‌ তা’লে। মাটির তলার কুঠরিতে সত্যি সত্যিই মড়া আছে। ওখানে এক সময় একটা কবরখানা ছিল কিনা। রাত হলেই ওরা হাউমাউ করে চেঁচায়, গোঙায়—ভয়ানক কাণ্ড!’

মিশা বলল, ‘তোর ওই কুঠরিঘরে কিস্‌সু নেই। ওসব বাজে কথা আর কাউকে শোনাগে যা। কবরখানা আর ভূত—যতোরাজ্যের রাবিশ্‌!’

বর্‌কা তবু হাল ছাড়ল না, 'কিন্তু কবর তো ওখানে ছিলই। আর সারা মস্কোর তলায় ওখান থেকে সুড়ঙ চলে গেছে। জার "ভয়ানক" ইভান বানিয়েছিলেন।'

সবাই হেসে উঠল।

মিশা বলল, ' "ভয়ানক" ইভান ছিলেন চারশো বছর আগে। আর আমাদের এ বাড়ি তো মাত্র দশ বছর হল তৈরি হয়েছে। মিথ্যে কথাটাও ভালো করে বলতে শিখিসনি।'

'আমায় মিথ্যেবাদী বলছিস?' বিদ্রূপ করে বর্‌কা বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে আয় তাহলে কুঠরিঘরে। মাটির নিচে সুড়ঙ আর মড়া দেখিয়ে দেব।'

গেঙকা বলল, 'যাসনে রে মিশা। তোকে ওখানে নিয়ে যাবে, তারপর একটা কিছু ফাঁদে ফেলে নাকাল করবে।'

বর্‌কার ওটা একটা প্রিয় কৌশল। প্রকাণ্ড বাড়িটার নিচের অন্ধকার কুঠরি-গুলোর অন্ধিসন্ধি যে কোনো ছেলের চেয়ে ওরই বেশি ভালো করে জানা। যখনই কেউ ওর সঙ্গে যায়, ও করে কি — যেতে যেতে হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে, চারদিক একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। আর বাদবাকিটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের কেরামতির ওপর ছেড়ে দেয়। ওর সঙ্গীটি তখন পথ হারাবেই নির্ঘাৎ। আর ওকে ডাকাডাকিও করতে থাকবে, কিন্তু বর্‌কা সাড়াই দেবে না। তারপর ওর শিকারটিকে অনেক কষ্ট দেবার পর, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে তাকে কুঠরি থেকে বের করে আনবে।

গেঙকারও সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে তাই বলতে থাকে, 'আমরা তো আর বুদ্ধু নই। তুই নিজেই যা না দেখি!'

নির্বিকার ভাব দেখিয়ে বর্‌কা তখন বলল, 'বেশ তো, অতই যদি ভয় তো না এলেই হয়।'

মিশা রেগে আগুন হয়ে বলল, 'কার কথা বলছিস?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বর্‌কা বলল, 'না, বিশেষ কারো কথা নয়। যারা কুঠরির নিচে যেতে ভয় পায় তাদের কথাই বলছি।'

মিশা উঠে দাঁড়াল, 'তা যদি হয় তো ... চল্!'

সামনের উঠোনটা পেরিয়ে দুটি ছেলে তলার কুঠরিতে ঢুকে চট্চটে আঠালো দেয়ালগুলো খুব সাবধানে ধরে ধরে নিচে নামতে লাগল। পথ দেখিয়ে চলল বর্কা। মাটিটা আল্গা। পায়ের নিচে টুংটাং করে উঠছে টিনের টুকরো আর ভাঙা কাঁচ।

মিশা জানে বর্কার মতলব ওকে বোকা বানানো। ঠিক হ্যায়, দেখা যাবে কার জিত হয় শেষ পর্যন্ত ...

গাঢ় অন্ধকারে ওরা এগিয়ে চলল। বেশ খানিকটা গিয়ে হঠাৎ বর্কা থম্কে দাঁড়াল।

মিশা ভাবল, 'এই শুরু হল তাহলে।' জিজ্ঞেস করল, 'কীরে তোর মড়াগুলো কি এখুনি দেখা দেবে?' গলার স্বরটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে ও।

কিন্তু একমাত্র জবাব এল অনেক দূরে অদৃশ্য একটা কোণ থেকে চাপা প্রতিধ্বনির আওয়াজ। মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

বর্কা জবাব দিল না, কিন্তু মিশার মনে হল ও যেন খুব কাছেই কোথাও রয়েছে। মনে মনে ঠিক করল আর ডাকবে না ওকে।

এইভাবে বেশ কয়েকমিনিট অস্বস্তির মধ্যে কাটল। দুটি ছেলেই মুখ বুজে রয়েছে। দু'জনেই ভাবছে আরেকজন আগে কথা বলুক। মিশা একবার আস্তে করে ঘুরে পিছু হটে, হাতড়ে হাতড়ে বাঁক খোঁজে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, ও জানে ও নিজেই রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে। তারপর একবার খুঁজে পেলে তখন দরজাটা দেবে বন্ধ করে, বর্কাকে বেশ করে আধঘণ্টা আটকে রাখবে এখানে। ওতেই শিক্ষা হবে ওর ...

আস্তে আস্তে এগোয় মিশা। নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনে পেছনে হাল্কা পায়ের আওয়াজ: বর্কা চুপিচুপি পেছু নিয়েছে। তার মানে ঘাবড়ে গেছে! একা পড়ে যাবার ইচ্ছে ওর আদপেই নেই!

মিশা চলতে থাকে। নিশ্চয় কোথাও কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে, কারণ রাস্তাটা চওড়া হবার বদলে ক্রমেই যেন সরু হয়ে আসছে। তবু ও এগোতেই থাকে। এ অন্ধকারে বর্কা দেখতে পাচ্ছে কেমন করে? যদি ওকে এখানে ফেলে বর্কা চলে যায়, আর ও পথ খুঁজে না পায়? ভাবতেই তো গা শিউরে ওঠে।

রাস্তাটা এমন সরু হয়ে গেছে যে দুপাশের দেয়ালে কাঁধ ঘেঁষে যায় মিশার। ও থামে। বর্কাকে ডাকবে নাকি? না, কিছুতেই না। হাতটা ওপরে তুলে ও মাথার ওপর অনুভব করে একটা ঠাণ্ডা লোহার পাইপ চলে গেছে। কোথায় যেন জলের কল্ কল্ শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ মাথার ওপর জোরে একটা ঘচ্ মচ্ শব্দ শুনতে পায় ও। মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। ও সামনে ঝুঁকে পড়ে। পায়ের নিচে মাটি নেই — সটান্ হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা গর্তের মধ্যে ...

প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পড়ে গিয়ে খুব বেশি চোট্ লাগেনি। তাছাড়া এখানে অন্ধকারটাও একটু যেন পাতলা। এবড়োখেবড়ো ধূসর দেয়ালগুলো আবছা দেখতে পাচ্ছে। ও যেখান থেকে পড়েছে তারই সঙ্গে সমকোণ করে একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে এসেছে ফুট দুয়েক নিচে। মিশা দাঁড়িয়ে আছে এই সরু রাস্তাটায়।

ওপরের রাস্তায় বর্কার কালো মূর্তি দেখা গেল, 'মি-শা-আ-আ! মিশা, তুই কোথায়?'

মিশা জবাব দিল না। বর্কাকেই তো প্রথম কথা বলতে হল! বেশ, এবার খুঁজুক তাহলে ওকে।

দেয়ালে গা ঠেকিয়ে চুপ করে থাকল মিশা।

'মিশা, এই মিশা, কোথায় তুই?' বর্কা বিড়বিড় করে বলল। খুব উদ্বিগ্ন হয়ে এই গলিটার দিকে গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। 'কী রে, জবাব দিচ্ছিস না যে? মিশা ...'

মিশা ঠাট্টা করে বলল, 'কোথায় তোর মাটির তলার সুড়ঙ? আর মড়াগুলো? দেখা না দেখি!'

বর্কা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'এই তো মাটির তলার সুড়ঙ। তবে তুই ভেতরে যাসনে। ওখানে কফিন আর মড়া রয়েছে।'

'তোর মড়ার আমি থোড়াই পরোয়া করি!' বলে মিশা এগিয়ে গেল সুড়ঙের ভেতরে। কিন্তু বর্কা ওর কাঁধ চেপে ধরল।

উদ্বেগে চাপা গলায় বলল, 'এই মিশা! কথা শোন্‌। চল্‌ ফিরে যাই, নয়তো খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে আমাদের।'

'কেন ভয় দেখাতে চেষ্টা করছিস?'

'এই দ্যাখ, যাসনে বলছি। লণ্ঠন না হলে যাবিই বা কী করে? কাল নিয়ে আসব একটা, তারপর ঢুকব।'

'ঠিক তো? তোকে তো আমি চিনি!'

'দিব্যি করে বলছি! যদি মিছে বলি তাহলে যেন আমার মরণ হয়! তুই ফিরে না এলে কিন্তু এই দ্যাখ্‌—আমি চললাম, আর ফিরব না। নিজে নিজে তুই কখ্‌খনো বেরুতে পারবি না।'

'ভারী বয়ে গেল!' তাচ্ছিল্য করে বলল বটে মিশা, তবে বর্কার পেছু পেছু পথ হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়েও এল তলকুঠরির বাইরে।

দরজার মুখে চন্‌চনে রোদে ওদের চোখ ঝলসে গেল।

'তাহলে কাল সকালে আসছিস তো?' মিশা বলল।

বর্কা জবাব দিল, 'বেশ। সেই কথাই থাকল।'

১৯

ধেড়ে শুরা

আঙিনায় এসে হাজির হল শুরা অগুরেয়েভ। ওদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ঢ্যাঙা, তাই বন্ধুরা ওকে 'ধেড়ে' শুরা বলে ডাকে। ওদের ধারণায় শুরা একজন বিরাট অভিনেতা। এক নম্বর ব্লকের নিচের তলায় যে ক্লাবটার সদর আস্তানা সেই ক্লাবের সৌখীন নাট্যচক্রের সদস্য ও। ও বাড়ি কমিটির যে সব লোকেরা ক্লাব

চালাতেন তাঁরা কোনো ছেলে ছোকরাকে ঢুকতে দিতেন না। ধেড়ে শুরাই শুধু ব্যতিক্রম, তাই নিয়ে ওর দেমাকও খুব।

মিশা ওকে ডাকল, 'এই যে, আমাদের লম্বাঠেঙো দাদু!'

শুরা চোখ পাকিয়ে তাকাল ওর দিকে।

'কী ছেলেমানুষি যে করিস, সত্যি! ভেবেছিলাম এ্যাদ্দিনে বুঝি চ্যাংড়ামোগুলো ছেড়েছিস।'

গেঙ্কা বলল, 'আরে মোলো যা! ওটা আবার শিখলি কোথা? ক্লাবে?'

'সে নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।' শুরা অর্থপূর্ণভাবে একটু থেমে আবার বলল, 'বড়োদের ছাড়া আর কাউকে ক্লাবে ঢুকতে দেয় না সে তো জানিসই তোরা।'

মিশা বলল, 'আর হাসাসনি! তুই এক মাইল লম্বা হয়ে গেছিস কিনা তাই তোকে ঢুকতে দিয়েছে।'

শুরা মাতব্বরের মতো জবাব দিল, 'আমি হলাম সেরা এ্যাক্টরদের ভেতর একজন। তোদের হিংসে হয় সেই কথা বল্।'

স্লাভা বলল, 'আমাদের ঢুকতে দেয় না তার কারণ আমরা নিজেদের সংঘ গড়তে পারিনি। কিন্তু শুনেছি ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়াতে একটা কিশোর কমিউনিস্ট সংঘ আছে, তাদের নিজেদের ক্লাবও আছে।'

শুরা সবজান্তার মতো সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথাই। তবে ওদের কী একটা আলাদা নাম আছে। ভুলে গিয়েছি। কিন্তু ও তো হল একেবারে বাচ্চাদের জন্য। বড়োরা ঢোকে কমসমোলে।'

ও যে নিয়মিত কারখানার কমসমোল সংঘের সভায় যায় আর ওখানে যোগ দিতেও চায় তা ওর কথার ফাঁকে বেরিয়ে আসে।

ভেবেচিন্তে মিশা বলল, 'খুব মজার তো! ছোটরা আবার নিজেদের সংঘও বানিয়েছে।'

গেঙ্কা বলল, 'ওরা বোধহয় বয়স্কাউট, বুঝলি রে স্লাভা। তুই হয়তো কোথাও গুলিয়ে ফেলেছিস।'

'না, ঠিকই বলেছি। স্কাউটরা তো নীল টাই বাঁধে, আর এরা বাঁধে লাল টাই।'

মিশা বলল, 'লাল? যদি লাল টাই হয় তাহলে ওরা সোভিয়েত শাসনের পক্ষে নিশ্চয়। তা ছাড়া ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়াতে বয়স্কাউট আসবে কোত্থেকে। মজুর পাড়া ওটা।'

শুরাও তাল দিল ওর সঙ্গে, 'হ্যাঁ, ওরা সোভিয়েত শাসনের পক্ষে।'

'ওদের নিজেদের ক্লাব?'

'নিশ্চয়।' মনে একটু খট্‌কা নিয়ে শুরা ফের বলল, 'প্রত্যেকের সদস্য কার্ড আছে।'

'খুব মজার তো!..' টেনে টেনে এবার বলল মিশা, 'এসব ব্যাপার তো আমি একেবারে শুনিইনি মোটে? কী করে জানলি রে স্লাভা?'

'গানের ইস্কুলের এক ছোকরা আমায় বলেছে।'

'পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করে নিলি না কেন? ওদের নাম, ঠিকানা, কারা যোগ দিতে পারে...'

'যোগ দিতে?' শুরা হাসল, 'যোগ দেওয়া কি অতই সোজা ভেবেছিস? তোকে নেয় কেমন সেটা দেখার ইচ্ছে রইল!'

'কেন নেবে না?'

'অতো সোজা নয় ব্যাপারটা!' মহা বোদ্ধার মতো মাথাটা দুলিয়ে শুরা বলল, 'আগে নিজের যোগ্যতা দেখাতে হবে।'

'যোগ্যতা দেখাতে হবে মানে, কী বলছিস?'

'হ্যাঁ... এই, মানে... মোটামুটিভাবে,' একটা অপ্রতিভ ভঙ্গী করে শুরা বলল, 'যেমন ধর্‌ এই অন্য ছেলেদের মতো ক্লাবের কিছু দরকারী কাজ আর কমসমোলের সভায় যাওয়া...'

মিশা ফোঁড়ন দিল, 'ব্যস্‌ ব্যস্‌, থাম্‌। অতো দেমাক দেখাবার কী আছে! খুব তো হ্যান্‌ করতা ত্যান্‌ করতা, তুই নিজে কতোটা কাজের কাজ করতে পারিস শুনি?'

'কী বলতে চাস?'

'বলছি তো। কমসমোলে যোগ দেবার তো খুব ইচ্ছে তোর? বেশ। কমসমোলের ছেলেরা লড়াইয়ে গিয়েছিল। এখন ওরা কলে কারখানায় কাজ করছে। আর তুই কী করছিস? স্টেজের পেছনে আরো হাজারটা চুনোপুঁটির ভেতর বসে আছিস। এবার বল্ দেখি, তোর স্টেজ ম্যানেজার হবার ইচ্ছে আছে?'

'আমি কেমন করে স্টেজ ম্যানেজার হব? আমাদের স্টেজ ম্যানেজার তো কমরেড মিতিয়া সাখারভ।'

'উনি তো বড়োদের নাট্যচক্রের স্টেজ ম্যানেজার, কিন্তু আমরা ছোটদের জন্য একটা চক্র খুলব। তাহলে আমাদের সবাইকেই ওরা ক্লাবে ঢুকতে দেবে। আমরা নাটকের শো দেব, শো থেকে টাকা তুলে ভোল্গার দুর্ভিক্ষ এলাকায় পাঠাব। আমরা যে কী ধরনের ছেলে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।'

স্লাভা বলল, 'ঠিক কথা। একটা সঙ্গীতচক্রও করতে পারি। তাছাড়া গানের দল। আঁকিয়ের দল।'

শুরা কিন্তু তবু মাথা নেড়ে সন্দেহ জানাল, 'ওরা তোদের নেবে না।' কিন্তু ছেলেরা বুঝতে পারে যে স্টেজ ম্যানেজার হবার ওর ষোলো আনা ইচ্ছা।

মিশার জেদ চেপে গেল, 'নিশ্চয় নেবে। চল না গিয়ে কমরেড মিতিয়া সাখারভের সঙ্গে দেখা করি, সব কথা খুলে বলি তাঁকে। উনি কেন ঠেকাতে যাবেন?'

'লাথি মেরে তোদের ভাগিয়ে দেবে!' আবর্জনার টিনের ভেতর খালি শিশি-বোতল খুঁজতে খুঁজতে চেঁচিয়ে উঠল বর্কা।

গেঙ্কা ঘুষি দেখিয়ে বলল, 'তুই খবরদার নাক গলাবি না! যা গিয়ে টফি বেচ্ গে যা!'

শুরা কী ভাবতে ভাবতে বলল, 'হুঁ, মন্দ নয় বুদ্ধিটা। কিন্তু আমার এলেম হচ্ছে অভিনয়ে। স্টেজ ম্যানেজারিতে নয়।'

মিশা বলল, 'খুব ভালো কথা ! যদি অভিনেতাই হোস তো স্টেজ ম্যানেজারের পার্টটাই করিস না কেন! এখন আর ভেবে সময় নষ্ট করিস না।'

শুরা অবশেষে রাজি হল, 'বেশ, তাই হোক। তবে প্রতিজ্ঞা কর্ সব ব্যাপারে আমার কথা মেনে চলবি তোরা। আর্টের ব্যাপারে শৃংখলাটাই হল সবচেয়ে বড়ো কথা। গেঙ্কা, তুই ভাঁড়টাঁড়গুলোর পার্ট করবি, স্লাভা নায়ক হতে পারবে, আর হ্যাঁ, বাজনাটাও দেখবে। আমার মতে মিশাকেই ম্যানেজার করা উচিত।' অন্য ছেলেদের দিকে সগর্বে তাকাল শুরা, 'আর সব পার্ট পরীক্ষা করে করে বেছে দেব'খন।'

২০

ক্লাব

একটা হল্ আর স্টেজ নিয়ে ক্লাব ঘরটা। যখন অভিনয় বা বাসিন্দাদের সভা-সমিতি থাকে না তখন এক পাশে দু'চারটে বেঞ্চি টেনে নিয়ে ক্লাবের কাজকর্ম চলে।

বাড়ির গিন্নী আর পরিচারিকারা বুনিয়াদী শিক্ষার ক্লাস করে। নাট্যচক্র তালিম দেয় স্টেজে। হলের মাঝখানে বিলিয়ার্ড-ভক্তরা বিলিয়ার্ড খেলে। যখনই অর্কেস্ট্রার রেওয়াজ চলে, বিলিয়ার্ডওয়ালারা ওদের ডাণ্ডাগুলো দিয়ে ছোঁয় বাজনদারদের। এই সব কর্মতৎপরতার প্রধান পরিচালক হল ক্লাবের ম্যানেজার কমরেড মিতিয়া সাখারভ। সে আবার স্টেজ ম্যানেজারও। অল্প বয়স। লম্বা, টিকলো নাক। কণ্ঠার উঁচু হাড়টা এমন চোখা হয়ে বেরিয়ে আছে যে মনে হয় ওর গলার মধ্যেই কোন সময় কেটে বসে যাবে। মুখের ভাবটা সদাব্যস্ত। সাধারণত একটা লম্বা মখমলের কোট গায়ে দেয়, সেটা এত পুরনো যে তার রঙই বাদামি হয়ে গেছে। গলায় একটা চক্‌চকে কালো 'বো' বাঁধে আর সরু পাৎলুন পরে।

মিতিয়ার মাথায় লম্বা লম্বা সোজা চুল, রঙটা যে কী তা বলা দুষ্কর। আর সবসময়ই কেবল হাতের তেলো দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরায়।

ছেলেরা ক্লাবঘরে ঢুকতেই মিশাকে সামনে ঠেলে দিল শুরা।

'তুই কথা বল্! তুই তো ম্যানেজার।' বলে সে একপাশে এমনভাবে সরে দাঁড়াল যেন এসবের ও কিছুই জানে না। যেন ওর চোখে এগুলো নেহাৎই ছেলেমানুষি ব্যাপার।

মিশার কথা শুনে মিতিয়া সাখারভ বলল, 'হুম্ ... হুম্ ... এখন আমার কথা হল আমি তো আর থিয়েটারের ইস্কুল চালাচ্ছি না? এটা হল গিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। হুম্ ... সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তাও আবার বাড়ি কমিটির কড়া নিয়ম-কানুনের মধ্যে ...' স্টেজের দিকে হেঁটে চলে গেল সে। একটু বাদেই ওর করুণ কান্নাভরা গলার স্বর শোনা গেল, কাকে যেন সাধাসাধি করছে, 'কমরেড পারাশিনা, আপনি আপনার পার্টটা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন দয়া করে — যার ভূমিকায় নেমেছেন, নিজেকে ঠিক তারই মতো মনে করুন ...'

বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে মিশা বলল, 'হল না। স্রেফ ভাগিয়ে দিলেন। উনি তো থিয়েটারের ইস্কুল চালাচ্ছেন না। চালাচ্ছেন একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বাড়ি কমিটির কড়া নিয়ম-কানুনের মধ্যে!'

শুরা বলল, 'এই দ্যাখ্, দেখলি তো। আমি আগেই জানতাম।'

মিশা চটে গেল, 'নে নে, তুই আছিস তোর ওই চিরকালের গৎ নিয়ে— "আমি আগেই জানতাম"!'

ছেলেরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল। বিলিয়ার্ড টেবিলে বলগুলোর ফাঁপা আওয়াজ উঠছে ফট্‌ফট্ করে। মোজার্টের 'তুর্কী অভিযান' বাজছে অর্কেস্ট্রায়। দেয়ালের ওপর একটা পোস্টারে একটা রোগা বুড়ো লোকের ছবি, হাড্ডিসার হাতখানা বাড়িয়ে রয়েছে: 'ভোল্‌গা পারের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্য করো!' বুড়োর চোখদুটো যেন ঠিকরে পড়ছে। যেদিক থেকেই পোস্টারটার দিকে তাকাও মনে হবে যেন চোখদুটো তোমাকেই অনুসরণ করছে।

মিশা বলল, 'আরেকটা উপায় আছে।'

'কী উপায়?'

'গিয়ে কমরেড জুর্‌বিনের সঙ্গে দেখা করা।'

হতাশার ভঙ্গি করে শুরা বলল, 'বেআক্কেলে কথা! উনি হলেন শহর-পরিষদের সদস্য। আমাদের চক্র নিয়ে উনি কোন্ দুঃখে মাথা ঘামাতে যাবেন? আমি যাচ্ছি না বাবা ... শেষে ওই "ডাইনীটা"র সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে।'

মিশা বলল, 'বেশ, তাহলে আমি যাব। ক্লাব তো আর মিতিয়া সাখারভের সম্পত্তি নয়... আয় রে গেঙ্কা!'

চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওরা চারতলায় উঠল — সেখানে জুর্‌বিন থাকেন। মিশা ঘণ্টা বাজাল। গেঙ্কাটা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল গুটিশুটি মেরে। যেই ওদের কানে এল দরজার ওধারে পায়ের আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে গেঙ্কা ভোঁ করে নিচে নেমে এল এক লাফে তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে। জুরবিনের এক প্রতিবেশী দরজা খুলেছে, ঢ্যাঙা রোগা টিঙটিঙে তিরিক্ষি চেহারার এক মেয়েমানুষ। লম্বা দাঁতগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ছেলেরা তাকে 'ডাইনী' বলে রগচটা মেজাজের জন্য।

সে বলল, 'কী চাই?'

'কমরেড জুর্‌বিনের সঙ্গে দেখা করব।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'তোমার আবার কিসের দরকার! এখানে যে বড়ো ঘোরাঘুরি করছ ...' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলেই মিশার প্রায় নাকের ওপর দরজাটা দড়াম করে ভেজিয়ে দিল।

'ডাইনী!' চেঁচিয়ে উঠে মিশা ছুট লাগাল নিচে।

নিচের তলায় প্রায় এসে গেছে এমন সময় হঠাৎ কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। চেয়ে দেখে কমরেড জুর্‌বিন দাঁড়িয়ে।

জ়ুর্‌বিন কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ কী? অমন দস্যিপনা কিসের?’

মিশা মাথা নোয়াল।

জ়ুর্‌বিন বললেন, ‘কীরে? কালা নাকি তুই?’

‘ন্‌-না।’

‘তাহলে জবাব দিচ্ছিস না যে? আর কখনো অমন করিসনি।’ বলে আস্তে আস্তে ভারি পা ফেলে ওপরে উঠতে লাগলেন।

মিশা বিষণ্ণ মনে হেঁটে চলল। সব ব্যাপারটাই এমন ভেস্তে গেল! ওপর থেকে জ়ুর্‌বিনের ভারি পায়ের আওয়াজ এল কানে, দরজার কুলুপে চাবি দিয়ে দরজা খোলা হল। মিশা থেমে পড়ল। তারপরেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ওপরে উঠল, ‘কমরেড জ়ুর্‌বিন, এক মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?’

খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জ়ুর্‌বিন প্রশ্নভরা চোখে মিশার দিকে তাকালেন।

‘কী ব্যাপার?’

মিশা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘কমরেড জ়ুর্‌বিন, আমরা একটা নাট্যচক্র খুলতে চাই।’ দম নিয়ে আবার বলল, ‘আমরা খুলতে চাই, কিন্তু কমরেড মিতিয়া সাহায্য দেবেন না।’

‘“আমরা”টা কে?’

‘আমরা সব্‌বাই। আঙিনার সব ছেলেপিলেরা।’

জ়ুর্‌বিনের কঠিন দৃষ্টিটা এবার নরম হয়ে এল। গোঁপের ডগায় একটা মুচ্‌কি হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে মিশার নীল চোখ, জটপাকানো কালো চুল আর আঁচড় লাগা কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকলেন। মিশা জানতে পারল না বুকে সামরিক ‘লাল পতাকার’ অর্ডার ঝোলানো এই মাঝবয়েসী শক্তসমর্থ ভদ্রলোকটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন, কী ভাবছেন উনি।

অবশেষে জুর্‌বিন বললেন, ‘আচ্ছা, ভেতরে আয়, আলাপ করি।’ বলেই কামরার মধ্যে ঢুকলেন।

পেছন পেছন ঢুকল মিশা। জুর্‌বিনের ‘ডাইনী’ পড়শীটি চোখ পাকিয়ে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু কিছু বলল না।

২১

বাজিকর

আধঘণ্টা বাদে জুর্‌বিনের ফ্ল্যাট থেকে বেরোল মিশা। আঙিনায় ওর বন্ধুদের কাছে গেল। মস্তো ভিড় জমে গেছে সেখানে—একদল বাজিকরের খেলা দেখছে লোকে। মিশা ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। আঁটসাঁট নীল পোশাক পরেছে ওরা আর কোমরে বেঁধেছে লাল উড়ুনি। একটা গালিচা বিছিয়ে তার ওপর খেলা দেখাচ্ছে। গোঁপদাড়ি কামানো আরেকজন লোক ওদের ‘সাবাশ্‌! সাবাশ!’ বলে চেঁচাল।

এমন অদ্ভুত সব জিনিস দেখাচ্ছে ওরা যে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। বিশেষ করে ওই ছিপছিপে পাতলা মেয়েটা। বাঁকা বাঁকা চোখের পাতার নিচে নীল নীল চোখদুটো। চমৎকার ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে নমস্কার করেই আবার দীঘল শণরঙা চুলগুলো যেমন তেমন করে পেছনে ঠেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে ডিগবাজি খাচ্ছে, মুখের হাসিটাকে যেন তাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকবারই।

কাছেই একজোড়া সাইকেলের চাকার ওপর একটা গাড়ি। একটা ছোট গাধা বাঁধা আছে গাড়িটার সঙ্গে। গাড়ির ওপর দুটো পাতলা কাঠের তক্তা কোণা মিলিয়ে খাড়া করে রাখা। বড়ো বড়ো হরফে তাতে লেখা:

বুশ্ ভ্রাতা ও ভগিনী!

বাজিকরের খেলা!

বুশ্ ভ্রাতা ও ভগিনী!

নেহাৎই শান্তশিষ্ট গাধাটা। শুধু বড়ো বড়ো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকজন দেখছে আর অদ্ভুতভাবে লম্বা কানদুটো নাড়ছে।

খেলা শেষ হতে গোঁপদাড়ি কামানো লোকটা ঘোষণা করল যে আসলে ওরা ভিখিরি নয়, খেলোয়াড়। 'অবস্থার গতিকে' বাড়ি বাড়ি খেলা দেখিয়ে বেড়াতে

হচ্ছে ওদের। এবার 'মান্যবর দর্শকবৃন্দ' যদি যথাসাধ্য কিছু সাহায্য করেন তাহলেই ওদের খেলার তারিফ জানানো হবে।

অ্যালুমিনিয়মের পিরিচ হাতে ছেলেটা আর মেয়েটা এগিয়ে গেল দর্শকদের কাছে। যারা জানলা দিয়ে খেলা দেখছিল তার কাগজে জড়িয়ে পয়সা ফেলে দিল। বাচ্চাকাচ্চারা সেই পয়সা তুলে দিল খেলোয়াড়দের হাতে। মিশাও পয়সা জড়ানো একটুকরো কাগজ তুলে নিয়ে মেয়েটা কখন আসবে সেই অপেক্ষায় রইল।

শেষমেষ মেয়েটা এসে দাঁড়াল ওর সামনে। মেয়েটার বড়ো নীল চোখের হাসি ওকে এমন বিব্রত করল যে ওর আর যেন নড়ার ক্ষমতা রইল না।

মেয়েটা ওর বুকে আস্তে পিরিচের ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী গো?'

সঙ্গে সঙ্গে মিশার সম্বিত ফিরে এল। পিরিচের মধ্যে কাগজটা ফেলে দিল ও। মেয়েটা সরে গেল, তারপর পেছন ফিরে মিশার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। তারপর যখন ভিড়ের মধ্যে বাজিকর খেলোয়াড়রা আঙিনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন মেয়েটা ফের একবার ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

পিঠের ওপর একটা চাপড় পড়তেই মিশা ঘুরে দাঁড়াল। কাছেই রয়েছে শুরা, গেঙ্কা আর স্লাভা।

শুরা জিজ্ঞেস করল, 'জুর্বিন কী বললেন?'

'এই যে, পড়্!' মিশা হাতের মুঠো থেকে একটুকরো কাগজ বের করে খুলল।

এ কী? বাঁকা লাইন আর তেলের দাগওয়ালা দলাপাকানো কাগজটার মধ্যে একটা দশ-কোপেক পয়সা যে! আরে, তাহলে ভুলে জুর্বিনের চিঠিটাই ও মেয়েটাকে দিয়ে ফেলেছে!

ঠাট্টা করে শুরা টেনে টেনে বলল, 'সবশুদ্ধ দশ কোপেক দিয়েছেন তাহলে উনি!'

ফটকের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে গেল মিশা পাশের বাড়ির আঙিনায়।

খেলোয়াড়রা প্রায় খেলা শেষ করে এনেছে ততোক্ষণে। মেয়েটা যখন পিরিচ নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে মিশা কাছে গিয়ে ওর পিরিচে সেই দশ-কোপেক পয়সা রাখল। হতভম্বের মতো বিড়বিড়িয়ে বলল:

'শোনো। ভুলে আমি অন্য একটা কাগজ দিয়ে ফেলেছি। আমাকে সেটা ফিরিয়ে দাও। দারুণ জরুরি চিঠি।'

জবাবে মেয়েটা মহাফুর্তিতে হি হি করে হেসে উঠল।

'কী চিঠি? মজার ছেলে তুমি যাহোক... কপালে অমন কাটা দাগ কেন তোমার?'

মিশা শুকনো গলায় জবাব দিল, 'ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ও শ্বেতরক্ষীদের কাজ। আমার চিঠিটা ফিরিয়ে দাও তো।'

'তুমি বুঝি খুব লড়াই করতে ভালোবাসো?' শাসন করার ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে বলল মেয়েটা, 'যেসব ছেলেরা লড়াই করে তাদের আমার ভালো লাগে না।'

'আমি থোড়াই কেয়ার করি।' গম্ভীর হয়ে মিশা বলল, 'আমার চিঠিটা ফেরত দাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা, 'সত্যিই খুব মজার লোক তো তুমি! তোমার চিঠি আমি দেখিইনি একদম। হয়তো বুশের কাছে আছে ... দাঁড়াও এক মিনিট।'

ঘোরা শেষ করে মেয়েটা চাঁদার পয়সা তুলে দিলে লোকটার হাতে আর কী যেন বলল তাকে। বিরক্তভাবে লোকটা ওকে সরিয়ে দিল একপাশে। কিন্তু তবু মেয়েটা নাছোড়বান্দা, ছোট সাটিনের জুতো পরা পাটাও একবার মাটিতে ঠুকল। একটা ক্যানভাসের থলি হাতড়াতে হাতড়াতে লোকটা ভুরু কুঁচকে ব্যাড়র-ব্যাড়র করে বকতে লাগল। তারপর অবশেষে জুর্বিনের দেওয়া সেই ভাঁজ করা কাগজটা টেনে বের করল ভেতর থেকে। চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়েই মিশা ছুটল ওদের নিজেদের বাড়ির আঙিনায়। পেছন থেকে ওকে দেখতে লাগল মেয়েটা, আর হাসতে লাগল। মিশার মনে হল যেন গাধাটাও ওকে দেখে মাথা নেড়ে নেড়ে লম্বা লম্বা হলদে দাঁত বার করে হাসছে।

২২

'আর্ট' সিনেমা

মাথা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ওরা জুরবিনের পেন্সিলে লেখা চিঠিখানা পড়ল।

'কমরেড সাখারভ,

'ছেলেরা যে উদ্যম দেখিয়েছে তাতে তাদের সহায়তা করা দরকার। ছেলেপিলেদের ভেতর কাজ চালানো খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বিশেষ করে ক্লাবের ব্যাপারে। আমাদের বাড়ির ছেলেপিলেদের একটা নাট্যচক্র গড়ে তোলার কাজে আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন — এর যেন অন্যথা না হয় দেখবেন।

জুরবিন।'

শুরা বলল, 'ব্যস্, তাহলে তো সবই ঠিক হয়ে গেল। আমি আগেই জানতাম জুরবিন সাহায্য করবেন। কাল আমরা একটা উদ্বোধনীসভা করব। আজকের মতো তাহলে বিদায়!' ছেলেদের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল সে, 'আমার এখন তাড়া আছে। একটা জরুরি সভায় হাজির থাকতে হবে।'

শুরা চলে যাবার পর গেঙ্কা বলল, 'কী জাঁক দেখাচ্ছে! যেন ওর মুখ চেয়েই তারা বসে আছে জরুরি সভায়, কখন ইনি যাবেন। একদিন আচ্ছামতো ধোলাই দিলে সব বড়াই বেরিয়ে যাবে!'

'আর্ট' সিনেমাহলের পাথরের সিঁড়ির ওপর বসেছিল মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা। সন্ধ্যার ধূসর কুয়াশায় সবই ডুবে গেছে, শুধু আঙিনার মাঝখানটায় কালো হয়ে ফুটে আছে ফায়ার-ট্যাঙ্কের লোহার ছাদটা। কোথায় যেন একটা গিটারের তারে ঝঙ্কার উঠেছে। মেয়েদের খুশিভরা গলার হাসি। সন্ধ্যার আওয়াজগুলো তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো আরবাত স্ট্রীটকে চঞ্চল করে তুলেছে।

গেঙ্কা বলল, 'জানিস ভাই, আমরা কিন্তু বিনিপয়সায় সিনেমা দেখতে পারি।'

মিশা জবাব দিল, 'জানি। কিন্তু তার জন্য সারাদিন ঘাড়ে করে পোস্টার বয়ে গিয়ে বেড়াতে হবে। মজা মন্দ নয়, সত্যি!'

গেঙ্কা চুমকুড়ি কাটল, 'ইস্, আমাদের যদি সেই বাজিকরগুলোর মতো একখানা গাড়ি থাকত। ওতেই পোস্টার নিতে পারতাম। বেশ চমৎকার হত!'

মিশা ফোঁড়ন কাটল, 'ঠিক ঠিক। আর তোকে আমরা গাড়িটার গাধা বানাতাম।'

গম্ভীর গলায় স্লাভা বলে উঠল, 'তা হবে না। লাল-চুলো আবার গাধা হয় নাকি?'

গেঙ্কা বলল, 'বেশ, হাসছিস তোরা হাস্। কিন্তু বর্কা দেখবি কাজটা পাবে, সিনেমার পাশও পেয়ে যাবে।'

মিশা বলল, 'ও দরখাস্ত করবে না। ও এখন ডাকটিকিটের ফাটকাবাজি নিয়ে ব্যস্ত। ওগুলো ও কোথা থেকে জোগাড় করে কে জানে!'

গেঙ্কা বলল, 'আমি জানি। অস্তোজেন্কায় একজন পুরনো ডাকটিকিটওয়ালা আছে, তার কাছ থেকে।'

মিশা অবাক হয়ে গেল, 'সত্যি? কতোবার তো সেখানে গিয়েছি, দেখিনি তো ওকে?'

'তুই ওর দেখা পাবি কি করে। ও তো খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকে।'

মিশা অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি? তার মানে ডাকটিকিটগুলো চুরি করে বলছিস? জলের দরে বেচে কিন্তু জানিস।'

'তা তো জানি না।' গেঙ্কা টেনে টেনে বলল, 'শুধু জানি ও সেখানে যায়, এইটুকু। আমি নিজের চোখে দেখেছি ...'

'যাক্, বাদ দে ওর কথা,' মিশা বলল, 'এখন শোন্! জুরবিন আমায় কী বললেন জানিস?'

'কেমন করে জানব? বললি না তো একবারও।' স্লাভা ঘাড় বেঁকিয়ে বলল।

'শোন্ তাহলে। ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ার সেই ছেলেগুলোর কথা উনি বললেন। ওদের নাম হয়েছে "ইয়ং পাইওনিয়র"। ওই বলেই ওদের ডাকা হয়।'

'কী করে ওরা?' গেঙ্কা প্রশ্ন করল।

'তাও বলে দিতে হবে? ওটা হল ছোটদের কমিউনিস্ট সংগঠন। বুঝলি তো — কমিউ-নিস্ট। তার মানে হল, ওরাও কমিউনিস্ট ... তবে ... ছোট, এই আর কি। তবে ছোট হলে কী হয়!..'

একটু থেমে মিশা ফের বলল:

'জুর্‌বিন বললেন চক্র নিয়ে লেগে পড়ো, ক্লাবে যাও, দেখতে না দেখতে তোমরা ইয়ং পাইওনিয়র হয়ে যাবে।'

'বললেন উনি?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি।'

স্লাভা জিজ্ঞেস করল, 'এ সংগঠনটা কোথায় আছে কিছু বললেন কি?'

'ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ার ছাপাখানায়। দেখলি তো, সব আমার কাজ। তোর মতো নয়।'

মিশার মন্তব্যটাকে কোনো আমলই না দিয়ে স্লাভা বলল, 'ওখানে গিয়ে একবার দেখে এলে মন্দ হয় না!'

মিশা রাজি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সেটা ভালো বুদ্ধি। তবে ছাপাখানার ঠিকানা আনতে হবে।'

ছেলেরা সবাই চুপ করে গেল। হাওয়া চলবার জন্য খুলে রাখা সিনেমার দরজার ভেতর দিয়ে ওরা দেখতে পেল দর্শকদের কালো মাথার সারি আর তাদের মাথার ওপর দিয়ে উজ্জ্বল একটা রশ্মি গিয়ে পর্দায় পড়েছে।

সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন স্লাভার মা আল্লা সের্গেয়েভনা। ভদ্রমহিলা দেখতে সুশ্রী, পোশাক-আশাকও সুন্দর। মাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল স্লাভা।

হাতের কালো দস্তানাজোড়া টানতে টানতে উনি বললেন, 'স্লাভা, এখনো বাড়ি যাসনি যে!'

'এখ্‌খুনি যাচ্ছি মা।'

'বেশিক্ষণ বাইরে থাকিসনে কিন্তু। দাশা তোর খাবার দিয়ে দেবে। তারপর ঘুমোতে যাবে।'

পেছনে একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে রেখে উনি চলে গেলেন।

স্লাভা বললে, 'মা তো কনসার্টে যোগ দিতে গেল। কী জানিস? চল্ এবার আমরা সিনেমায় যাই — "খুদে লাল শয়তান"এর দ্বিতীয় খণ্ডটা দেখাচ্ছে।'

'পয়সা কোথায়?'

স্লাভা উশখুশ করে।

'মা আমায় দুটো রুব্‌ল্ দিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল টাকাটা দিয়ে স্বরলিপির বই কিনব ...'

লাফিয়ে উঠে গেঙ্কা বলল, 'আগে সেকথা বলিসনি কেন? আয়, আয়। আজ আর স্বরলিপি পাচ্ছিস না। সব দোকান এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।'

স্লাভা পালটা বলল, 'কিন্তু কাল তো কিনতে পারতাম।'

'কাল? কালের কথা কাল। তা ছাড়া, কোনো জিনিস কাল করব বলে ফেলে রাখা উচিত নয় কখনো। আজ যদি সিনেমার যাবার সুযোগ থাকে তো আজই যাওয়া উচিত।'

টিকিট কেটে ছেলেরা ঢুকে পড়ল।

দরজা থেকে সরু রাস্তা ধরে ওরা ছোট একটা কামরায় ঢুকল। দেয়ালে নামকরা চিত্রতারকাদের ছবির পাশাপাশি ঝুলছে পুরনো প্লাকার্ড আর হলদে-হয়ে-যাওয়া পোস্টার। একটা পোস্টারে ঘোড়সওয়ারের টুপি-পরা লাল ফৌজের একজন সৈনিক হাতে রাইফেল নিয়ে তাকিয়ে আছে। নিচে লেখা রয়েছে: 'আমরা স্বেচ্ছাসেবক হয়েছি। আপনারাও হবেন তো?'

আরেকটা পোস্টার টাঙানো আছে মেঠাই আর বাসি কেক সাজানো খাবারের জায়গার পেছনের দেয়ালে। তাতে লেখা: 'কিশোর অপরাধ দূরীকরণার্থে সহায়তা করুন।'

জগাখিচুড়ি ভিড়। ফৌজ থেকে ছাড়া পাওয়া টুপি আর ফৌজী ওয়ারকোট পরা সৈনিকরা, মাথায় উড়ুনি আঁটা কারখানার মেয়ে-মজুর, রুশী কামিজ, কোর্তা, আর উঁচু বুটে-গোঁজা পাৎলুন পরা জোয়ান ছেলেরা।

ঘণ্টা বাজল। ভালো আসনগুলো দখল করার জন্য হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল দর্শকরা। আলো নিবতেই শুরু হল কট্‌কট্‌ করে মেশিনের বাজখাঁই আওয়াজ, ভাঙা পিয়ানোর একঘেয়ে সুর আসছে কানে। সরু সরু বেঞ্চের ওপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে দর্শকরা, ফিস্‌ফিস্‌ করছে আর সূর্যমুখীর বিচি চিবুচ্ছে।

ছবি শেষ হতে ছেলেরা আবার এসে রাস্তায় উঠল। কিন্তু ওদের মন তখনো পড়ে আছে সিনেমার সেই 'খুদে লাল শয়তান' আর তাদের তাক-লাগানো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে। ছবিতে কমসমোল সদস্যদের দেখানো হয়েছে — ওদের সম্পর্কে ছেলেদের শ্রদ্ধার আর অন্ত নেই। মিশা ভাবে, 'ইস্‌ রেভস্কে যখন ছিলাম তখন এত ছোট ছিলাম যে কী বলব!' এখন ও জানে নিকিৎস্কিকে কীভাবে জব্দ করতে হয়।

ছুটির প্রথম দিনটা এইভাবেই কাটে, এবার ঘরে ফেরার সময় হল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। 'আর্ট' সিনেমার দরজার বাতিগুলোই শুধু রাস্তার ওপর যা বড়ো একটা আলোর ছোপ ফেলেছে। বিজ্ঞাপনের বোর্ডে তারের জালের আড়ালে ফটোগুলো আবছা দেখা যায়। দরজার গায়ে ফরফর করছে পোস্টারের ছেঁড়া কানিগুলো।

২৩

নাট্যচক্র

পরদিন সকালে মিশা আঙিনায় গিয়ে দেখল দরোয়ান ভাসিলি খুড়ো খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে। হাতে একটা হাতুড়ি আর পেরেক।

মিশা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দেখল তলাকুঠরির দিকের সেই প্রবেশপথটা মোটা মোটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মিশা ভাবল, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার!'

ভাসিলি খুড়ো মোটা একটা ক্যানভাসের হোস্‌পাইপ দিয়ে যেখানটায় আঙিনা ধুচ্ছিল সেখানে হাজির হল মিশা।

বলল, 'ভাসিলি খুড়ো, দাও না, আমিও তোমার সঙ্গে হাত লাগাই!'

'ভাগ্‌ এখান থেকে!' দরোয়ানের মেজাজ নিশ্চয় খচে আছে। 'এ কাজে আগু বাড়িয়ে আসার লোকের তো অভাব নেই দেখছি! তোরা চাস্‌ খালি দুষ্টুমি করতে।'

দরোয়ানকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল মিশা।

সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'ভাসিলি খুড়ো, ছুতোরের কাজ ধরেছ বুঝি?'

রাগে হোস্‌পাইপটাকে ঝাঁকাল ভাসিলি খুড়ো, দোতলার জানলা অবধি উঠে যায় জলের তোড়টা।

'গুদামঘরের চিন্তায় ফিলিনের ঘুম নেই, আর আমাকে লাগাতে হচ্ছে তক্তা। একেবারে জোঁকের মতো পেছনে লেগে ছিল। বলে, তলাকুঠরি দিয়ে তার গুদামঘরে চোর ঢুকতে পারে, তাই আমাকে তক্তা লাগাতে হবে! এদিকে তো ভাঙা লোহালক্কড় ছাড়া আর কিছুই নেই গুদামে — একেবারেই কিচ্ছু নেই। কিন্তু তাহলেও তক্তা লাগাতে হবে আমাকে। এ এক বেআক্কেলেপনা — আমার সাফ কথা।'

ও, ব্যাপার তাহলে এই? এ কারবারের পেছনে রয়েছে ফিলিনই। কী যেন একটা রহস্য আছে কোথাও। বর্‌কা যে কাল তলাকুঠরিতে ঢুকতে দিল না তারও কিছু কারণ আছে নিশ্চয়। একেবারে এমনি এমনি নয় ব্যাপারটা!

ফটকের কাছে সিগারেট ফেরি করছিল বর্‌কা।

মিশা ওর কাছে গিয়ে বলল, 'এই, চল্‌ যাই তলাকুঠরিতে।'

বর্‌কা মুখ বেঁকিয়ে উঠল, 'তা হচ্ছে না চাঁদ! দরজায় ওরা তক্তা এঁটে দিয়েছে।'

'কার হুকুমে?'

বর্‌কা নাক কোঁচকাল।

'কার? সব্বাই জানে কার: বাড়ির ম্যানেজারের।'

'কেন হুকুম দিল সে?'

'কেন? কী জন্য?' ভেংচে ভেংচে বলল বর্কা, 'যাতে মড়াগুলো না পালিয়ে যায়। সেই জন্য। আর যাতে তোর মতো লোকগুলো ওখানে ঘুরঘুর না করে ...' বাকি কথাগুলো জুড়ে দিয়ে সে পিট্টান দিল।

তাড়াতাড়ি ওর পেছু নিল মিশা। কিন্তু বর্কা তখন ওর বাপের গুদামঘরে আশ্রয় নিয়েছে। মিশা ওকে ঘুষি দেখিয়ে ক্লাবঘরে চলে গেল।

জুর্বিনের চিঠিতে কাজ হয়েছে। মিতিয়া সাখারভ ক্লাবের কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ছোটদের জন্য, কিন্তু শাসিয়ে রেখেছে একটা পয়সাও ওদের দেবে না বলে।

বলেছে, 'থিয়েটারের আসল কথাই হল টাকাপয়সার সচ্ছলতা। অন্যের কোনো আর্থিক সাহায্য না নিয়েই কাজ চালাতে চেষ্টা করো।' আরো আরো সব অদ্ভুত কথা বলেছে যার মাথামুণ্ড ছেলেরা বোঝেনি।

যারা যোগ দিতে চায় তাদের প্রত্যেককে পরখ করে দেখেছে ধেড়ে শুরা, পুশকিনের 'ভবিষ্যদ্বক্তা' কবিতাটা ওদের দিয়ে আবৃত্তি করিয়েছে। যেভাবে ওরা আবৃত্তি করল তাতে কিন্তু শুরা খুশি হল না। নিজেই দেখিয়ে দিল কীভাবে আবৃত্তি করতে হবে। যখন 'আমার এ পাপ-জিহ্বা ছিঁড়েছি দু'হাতে টেনে' জায়গাটা বলতে হল তখন ও দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এমন বেপরোয়াভাবে হাতদুটো ঘুরিয়ে নিয়ে গেল যেন সত্যি সত্যিই নিজের জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে সিঁড়ির নিচে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওর কসরতটা এমনই বাস্তব হল যে 'ছিঁচকাঁদুনে' খুদে ভভ্কা বারানভটা এসে ওর মুখের ভেতর দেখতে লাগল সত্যিই জিভটা গেছে কিনা।

লোক বাছাইয়ের পর শুরু হল নাটক বাছাবাছি।

স্লাভা বলল, 'পাভেল ইভানভ।'

হাত ঝাঁকিয়ে শুরা জবাব দিল, 'ওসব আর লোকে চায় না, অনেক দেখেছে—বস্তাপচা কূপমণ্ডূকদের পালাগান।' তারপর ভেংচে ভেংচে বলল:

ইরানের মহান্ সেই বাদশাহ 'কীর'
ছিঁড়িলা যে রাজবস্ত্র হইয়া অস্থির...

'ওসব রাজাবাদশাদের আমরা ভালো করেই চিনি! না, ও চলবে না!' এমনভাবে ও কথাটা বলল যেন আর দ্বিতীয় কথা না ওঠে।

অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পর অবশেষে ওরা ঠিক করল 'কুলাক আর খেতমজুর' নামে কাব্যনাট্যটা করবে। ভানিয়া নামে একটি খেতমজুরের ছেলে কুলাক পাখোমের খামারে কাজ করত — তাই নিয়ে গল্পটা।

কুলাকের পার্টটা নিল শুরা। গেঙ্কা হল ভানিয়া। আর ভানিয়ার দিদিমার ভূমিকায় নামল জিনা ক্রুগ্‌লোভা নামে একটা মোটা মেয়ে, খালি হি হি করে হাসে, থাকে এক নম্বর ব্লকে।

লোক বাছাবাছির ব্যাপারে মিশা মাথা গলায়নি। দাবার ছক নিয়ে বসে হাতের ওপর থুতনি রেখে ও ভাবছিল বাড়ির তলার কুঠরিটার কথা।

বর্‌কা ফিলিন ওকে ঠকিয়েছে, ইচ্ছে করেই ঠকিয়েছে। বাপকে বলে দিয়েছিল, তাই ওর বাপও দরজার মুখটা বন্ধ করিয়ে নিয়েছে। তার মানে তলাকুঠরি আর গুদামঘরের মধ্যে নিশ্চয় কোনো রকম যোগাযোগ রয়েছে — যদিও গুদামঘরটা পাশের আঙিনায়।

মরচে-ধরা বিকল কলকব্জা আর লোহালক্কড়ে বোঝাই গুদামঘরটার আবার এত বিপদের ভয় কিসের? সারা আঙিনায় স্তূপাকার ছড়িয়ে আছে ওগুলো, কেউ মাথাও ঘামায় না। কার দরকার আছে ওগুলোর? কে ওর ভেতরে গিয়ে নামবে, বিশেষ করে ওই তলাকুঠরির মধ্যে যেখানে চার হাতপায়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলতে হয়?

আর এই ফিলিন লোকটা। পলেভোয় হয়তো বা এর কথাই ওকে বলেছিল। মিশার মনে পড়ে লোকটার দুপাশ-চ্যাপ্‌টা চিমড়ে মুখটার কথা, ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখ। শীতের সময় একদিন ফিলিন ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিল। বাবার ঘননীল কোট পাণ্টালুন আর ওয়েস্ট্‌কোটের বদলে ছোট এক বস্তা মোটাদানার

ময়দা দিয়ে গিয়েছিল। বাবা পোষাকটা পরে দু-এক বার শুধু। ফিলিন যেন চারদিকে তাকিয়ে আরো কিছু খুঁজছিল, খুদে চোখজোড়া ঘুরছিল কামরাটার ভেতর। যখন মা বলল পোষাকটা তার দিতে কষ্ট হচ্ছে কারণ সেই বাবার শেষ স্মৃতি তখন ফিলিন জবাব দিল:

'এ স্মৃতিচিহ্নটা কি আপনি মাখন লাগিয়ে খাবেন? ভালোই লাগবে আপনার, আশা করি।'

মা নিঃশ্বাস ফেলল। কিচ্ছু বলল না ...

মিশা মনে মনে ভাবল যে এ ব্যাপারটা শেষ অবধি তলিয়ে দেখতেই হবে। বর্‌কা যেন না ভাবে তাকে অতো সহজে ঠকানো যায়।

উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাবঘরের চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল মিশা। ভাবল এখান থেকে মাটির তলার ঘরে যাবার কোনো রাস্তা আছে কিনা কে জানে। ক্লাবটা আসলে বাড়ির আরেক অংশে নিচুতলার ভিতেই রয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটাই প্রধান কথা নয়: বাড়ির অন্য অংশের সঙ্গে ক্লাবের যোগাযোগের নিশ্চয়ই কোনো রাস্তা আছে।

মিশা ঘরের ভেতর পায়চারি করল, সাবধানে দেয়ালগুলো লক্ষ্য করে। পোস্টার ছবি টেনে তুলল, আলমারির পেছনে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। স্টেজের পেছনে গেল — মেঝের ওপর যতো অকেজো জিনিস পড়ে আছে। মৃদু আলোয় দেখল দেয়ালের গায়ে নানারকম মঞ্চসজ্জা হেলান দিয়ে রাখা — কালো-সাদা গুঁড়িওয়ালা প্লাইউডের বার্চ গাছের নক্‌শা, জাফরি কাটা জানলাওয়ালা কুটির, নদীর দৃশ্যশুদ্ধ ঘড়িওয়ালা ঘর।

সিন্‌গুলো সরিয়ে দেয়ালের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করছিল মিশা, এমন সময় পর্দার পেছন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল কমরেড় মিতিয়া সাখারভ।

'মিশা পলিয়াকোভ? তুমি এখানে কী করছ?'

'দশটা কোপেক হারিয়েছি কমরেড সাখারভ, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'দশটা কোপেক মানে?'

'দশটা কোপেক, একটা দশ-কোপেক পয়সা আর কি।' চোখটা ঠায় একদিকে রেখে বিড়বিড় করে মিশা বলল। শাদা থামওয়ালা একটা জমিদার বাড়ির সিন্। ছবিটার পেছনে একটা লোহার দরজা।

'একটা কুড়ি-কোপেক পয়সা, বুঝলেন ...'

'হুম্। এসব কী বাজে কথা হচ্ছে? দশ-কোপেক, আবার এখন হল কুড়ি-কোপেক পয়সা।... মন কোন্‌দিকে রয়েছে শুনি?'

'না, কিছু না।' দরজাটার দিকে তখনো তাকিয়ে থেকে মিশা জবাব দিল। 'আমার একটা দশ-কোপেক পয়সা ছিল, কিন্তু কুড়ি-কোপেক পয়সা হারিয়েছি। এর মধ্যে গণ্ডগোল কোথায়?'

'অনেক!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিতিয়া সাখারভ বলল, 'অনেক গণ্ডগোল, বুঝলে হে! এখন তাড়াতাড়ি দশ-কোপেক-কুড়ি-কোপেক পয়সাটা খুঁজে নিয়ে সরে পড়ো তো।'

হাতের তেলো দিয়ে চুলটা পেছনে ঠেলে সমান করে বেরিয়ে গেল সে।

২৪

মাটির তলার ঘর

মস্কো নদীর ধারে দরগমিলভ্‌স্কি পুলের গা ঘেঁষেই যে নতুন জলাধারটা তারই কাছে বসেছিল মিশা, গেঙকা আর স্লাভা।

হেলান দিয়ে শুয়ে স্লাভা স্বপ্নালসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নদীর জলে গেঙকা পাথর ছুঁড়ে মারছে আর গুণছে কতোবার সেটা জলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়। মিশা সাথীদের সাধাসাধি করছিল ওর সঙ্গে গিয়ে তলাকুঠরিটার রাস্তা খুঁজে বের করবার জন্য।

দিনের আলো মিলিয়ে আসছে। পাতলা কুয়াশার কুণ্ডলীগুলো যেমন তেমন করে ফুলোনো ধোঁয়াটে বলের মতো জলের ওপরটা ছুঁয়ে যাচ্ছে, একটু ধাক্কা খেয়েই আবার আল্‌তোভাবে ফিরে যাচ্ছে বাতাসের মধ্যে। পুলের ওপর

ট্রামগাড়ির আওয়াজ, পথিকরা ত্রস্ত পায়ে ছুটেছে, ছুটেছে মোটরগাড়ি। ছেলেরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ওদের খুদে খুদে দেখায়।

মিশা বলছিল, 'ভেবে দ্যাখ্ একবার, মড়া আর কফিন সব গাঁজাখুরী গল্প। যেন মড়া নিয়েই ফিলিনের যতো মাথাব্যথা! ওসব বানানো হয়েছে স্রেফ আমাদের দূরে খেদাবার জন্য। ইচ্ছে করেই বানানো। হয় একটা সুড়ুঙ-টুড়ুঙ আছে নয়তো কিছু লুকিয়ে রাখতে চাইছে।'

গেঙ্কা নিঃশ্বাস ফেলল, 'মিছে তর্ক করিসনে মিশা। এমন সব মড়া আছে যারা সত্যিই শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। তলাকুঠরিতে গেলে যে কোনো সময় ওরা আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারে।'

স্লাভা বলল, 'মড়া-টড়া ওখানে নেই অবিশ্যি। তবে ও নিয়ে আমরা মাথাই বা ঘামাব কেন? ধর্ ফিলিন না হয় কিছু লুকিয়েই রাখছে ওখানে — সবাই তো জানে ও একটা ফাট্কাবাজ। এ নিয়ে আমাদের এত ভাবনা কেন?'

''কিন্তু সত্যিই যদি নিচে এমন সুড়ুঙ থাকে যেটা সারা মস্কোর তলায় ছড়িয়ে আছে, তাহলে?'

স্লাভা আপত্তি করল, 'সেটা তো আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কোনমতেই। আমাদের হাতে নকশা কোথায়?'

মিশা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এটুকু বুঝতে পারছি যে তোরা সব ভীতু। তোদের আবার ইয়ং পাইওনিয়র হওয়া! কেন যে কথাটা তুলেছিলাম তাই ভাবছি। মরুক্‌গে, তোদের বাদ দিয়েই আমি নিজের রাস্তা দেখব।'

গেঙ্কা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি তো বলিনি যে যাব না, বলেছি? আমি শুধু মড়ার কথা তুলেছিলাম। তুই এত সহজেই গরম হয়ে উঠিস ... স্লাভাটাই তো যেতে চাইছে না ... তুই যখনি বলবি আমি যাব ...'

স্লাভা লাল হয়ে উঠল, 'কখন আমি যাব না বললাম শুনি? শুধু বলছিলাম সঙ্গে নকশা থাকলে ভালো হয়। তাই না রে?'

অন্য সবাই থিয়েটারের মহড়া দিতে আসার আগেই তিন বন্ধু এসে হাজির হল ক্লাবঘরে।

ছোটদের নাট্যচক্রের মহড়া চলে বিকেলের দিকে দুটো তিনটে নাগাদ। তারপর ইয়েলিজাভেতা মাসি, ঝাড়ু দেওয়া যার কাজ, ক্লাবের দরজায় তালা মেরে রাখে সন্ধ্যে পাঁচটা অবধি — তখন আসে বড়োরা। চারটে থেকে পাঁচটা — এই ফাঁকা সময়টায় ওরা তলাকুঠরিতে ঢুকবে ঠিক করেছিল।

স্টেজের পেছনে মিশা আর স্লাভা গিয়ে লুকোল। গেঙকা দাঁড়িয়ে রইল অন্য অভিনেতাদের অপেক্ষায়। একটু বাদে তারা এসে মহড়া শুরু করে দিল। ওদের প্রত্যেকটা কথা মিশা আর স্লাভা শুনতে পাচ্ছিল।

কুলাকের পার্ট শুরার, ভানিয়ার পার্টে গেঙকাকে বোঝাচ্ছিল।

'ভানিয়া, তোকে আমি শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছি,' আবৃত্তি করতেই ভানিয়ারূপী গেঙকা সগর্বে পাল্টা জবাব দিল:

'আপনাকে তো আমি তা করতে বলিনি।'

তারপর ওদের তর্ক শুরু হল কেমনভাবে গেঙকা স্টেজে দাঁড়াবে তাই নিয়ে — দর্শকের দিকে তাকিয়ে শুরার দিকে পেছন ফিরিয়ে, না, শুরার দিকে তাকিয়ে দর্শকের দিকে পেছন ফিরিয়ে। যতো না মহড়া হয় তার চেয়ে বেশি হয় তর্ক। সকলের ওপরেই তম্বি করে শুরা, বলে সমস্ত ব্যাপারটা থেকেই ও সরে দাঁড়াবে একদম। গেঙকা ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। জিনা ফ্রুগ্‌লোভা আর হাসি সামলাতে পারে না, সব সময় খালি খিক্ খিক্ করে হাসে।

শেষ পর্যন্ত মহড়া শেষ হল। সকলের চোখ এড়িয়ে গেঙকা ওর বন্ধুদের সঙ্গে মিলল। অন্য ছেলেমেয়েরা তখন বেরিয়ে গেছে। ইয়েলিজাভেতা মাসি ক্লাবঘর বন্ধ করল। তিনটি ছেলে এখন একা দাঁড়িয়ে আছে সেই ভারি লোহার দরজাটার সামনে, তলাকুঠরিতে যাবার রাস্তার মুখে।

সঙ্গে সাঁড়াশি এনেছিল ওরা। তাই দিয়ে একটা পেরেক তুলে দরজাটা টেনে নিল। মরচে-ধরা কব্জায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ হয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল।

ভেতর থেকে এল ভ্যাপ্‌সা একটা দম্‌কা হাওয়া। ছোট একটা টর্চ জ্বালল মিশা, তারপর সবাই ভেতরে এগিয়ে গেল।

টর্চের ব্যাটারিটা দুর্বল। তাই এবড়োখেবড়ো ধূসর দেয়ালটা দেখবার জন্য ওদের ঝুঁকে পড়তে হল।

তলার কুঠরিগুলোর ভেতর ঢুকে ওরা দেখল চৌকো চৌকো অনেকগুলো কামরায় ওগুলো ভাগ করা — বাড়ির ভিতের সঙ্গেই তৈরি হয়েছিল। কামরাগুলো খালি, শুধু একটার মধ্যে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটো বয়লার। এটা একটা পরিত্যক্ত বয়লার ঘর। মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাইপ, জমে-যাওয়া চূণ, ইট, কয়লা আর শুকনো সিমেণ্টভরা কাঠের বাক্স।

টর্চটার তেজ ক্রমে কমে আসে। অবশেষে একেবারেই নিভে গেল। অন্ধকারেই চলতে থাকে ছেলেরা, হাত দিয়ে রাস্তার মোড়গুলো বুঝতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ওদের মনে হয় বুঝি একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু মিশা যেন জিদ ধরে এগিয়ে চলেছে সামনে, ওর সঙ্গে তাল রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে গেঙকা আর স্লাভা।

সরু একটা ফাঁক দিয়ে একটুকরো আলো আসছিল। ওরা সেই তক্তা লাগানো দরজাটার কাছে এল এবার। তক্তার ফাঁক দিয়েই গলে এসেছে আলোটা। দরজার কাছে একটা সরু সিঁড়ি উঠেছে সিঁড়ির ধাপগুলো উঁচু, লোহার হাত-রেলিং লাগানো।

কুঠরির ভেতর আরো অনেকটা এগিয়ে গেল ছেলেরা, আগের মতোই ডানদিকে ঘেঁষে চলে। রাস্তাটা ক্রমে আরো সরু হয়ে এল। মিশা হাত দিয়ে ছাদটা আন্দাজ করল আর সেই লোহার পাইপটাও। চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতল — মাথার ওপর কল্‌কল করে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

গুটিসুটি হয়ে বসে মিশা দেশলাই জ্বালল। নিচের দিকে নেমে গেছে সরু

একটা রাস্তা — বর্কার সঙ্গে এসে এই রাস্তাটার মধ্যেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেবার। রাস্তাটার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে চলল ছেলেরা। শেষ কিনারায় এসে মিশা হাত উঁচু করে ছাদটা ছুঁতে চেষ্টা করল। ছোঁয়া যায় না। তখন ফের দেশলাই জ্বালল।

ছেলেরা দেখল, নিচু ছাদওয়ালা মস্তো একটা চারকোণা ফাঁকা জায়গার মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

গেঙ্কা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'ওই দ্যাখ্, কফিন!'

উল্টো দিকের দেয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো কফিনের কালো রেখাকৃতি দেখা যাচ্ছে।

ছেলেরা সব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেশলাই নিভে গেল। অন্ধকারে ওদের মনে হল যেন অদ্ভুত সব খস্ খস্ শব্দ আর কবরখানার চাপা গলার আওয়াজ ওদের কানে আসছে। মাটির সঙ্গে ওদের পা যেন এঁটে গেল — হঠাৎ মাথার ওপর একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, একটা আলোর রেখা দেখা দিল, চওড়া হয়ে উঠল রেখাটা, তারপরেই ওরা শুনতে পেল কাদের পায়ের খস্ খস্ আওয়াজ। দৌড়ে সেই রাস্তাটার ভেতর পালিয়ে গিয়ে ওরা লুকিয়ে রইল। নিঃশ্বাস নিতেও সাহস হচ্ছে না যেন।

ছাদের ওপর একটা কব্জা লাগানো দরজা খুলে গেল। কে যেন একটা মই নামিয়ে দিচ্ছে নিচে। দুটি লোক সাবধানে মই বয়ে নেমে এল। ওপর থেকে কতগুলো বাক্স নামিয়ে দেওয়া হল হাতে হাতে। থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা অন্য বাক্সগুলোর পাশে ওগুলোকেও রাখা হল, অথচ ভয়ের চোটে ছেলেরা ওই বাক্সগুলোকেই তখন কফিন ভেবেছিল।

তারপর তৃতীয় লোকটা নিচে নেমে এল। মই থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে শাপমন্যি দিল লোকটা। মিশা চমকে উঠল। ওর মনে হচ্ছে যেন গলার আওয়াজটা চেনা চেনা।

লোকটা ঢ্যাঙা। ঘরের ভেতর ঘুরে ঘুরে বাক্সগুলো পরীক্ষা করল। তারপর নাক দিয়ে হাওয়া টেনে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে দেশলাই জ্বালিয়েছিল কে?'

ছেলেদের বুক গড়গড় করে উঠল।

আরেকজন জবাব দিল, 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি, সের্গেই ইভানভিচ্?'

ফিলিনের গলার আওয়াজ চিনতে পারল ছেলেরা।

'আমি কখনো স্বপ্ন দেখি না, সেটি জেনে রাখুন হে ফিলিন।'

রাস্তার মুখ পর্যন্ত সরে এল ঢ্যাঙা লোকটা। ছেলেদের খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ওদের দিকে পেছনটা ফেরানো। তাই ওর মুখ দেখতে পেল না ছেলেরা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তো?'

'হ্যাঁ, হুবহু যেমনটি আপনি হুকুম করেছেন।' চট্‌পট্ জবাব দিল ফিলিন। 'তক্তা এ'টে দিয়েছি দরজায়, রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

কথাটা মিথ্যে। রাস্তা মোটেই বন্ধ করা হয়নি।

তিনটে লোকই অবশেষে কব্জা-আঁটা দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল। যাবার সময় মই টেনে নিল। দরজা ভেজিয়ে দিতেই আবার অন্ধকারে ডুবে গেল কামরাটা। তিন বন্ধু তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চলল ক্লাবঘরের দিকে। দরজা আগেই খোলা ছিল। ওরা ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

২৫

সন্দেহজনক লোক

এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সবেমাত্র। গরমের দিনের বৃষ্টি। নুড়িপাথর, দোকানের জানলা, গাড়ির ধূসর চন্দ্রাতপ আর কালো সিল্কের ছাতাগুলো চক্‌চক্ করছে। হাঁটার পথের পাশেই কাদাটে স্রোত ছুটেছে জাফরি-লাগানো কুয়োর দিকে। মেয়েরা জুতো হাতে নিয়ে মহাফূর্তিতে হাসতে হাসতে চলেছে জলা কাদার ভেতর দিয়ে জল ছিটিয়ে। কয়েকজন রাজমিস্ত্রি গেল মাথার ওপর ঘোমটার মতো বস্তা ঢেকে নিয়ে। একটা ফাটা পাইপ থেকে জলের ফোয়ারা নেবে পথচারীদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। সভয়ে লাফ দিয়ে একপাশে হটে যাচ্ছে তারা। আর এসব কিছুর ওপর ছেঁড়াখোড়া ভারি মেঘগুলোকে সরিয়ে আকাশে আলোর রেখা ফেলেছে সতেজ সূর্য।

মিশা জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে গেঙ্কা, তুই অমন ভয় দেখিয়ে দিলি কেন? চারদিকেই তো শুধু কফিন দেখিস তুই!'

গেঙ্কা পাল্‌টা জবাব দিল, 'তার মানে তোরা নিজে ভয় পাসনি বলতে চাস? তোরাও তো জবর ভয় পেয়েছিলি আর আমার ঘাড়ে সব দোষ চেপে দিলি!'

এক মিনিট চুপ করে থেকে তারপর ফের বলল, 'আমি জানি ও বাক্সগুলোর ভেতর কী আছে।'

'কী?'

'সুতো। ঠিক যা বললাম।'

'কেমন করে জানলি?'

'আমি জানি। ফাটকাবাজরা সব্বাই এখন সুতোর কারবার করছে। ওরা বলে ওতেই সবচেয়ে বেশি লাভ।'

কিন্তু মিশার কানে এখনো সেই ক্ষীণ অদ্ভুত পরিচিত গলার আওয়াজটা

বাজছে। কে হতে পারে লোকটা? ওরা তাকে সের্গেই ইভানভিচ্ বলে ডাকছিল... পলেভোয়েরও ওই একই নাম ... কিন্তু এ লোক তো আর পলেভোয় নয় ... দু'জনের নামের মিল রয়েছে এইমাত্র।

'আর্ট' সিনেমার সামনে দাঁড়িয়েছিল ছেলেরা। মিশার নজর গুদামঘরের দরজাটার দিকে। ছবির বোর্ডের ওপর ফটোগ্রাফগুলো দেখছিল গেঙ্কা আর স্লাভা। 'দুর্ভিক্ষ ... দুর্ভিক্ষ ... দুর্ভিক্ষ।' ভোল্‌গা এলাকার দুর্ভিক্ষ নিয়ে ফিলম্ দেখানো হচ্ছে।

'কান-গলা-নাক' ডাক্তারের ছেলে য়ুরা স্তোত্‌স্কি ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ও ছিল বয়স্কাউট, কিন্তু এখন তো স্কাউট উঠে গেছে, তাই উর্দি-টুর্দি পরে না আজকাল। কিন্তু তবু ছেলেরা ওকে য়ুরা 'স্কাউট' বলে ডাকে। দুটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে লাঠির ডগায় একটা নিশান উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল য়ুরা।

.গেঙ্কা ওদের ধমকাল, 'এ্যাই! স্কাউট! ভালো চাস তো লাঠিটা দিয়ে দে!'

নিশানটা ধরে টান মারল ও। লাঠির আরেকটা দিক ধরল য়ুরা আর ওর বন্ধুরা। তিনজনের বিরুদ্ধে গেঙ্কা একা। বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল ও। কেন আসছে না ওরা? কিন্তু স্লাভা মাথা গলাল না। মিশা শুধু বলল, 'ছেড়ে দে।' ফিলিনের গুদামঘরটার দিকে যেমন তাকিয়েছিল তেমনিই তাকিয়ে থাকে।

কী বলতে চায় মিশা? 'ছেড়ে দে?' মানে? স্কাউটগুলো ওর ওপর টেক্কা দিক আর কি! এইসব বুর্জোয়ার পেটোয়াগুলো — কোন্ নাকি এক জেনারেলকে এরা সমর্থন করছে। বেশ তো, গেঙ্কা দেখিয়ে দেবে জেনারেল কাকে বলে! ও তরফের ছেলেগুলোকে সে লাথি মারতে থাকে আর প্রাণপণে চেপে রাখে লাঠিটা।

মিশা চটে গিয়ে বলল, 'ছেড়ে দে বলছি! এই!'

লাঠিটা ছেড়ে দিল গেঙ্কা।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আচ্ছা বেশ, পরে দেখিয়ে দেব'খন।'

য়ুরা নাক সিঁটকিয়ে দেমাক দেখিয়ে বলল, 'আয় না, দেখা না দেখি! তোকে ভয় করি থোড়াই ...'

বন্ধুদের নিয়ে গট্‌গট্‌ করে চলে গেল য়ুরা। অবাক হয়ে মিশার দিকে তাকাল গেঙকা। কিন্তু মিশা ওদের দু'জনের কাউকেই পাত্তা দিল না। গুদামঘর থেকে একটা রোগা ঢ্যাঙা লোক বেরিয়ে এল, পায়ে উ'চু বুট, সাদা ককেসীয় কোর্তা পরা, রুপোর কাজ করা কালো বেল্‌ট এ'টেছে। সিগারেট ধরাবার জন্য লোকটা ফটকের সামনে দাঁড়ায়, দেশলাই কাঠি তুলে জ্বলন্ত শিখাটা হাত দিয়ে আড়াল করল। মুখখানা হাতের পেছনে ঢাকা পড়েছে! আঙুলের ফাঁক দিয়ে রাস্তাটা একবার দেখে নিল লোকটা। তারপর কাঠি ফেলে দিয়ে আরবাত স্কোয়ারের দিকে চলে গেল। মিশা পিছু নেয়, কিন্তু রাস্তা পার হতে হতেই লোকটা হঠাৎ ধাঁ করে একটা ট্রামগাড়িতে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল...

মস্কোর সান্ধ্য রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে মিশা। একটা অস্পষ্ট ভয় ওর বুকটাকে যেন চেপে ধরে।

গির্জার গম্বুজে সূর্যাস্তের লালিমা যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যের গরম হাওয়ায় রাস্তার গলা অ্যাস্‌ফাল্‌টের গন্ধ আর নুড়িপাথরওয়ালা রাস্তার ধুলো উড়ে আসছে। সবুজ বুলভারে নিশ্চিন্তে খেলছে ছেলেপিলের দল। বুড়িরা বসে আছে বেঞ্চিতে।

মিশা ভাবল, 'লোকটার গলার আওয়াজ এত চেনা মনে হল কেন? কোথায় শুনেছে ও এ আওয়াজ? মাটির তলার কুঠরিতে ফিলিন কী জিনিস লুকিয়ে রেখেছে? হয়তো বা কিছুই নেই ওখানে। স্রেফ গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করছে কুঠরিটাকে। আওয়াজটা যে চেনা সেটা অবিশ্যি ওর কল্পনাও হতে পারে। কিন্তু ধরো যদি ... না, না, তা হতেই পারে না! এ লোকটিই নিকিৎস্কি, তাও কি সম্ভব? না, না—সে রকম চেহারাই নয়। মুখের সেই কাটা দাগ কোথায়? কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুল? না, এ নিকিৎস্কি নয়। তা ছাড়া এর নাম তো সের্গেই ইভানভিচ্‌ ... যদি নিকিৎস্কি হত তাহলে কী আর অতো খোলাখুলি মস্কোতে ঘুরতে সাহস পেত?'

ভজ্‌দ্‌ভিজেঙকা পেরিয়ে মিশা মখভায়ায় এল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়ার পাশেই বইওয়ালাদের দোকান। রোগা কোলকু'জো,

দুমড়োনো টুপি-পরা চশমা-আঁটা বুড়ো লোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে। শ্রমিক ফ্যাকাল্টির ছাত্ররা দলে দলে বেরিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওদের গায়ে রুশ কামিজ আর চামড়ার জ্যাকেট, বগলে জীর্ণ ব্রীফকেস্।

বলশায়া নিকিৎস্কায়া স্ট্রীটের কোণায় মিশার পথ রুখে দিল শোভাযাত্রীদের একটা দল। ওরা ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ার মহল্লার মজুর। সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে তাদের হাতের ফেস্টুনের ওপর লেখা: 'আঁতাতের ভাড়াটে দালালরা নিপাত যাক!' 'আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরেরা নিপাত যাক্!' দলটা যাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের দিকে — সেখানে কয়েকজন সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীর* বিচার হচ্ছিল।

শোভাযাত্রীদের আর একটা দল আসছে লুবিয়ানস্কায়া আর লাল স্কোয়ার থেকে। এরা সব সকোলনিকি আর জামোস্ক্ভরেচিয়ে এলাকার লোক। এসেছে 'গুজন্,' 'ব্রম্লি' আর 'মিখেলসন্' কারখানা থেকে**। কমসমোল সদস্যরা খুব উত্তেজিতভাবে আলাপ আলোচনা করছে। তখনকার মতন তৈরি জায়গার উপর দাঁড়িয়ে বক্তারা জনতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে। ওরা বলছে—বৃটিশ আর মার্কিন পুঁজিপতিরা সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবী বেইমানদের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে টুঁটি টিপে মারতে চেয়েছিল। সামনাসামনি লড়াইয়ে তারা হেরে গেছে, সোভিয়েত দেশের ওপর হাত বাড়াবার ফন্দি ওদের নষ্ট হয়েছে, এখন তাই তারা আমাদের দেশে গুপ্তচর আর গুপ্তবিনাশক পাঠাচ্ছে, সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটছে।

মিশা ভাবে, নিকিৎস্কি হয়তো বিদেশে পালিয়ে যায়নি। হয়তো বা কোথাও লুকিয়ে আছে, আর ষড়যন্ত্র আঁটছে ঠিক এই লোকগুলোর মতোই যাদের এখন বিচার হচ্ছে। সে ছিল শ্বেতরক্ষী, সোভিয়েত শাসনের চরম দুশমন... ওই ঢ্যাঙা লোকটা সত্যিই যদি নিকিৎস্কি হয় আর এই ফিলিনই যদি সেই ফিলিন হয় যার কথা পলেভোয় বলেছিল? সে ক্ষেত্রে নিকিৎস্কি নিশ্চয়ই ফিলিনের বাড়িটাকে

---

* সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীরা ছিল পেটি বুর্জোয়াদের একটা দল। ওরা কালক্রমে শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খুন, গোয়েন্দাগিরি, আর অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হয়।

** কারখানাগুলোর নাম ওখানকার প্রাক্তন মালিকদের নামেই পরিচিত ছিল।

গোপন আড্ডা হিসেবে ব্যবহার করছে! ছদ্মবেশে আছে আর নামটাও বদলে নিয়েছে... হয়তো বা ওরা তলাকুঠরিটাকে ব্যবহার করছে ওদের শ্বেতরক্ষী ডাকাতদলের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার কাজে। সত্যিই বড়ো সন্দেহজনক ব্যাপারটা।

পলেভোয় ওকে সাবধান থাকতে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা। ও তখন ছোট্টটি ছিল। আর আজ ও সবকিছু বুঝতে পারে। ও কি এখনও সবুর করবে পলেভোয়ের জন্য? যদি সত্যিসত্যিই কোনো ষড়যন্ত্র চলতে থাকে আর অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়? না, আর অপেক্ষা করা চলে না ...

ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের দরজায় লাল ফৌজের দু'জন সৈনিক দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের প্রবেশপত্র পরীক্ষা করছিল। মিশা ফাঁক দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করতেই একটা সবল হাত ওকে চেপে ধরল।

'কোথায় যাবে ভেবেছ, অ্যাঁ? পাশ দেখাও!'

কটমট করে পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে মিশা চলে গেল। ওরা খালি সারাদিন ওখানে দাঁড়িয়েই রয়েছে — এই তো কাজ। মিশা যে শীগ্‌গিরই একটা সাংঘাতিক রকমের চক্রান্ত উদ্ঘাটিত করে দেবে সে খবর ওরা রাখে?

২৬

দড়ির পথ

ফিলিনের নিচু গুদামঘরের ইটের কাঠামোটা ওপাশের আঙিনা বরাবর চলে গেছে। চওড়া ফটক আর তক্তা-ঢাকা জানলাগুলো। ওপাশের আঙিনায় রাজ্যের লোহালক্কড় কলকব্জা আর টুকরোটাকরা টিন লোহা ছড়ানো।

বেশির ভাগ সময়টাই মিশা গুদামঘরের কাছে কিংবা আশেপাশে কাটায়। একবার ও ভেতরে ঢুকেও পড়েছিল, কিন্তু ফিলিন তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই দূর থেকে নজর রাখছে দরজাটার ওপর। দিনের পর দিন সিনেমার দরজায়, হলদে-

সবুজ সাইনবোর্ডওয়ালা সরাইখানা, কিংবা রুটির দোকানটার পাশে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ্য রেখেছে কিন্তু সাদা ককেসীয় কোর্তা-পরা সেই ঢ্যাঙা লোকটা তো আর এল না। একদিন ফিলিনের গুদামঘরের নিচের কুঠরিতে ঢুকবে ঠিক করল মিশা। কিন্তু ভেতরে ঢুকবার রাস্তাটা দেখল বন্ধ।

এদিকে থিয়েটারের মহড়াও শেষ হয়ে আসছে। অভিনয়ের দিন এগিয়ে এল। শুরা ওকে হরদম জ্বালাতন করতে লাগল সাজ রংচং কিনে দেবার জন্য।

শুরা বলল, 'তুই তো ম্যানেজার। সাজবার জিনিসগুলো যাতে পাই সে তো তুইই দেখবি। সিনারির ব্যবস্থা আমরা করে নেব, কিন্তু সাজবার রং জোগাড় করতে হবে তোকে। শুধু তাই নয়। পরচুলাও দরকার। তুই তো ম্যানেজার। এ তোরই কাজ। সব জিনিস তো আর আমি একা দেখতে পারি না! আর অভিনয়, পরিচালনা এসব ব্যাপার নিয়েই একজনকে কতো ব্যস্ত থাকতে হয় সে তো তুই জানিস।'

· মিতিয়া সাখারভ টাকা দিতে রাজি হয়নি। তাই মিশা ঠিক করেছে লটারি করে টাকা তুলবে। পুরস্কার হিসেবে গোগলের রচনাবলীটার মায়া ত্যাগ করতে হয় ওকে। বইটা ছাড়তে অবিশ্যি বুকে ব্যথা বাজে, তবু এ ছাড়া আর করারই বা কী আছে। অভিনয়টা তো আর মাঠে মারা যেতে দিতে পারে না ও? তা ছাড়া ধেড়ে শুরাটা তো সব সময়ই বলে— 'ত্যাগস্বীকার না করলে আর্ট হয় না।'

একেকখানা টিকিট তিরিশ কোপেক করে — একশো টিকিট দেখতে দেখতে বিক্রি হয়ে গেল। কিনতে রাজি হয়নি শুধু বর্কা। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে লটারিটাকে বানচাল করতে। রটিয়ে দিয়েছে যে পুরস্কার উঠবে নির্ঘাৎ মিশার টিকিটেই, সব টাকাগুলো যাবে ওরই পকেটে। লটারিটার বদনাম রটাবার জন্য ও যেন পণ করেছে— মিশা আর গেঙ্কা মারধোর করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি।

বর্কার ইদানীংকার বন্ধু হয়েছে য়ুরা 'স্কাউট'। ও আজকাল আঙিনায় খেলতে আসে। নাট্যচক্রের ছেলেদের মন অন্য দিকে টানবার জন্য বর্কা আর য়ুরা একদিন শূন্যে একটা দড়ির পথ বানাল।

দড়ির পথটা ধাতুর তার দিয়ে তৈরি, পেছনের আঙিনার ওপর দিয়ে টাঙানো—একদিকটা এক বাড়ির মইয়ের সঙ্গে বাঁধা দোতলার উঁচুতে, আরেকটা দিক গাছের সঙ্গে একতলা উঁচু। তারের ওপর ছোট চাকা বসানো আছে, তা থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটা দড়ি। দড়ির আলগা দিকটায় একটা ফাঁস। 'সওয়ারী' বসে ওই ফাঁসটার মধ্যে, উঁচু দিকটা থেকে ধাক্কা খেয়ে তরতর করে গড়িয়ে আসে উঠোনের ওপর দিয়ে। একটা লম্বা দড়ির সাহায্যে ফাঁসটাকে ফের টেনে নিয়ে যাওয়া হল উঁচু দিকে। প্রথমে চড়ে বর্‌কা, তারপর য়ুরা, তারপর আরো অনেক ছেলে।

দড়ির পথটা প্রত্যেকেরই নজর টানে। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে ছেলেপিলেরা আসে দেখতে। জানলা থেকে ওদের তারের পুলের খেলা দেখে কৌতূহলী ভাড়াটেরা। দরোয়ান ভাসিলি খুড়ো তার ঝাড়ুটার ওপর অনেকক্ষণ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে যায়, 'আপদ আরো বাড়ল দেখতে পাচ্ছি!'

য়ুরার সঙ্গে কী পরামর্শ করে হঠাৎ বর্‌কা তারের পুলটা বন্ধ করে দিল। জানিয়ে দিল বিনা পয়সার আর চড়া চলবে না। যার চড়ার ইচ্ছে হবে সে পাঁচ কোপেক করে পয়সা দেবে।

আরও বলল, 'যার পয়সার টানাটানি আছে সে ইচ্ছে করলে মিশাকে লটারির টিকিট ফেরত দিয়ে পয়সা ফিরিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া ও লটারিতে কী বা লাভ হবে তোদের? কিছুই জুটবে না ভাগ্যে।'

'পায়রা-পোষা' ইয়েগর্‌কাই মিশার কাছে গেল প্রথম। ওর পেছন পেছন 'ফুলো-ঠোঁট' ভাস্‌কা। টিকিট বের করে ওরা বলে পয়সা ফেরত দিতে। এমনি সময় হাজির হল গেঙ্কা। মিশা আর ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে।

রুটির দোকানের কর্মচারীটাকে নকল করে সরু মিষ্টি গলায় ও জানিয়ে দিল, 'আমি বড়ই দুঃখিত ভদ্রমহোদয়রা। কিন্তু কোনো কিছু দিয়ে ফেরত নেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। "কাউণ্টার ছাড়িবার পূর্বে ভাঙানির পয়সা গুনিয়া লইবেন"।'

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সোরগোল বেধে গেল। বর্‌কা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, স্রেফ দিনে দুপুরে ডাকাতি আর জোচ্চুরি। ইয়েগর্‌কা আর ভাস্‌কা পয়সা ফেরত চাইল। য়ুরা পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিংসুটের মতো মিটিমিটি হাসতে লাগল।

গেঙ্কাকে একপাশে হটিয়ে দিল মিশা। হল্লাবাজ ছেলেগুলোর দিকে শান্তভাবে একবার চেয়ে পকেট থেকে লটারির পয়সা বের করল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই একেবারে চুপ। পয়সাটা ও গোনে—পুরোপুরি তিরিশ রুব্‌ল্‌। খিড়কি দরজার সিঁড়ির ওপর পয়সাটা রাখল। একটা পাথর চাপিয়ে দিল ওপরে যাতে বাতাসে না পড়ে যায়। তারপর ছেলেদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল:

'তোদের পয়সা আমি চাই না। ফেরত নিতে পারিস। শুধু একটুখানি মাথা খাটিয়ে ভাবিস। ভাবিস য়ুরা আর বর্‌কা কেন আমাদের থিয়েটারটা নষ্ট করতে চায়। য়ুরা বয়স্কাউটদের ক্লাবে যেত একসময়। তোরা তো জানিসই বয়স্কাউটরা হল বুর্জোয়াদের পক্ষে, তারা চায় না যে আমরা নিজেদের ক্লাব করি। আর বর্‌কার কথা না হয় নাই বললাম। তাহলেই দ্যাখ! এবার যাদের বিবেক বলে কিছু নেই তারা নিজেরাই এসে ওপরে টিকিটগুলো রেখে পয়সা নিয়ে যা।'

লম্বা বক্তৃতা ঝেড়ে মিশা আঙিনার মরচে-ধরা রেডিয়েটরের ওপর গিয়ে বসল, ছেলেদের দিকে পেছন ফিরে।

কিন্তু পয়সা নিতে গেল না কেউই। সবাই বেকুবের মতো খালি একবার এপায়ে একবার ওপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই ভান করে যেন টিকিট ফেরত দেবার কোনো মতলবই তাদের ছিল না।

ইতিমধ্যে গেঙ্কা সেই বাড়ির মইয়ের ওপর উঠে তারের পুলটা খুলে ফেলছিল।

বর্‌কা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওখান থেকে নাম্‌ বলছি। খবরদার হাত দিবি না!'

কিন্তু তার আর দড়ির ফাঁস ততক্ষণে মাটিতে নেমে এসেছে।

মই থেকে লাফিয়ে পড়ে গেঙকা ছুটে গেল বর্‌কার দিকে।

'বলি এত গরম দেখাচ্ছিস কিসের? ভেবেছিস বুঝি আমরা কিছু জানি না? সব জানি। তলাকুঠরি আর বাক্সের কথা! ভেগে পড়্‌!'

ছেলেমেয়েদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল বর্‌কা। তারপর তারটা তুলে গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল, একটাও কথা বলল না।

২৭

গোপন রহস্য

'এভাবে সব পণ্ড করার কী মানে হয় শুনি? ভেতরের কথা সব ফাঁস করে দিলি কার হুকুমে?' গেঙকাকে ধমক লাগাল মিশা।

গেঙকা আত্মপক্ষ সমর্থন করল, 'ওই ছোকরার ফোঁপর দালালি আমি সহ্য করব এই বলতে চাস তুই? আমি মুখ বুজে থাকি আর ও থিয়েটারটাকে পণ্ড করুক, এই বলছিস?'

বন্ধুরা সবাই স্লাভার ওখানে জুটেছে। চমৎকার একটা মস্ত ফ্ল্যাটে থাকে স্লাভা। মেজেতে কার্পেট পাতা, টেবিলের ওপর একটা বাহারে বাতিঢাকনা, সোফার ওপর রঙচঙে সব বালিশ।

পিয়ানোর সামনে ঘুরনো টুলটার ওপর বসে আছে গেঙকা। তাকিয়ে আছে স্বরলিপির বইগুলোর মলাটের দিকে। ও জানে যে ভুলটা ওরই। তাই মনের বেকুব ভাবটাকে ঢাকবার জন্য অনবরত বক্‌বক্‌ করে চলেছে অস্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে।

স্বরলিপির মলাটের লেখাটা পড়ে বলল, '"পাগানিনি"। পাগানিনিটা আবার কে?'

স্লাভা বুঝিয়ে বলল, 'পাগানিনি একজন নামজাদা বেহালা বাজিয়ে। একবার ওঁর শত্রুরা কনসার্টে বাজাবার আগে ওঁর বেহালার তার ছিঁড়ে রেখেছিল, কিন্তু

একটা মাত্র তারের ওপরই উনি এমন বাজিয়ে গেলেন যে কেউ তফাতই ধরতে পারল না।'

'সে আর এমন কি ব্যাপার! বাবার ইঞ্জিনে এক ফায়ারম্যান ছিল, পানফিলভ নাম, সে বোতল শিশি দিয়ে যে কোনো সুর বাজিয়ে দিতে পারত। তোর পাগানিনি বোতল দিয়ে বাজনা বাজাতে পারে?'

বিরক্ত হয়ে স্লাভা বলল, 'তোর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। গানবাজনার তুই কী জানিস!'

'আমি কি একটা কথাও বলতে পারব না?' পিয়ানোয় ধাক্কা দিয়ে গেঙ্কা ঘুরনো টুলটায় কয়েকবার পাক খেয়ে ঘুরে বসল।

মিশা গম্ভীরভাবে বলল, 'শোন্ গেঙ্কা। কথা বলার আগে একটু ভেবে বলবি। তা যদি করতিস তাহলে আর বরকার কাছে বাক্সগুলোর কথা ফাঁস করে দিতিস না।'

. স্লাভা ফোঁড়ন দিল, 'বিশেষ করে বাক্সগুলোর ভেতর যখন কিছুই নেই।'

গেঙ্কা আপত্তি তুলল, 'নিশ্চয় আছে কিছু। সুতো ভর্তি।'

'অত হলপ করে বলছিস কেন, ঠিক জানিস?' স্লাভা জিজ্ঞেস করল।

কপালের সামনের চুলগুলো ঝাঁকিয়ে গেঙ্কা বলল, 'আমার কোনো সন্দেহ নেই। ব্যস্ !'

মিশা বলল, 'যা জানিস না তাই নিয়ে বক্‌বক্ করিস বড়ো। বাক্সগুলোর মধ্যে রয়েছে একেবারে অন্য জিনিস।'

'কী?'

'হ্যাঁ, বলে দিলাম আর কি! আবার তো যার সঙ্গে দেখা হবে তার কাছেই ফাঁস করে দিবি।'

'আচ্ছা, এই দিব্যি করছি!' বুকের ওপর হাত রেখে গেঙ্কা বলল, 'আমার যেন এইখানেই মরণ হয়! আমার যেন...'

মিশা বাধা দিয়ে বলল, 'অমন দিব্যি তুই আজ থেকে আরম্ভ করে যমের

দুয়ারে যাবার দিন অবধি দিতে থাক্, তবু তোকে বলব না, কারণ কোনোকালেই তুই পেটে কথা রাখতে পারিসনি, আর পারবিও না।'

স্লাভা বলল, 'কিন্তু আমাকে তো বলতে পারিস, অ্যাঁ? আমি তো কিছু বলিনি।'

মিশা চটে গেল, 'কিছু বলে না তোদের। কোনো জরুরি ব্যাপারে তোদের বিশ্বাস করতে পারব না দেখছি।'

বন্ধুরা গুম্ হয়ে বসে রইল, এ ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে।

শেষকালে স্লাভা বলল, 'যাই হোক্, কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখাটা কিন্তু বড়ো ছোট কাজ। আমরা তিনজনই তো তলাকুঠরিতে গিয়েছিলাম, তাই একজনের কাছে আরেকজনের কিছু গোপন রাখা উচিত নয়।'

স্লাভাকে বোঝাবার চেষ্টা করল গেঙ্কা, 'কেমন করে জানব গোপন কিছু আছে? ভেবেছিলাম বাক্সগুলো নেহাতই সাধারণ বাক্স... মিশা তো আর সাবধান করেনি। কী যেন লুকোচ্ছে ও আর দোষ চাপাচ্ছে আমাদের ঘাড়ে।'

এবার মিশা ভাবনায় পড়ল। ও বোঝে যে পুরোদস্তুর নির্ভুল নয় ওর কথা। ওর আগেই সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল গেঙ্কাকে। তাছাড়া, ঠিক সত্যিকার বন্ধুর মতো ব্যবহার ও করেনি। ওর উচিত ছিল বন্ধুদের ওপর আস্থা রাখা। কিন্তু... তাহলে ছোরার ব্যাপারটা? সেটার কথাও কি ওর বলা উচিত ছিল? অবিশ্যি ওরা যে ফাঁস করে দিত না সেটুকু ও জানে। আর গেঙ্কাও যদি সব ঘটনাটা জানত তাহলে নিশ্চয় বলে ফেলত না। কিন্তু ছোরার কথাটা কি ও জানিয়ে দেবে? ... প্রথমে শুধু ফিলিন আর নিকিৎস্কির কথা বলা যাক, অন্য সময় না হয় ছোরার কথা হবে। তবে ছোরার কথাটা জানা থাকলে ওরা অবিশ্যি সাহায্য করতে পারত ... কারণ একা ওর পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না। একা একা লড়াই করা বড়ো কঠিন কাজ।

তবু গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে ও বিড়বিড় করে বলল, 'ঘাড়ের ওপর যখন মুণ্ড মগজ রয়েছে তখন তার সদ্ব্যবহার করাই উচিত। আহা বেচারি! ওকে তা আর আগে থাকতে "সাবধান" করা হয়নি!'

মিশার বলার ঢঙে একটা আপোসের আঁচ পেল গেঙ্কা।

ও সোৎসাহে বলল, 'কিন্তু আমার দিকটাও তুই ভেবে দেখতে চেষ্টা কর্ মিশা। কী করে জানব বল্? তুই যে আমাদের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখছিস সেটা আমাদের মাথায়ই যে একেবারে আসেনি। তোর কাছে আমি তো কিছু লুকোই না জানিস ...'

আহত স্বরে স্লাভা বলল, 'যাক্ গে, যদি আমাদের কাছ থেকে তোর লুকোবার কিছু থাকে তো আর বলার কী আছে!'

মিশা বলল, 'ঠিক আছে। বলব তোদের। কিন্তু মনে রাখিস সাংঘাতিক গোপনীয় ব্যাপারটা। যে আমাকে ভরসা করে বলে গেছে সে হে'জিপে'জি লোক নয়। আমাকে বলেছিল ...,' ছেলেদের মুখের উদ্গ্রীব কৌতূহল লক্ষ্য করে মিশা আস্তে আস্তে যোগ করে দিল কথাটা, 'বলেছিল পলেভোয়। সেই আমাকে গোপন খবরটা দিয়েছে!'

গেঙ্কার চোখের তারাটা বড়ো হয়ে গেল, মিশার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে ও। স্লাভাও মিশার দিকে খুব নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে ছিল — পলেভোয় আর নিকিৎস্কির কথা ও জেনেছে মিশা আর গেঙ্কার মুখে গল্প শুনতে শুনতে।

মিশা বলে চলল, 'ব্যাপারটা এই! এখন তোরা আগে আমাকে কথা দে যে কোনোদিন, কোনো রকমেই কাউকেই ঘুণাক্ষরে কিছু বলবি না।'

গেঙ্কা বুকে হাত ঠুকে গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি হলপ করছি।'

স্লাভা বলল, 'দিব্যি করে বলছি।'

মিশা উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেল। সাবধানে কপাট খুলে গলি বারান্দাটা উ'কি মেরে দেখল। তারপর জোরে এ'টে দিল দরজাটা। সতর্কভাবে ঘরের চারদিকটা দেখে সোফার নিচে তাকাল। শোবার ঘরের দরজাটা দেখিয়ে ফিস্ফিস করে বলল, 'ওঘরে কেউ আছে নাকি?'

স্লাভা ফিস্ফিসিয়ে জবাব দিল, 'না।'

ঘরের চারদিকে রহস্যভরা চোখে তাকিয়ে মিশা নিচু গলায় বলল, 'তাহলে শোন ব্যাপারটা। নিকিৎস্কির দলের মধ্যে তার ডান হাত যে লোকটি তার

নাম ...,' একটু থেমে বেশ অর্থপূর্ণভাবে মিশা খবরটা জানিয়ে দিল, 'তার নাম ফিলিন! এবার বুঝলে তো!'

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল বন্ধুরা।

পিয়ানোর টুলখানা শক্ত করে চেপে ধরে বসে রইল গেঙ্কা। ওর শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, মুখটা হাঁ, চোখগুলো ভাঁটার মতো বড়ো বড়ো। এমনকি ওর মাথার চুলগুলোও যেন অদ্ভুতভাবে খাড়া হয়ে উঠে চারদিকে ঠেলে বেরিয়েছে — খবর শুনে চুলগুলোও যেন থ'। স্লাভা এমনভাবে চোখ পিটপিট করছে, যেন কেউ ওর চোখে বালি ছুঁড়ে দিয়েছে।

ওদের মনের ওপর একটা ছাপ ফেলতে পেরেছে বুঝতে পারল মিশা। আরেকটু গভীর দাগ কাটবার জন্য ফের বলল:

'আর তাই আমার সন্দেহ হয়, যে ঢ্যাঙা লোকটাকে আমরা তলাকুঠরিতে দেখেছিলাম ... মনে আছে তো সেই ককেসীয় কোর্তা-পরা লোকটা?.. সে হচ্ছে নিকিৎস্কি!'

গেঙ্কা প্রায় টুল থেকে পড়ে আর কি। স্লাভা উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইল মিশার দিকে।

বলল, 'সত্যি বলছিস তো?.. ঠাট্টা নয়?' মুখ দিয়ে ওর কথাই বেরুতে চায় না যেন।

মিশা কাঁধ ঝাঁকাল, 'বেশ বললি! এসব ব্যাপার নিয়ে আমি তামাশা করতে পারি? এসব ঠাট্টা ইয়ার্কির কথা নয় বন্ধু। ওর গলার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছি। মুখটা দেখতে পাইনি সত্যি কথা, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস ও ছদ্মবেশ নিয়েছে ...'

অবশেষে গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় গেঙ্কার। বলল, 'একেবারে আক্কেল-গুড়ুম্‌ হয়ে গেল যে আমার!'

'আক্কেল-গুড়ুম্‌ তোর হওয়াই ভালো, বিশেষ করে তোর ওই জিভের জন্য।'

স্লাভা বলল, 'এ অবস্থায় এখুনি আমাদের মিলিশিয়াকে খবর দেওয়া উচিত।'

রহস্যভরা চোখে তাকিয়ে মিশা জবাব দিল, 'আমরা তা করতেই পারি না।'

'কেন নয়?'

'পারি না।' ফের বলল মিশা।

'কিন্তু কেন?'

'এক নম্বর কথা হল সবকিছু সম্বন্ধে আগে পরিষ্কার করে জেনে নিতে হবে।' কথা এড়িয়ে যাবার মতো করে জবাব দিল মিশা।

স্লাভা ঘাড় নাড়ল, 'অতো পরিষ্কার করে জেনে নেবার কী আছে তা তো বুঝি না। যদি নিকিৎস্কি ঠিক নাও হয়, ফিলিন তো ওই লোকটাই সত্যি ...'

অবস্থাটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে। স্লাভার মনে হাজার রকম খটকা। এই হয়তো ও তর্ক করে বোঝাতে শুরু করবে, অথচ ওদিকে মিশা এখনো পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না এই লোকটাই সেই ফিলিন না অন্য কোনো ফিলিন।

দাঁড়িয়ে উঠে মিশা জোর করে বলল:

'তোদের তো পুরো ঘটনাটা বলাই হয়নি এখনো। চল্, আমাদের বাড়িতে।'

বন্ধুরা এবার মিশার ওখানে চলল। আঙিনাটা পেরুবার সময় গেঙ্কা একবার সন্দিগ্ধ চোখে চারধারটা দেখে নিল। এর মধ্যেই ওর কল্পনা ভয়ানকরকম সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ও কেবলই ভাবছে, এই বুঝি যে কোনো মুহূর্তে নিকিৎস্কি এসে হাজির হয় ...

২৮

সাঙ্কেতিক লিপি

মিশার বাড়িতে এসেই ওরা নীরবে টেবিলটাকে ঘিরে বসে পড়ল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু আলো জ্বালায়নি মিশা।

দম বন্ধ করে ওকে লক্ষ্য করতে থাকে গেঙ্কা আর স্লাভা। যতোটা নিঃশব্দে

পারা যায় দরজার আঁকড়া তুলে দিল, তারপর জানলার পর্দা টেনে দিল মিশা — ঘরটা এবার প্রায় পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে যায়। এইভাবে সবদিক থেকে সাবধান হয়ে বইয়ের তাক থেকে ওর সেই পুঁটলিটা টেনে বের করে টেবিলের ওপর রাখল মিশা।

রহস্যময় চাপা গলায় বলল, 'এই দ্যাখ্!' পুঁটলিটা ও খুলে ধরেছে।

গেঙ্কা আর স্লাভা টেবিলে হুমড়ি খেয়ে প্রায় শুয়েই পড়ে। মিশার হাতে সেই ছোরা।

ফিস্‌ফিস্‌ করে গেঙ্কা বলল, 'এ যে দেখছি ছোরা!'

মিশা কিন্তু আঙুল উঁচিয়ে সাবধান করে দিল। বলল, 'আস্তে! এই দ্যাখ্।' ছোরার ফলার গায়ে খোদাই করা চিহ্নগুলো দেখাল ও, 'এই দ্যাখ্, নেকড়ে, কাঁকড়াবিছা, আর পদ্ম। দেখেছিস? এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ...'

নাটকীয় ভঙ্গিতে ও ছোরার বাঁটের প্যাঁচ খুলল। ভেতর থেকে জড়ানো একটা পাতলা ধাতুর পাত বের করে টেবিলের ওপর সমান করে মেলে ধরল।

মিশার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল স্লাভা, 'সাঙ্কেতিক লেখা?'

'হ্যাঁ।' সায় দিয়ে মিশা বলল, 'এটা সাঙ্কেতিক লেখা, আর এ লেখার অর্থ বোঝার সূত্রটা আছে ছোরার খাপের মধ্যে, বুঝেছিস? আর নিকিৎস্কির কাছে আছে সেই খাপ... এই হল ব্যাপারটা... এবার শোন্...'

চোখ ঘুরিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে, প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না এমনি গলায় মিশা ওর বন্ধুদের কাছে 'সম্রাজ্ঞী মারিয়া' জাহাজের কথা, জাহাজ ধ্বংস হবার কথা আর ভ্লাদিমির নামে সেই অফিসারকে খুন করার কথা খুলে বলল...

ছেলেরা পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছে। অদ্ভুত কাহিনীটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। ঘরটা এতক্ষণে পুরোদস্তুর অন্ধকার। ফ্ল্যাটে যেন জনপ্রাণী নেই মনে হয় এত নীরব নিস্তব্ধ। শুধু জলের কল থেকে একটা চাপা গল্‌গল্‌

আওয়াজ আর সিঁড়ির নিচে একটা ঘরছাড়া বেড়ালের করুণ কান্না শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতর বসে ছেলেরা যেন কল্পনায় দেখতে পায় আশ্চর্য সব জাহাজ আর দূর দূরান্তের অজানা দেশ। অতল সমুদ্র গভীরের ঠান্ডা আর জলদানবদের ছোঁয়া যেন ওদের গায়ে লাগে ...

মিশা উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাল। ঢাকনার নিচে ছোট বাতিটা জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে। ছেলেদের উত্তেজিত মুখগুলোকে উজ্জ্বল করে তোলে, টেবিলের ওপরের সাদা কাপড় আর হলদে-হয়ে-যাওয়া ছোরার বাঁটটাকে ঘিরে ব্রোঞ্জের সাপ জড়ানো চক্‌চকে ছোরার ইস্পাত ফলা আরো ঝক্‌ঝকে দেখায়।

স্লাভাই প্রথম নীরবতা ভেঙে বলে উঠল, 'সাঙ্কেতিক লেখাটা যে কিসের কে জানে?'

মিশা কাঁধ ঝাঁকাল, 'তা বলা কঠিন। পলেভোয়েরও কোনো ধারণা ছিল না। নিকিৎস্কি নিজেই জানে কিনা সন্দেহ। সে ছোরাটা খুঁজছে এই লেখাটুকু পড়বার জন্য, বুঝতে পেরেছিস। তার মানে তার কাছেও এটা একটা রহস্য। তা না হলে এটা পাবার জন্য অত ব্যগ্র কেন সে?'

গেঙ্কা এবার বলল, 'কেন, সে তো সহজেই বোঝা যায়। নিকিৎস্কি গুপ্তধনের খোঁজ করছে, পরিষ্কার কথা। সেইজন্য এটাও খুঁজছে সে। আর এই ছোরাটার মধ্যে লেখা আছে সেই গুপ্তধন কোথায়। আমি বলছি, নিশ্চয় অঢেল টাকা রয়েছে, দেখে নিস!'

মিশা বলল, 'গুপ্তধন তো গল্পের বইয়েই থাকে। ওসব লেখা হয় বিশেষ করে যারা কুঁড়ে, কোনো কাজকম্ম নেই ,খালি বসে বসে গুপ্তধন আর লাখটাকার স্বপ্ন দেখে তাদের জন্য।'

স্লাভা ফোঁড়ন দিল, 'বোঝাই যাচ্ছে কোনো গুপ্তধন-টন এতে নেই। নিকিৎস্কি এই ছোরাটার জন্য একটা মানুষকে খুন করেছে। আচ্ছা তুই-ই বল্ গেঙ্কা, টাকার জন্য কোনো মানুষকে খুন করতে পারিস?'

গেঙ্কা টেনে টেনে বলল, 'এ্যা-ই! বেশ চমৎকার তুলনাটা দিয়েছিস তুই!

নিকিৎস্কি তো আর আমি নয়, আর আমিও নিকিৎস্কি নই। আমি কাউকে খুন করব না, সে তো জানা কথাই। কিন্তু নিকিৎস্কির কাছে খুন তো সামান্য ব্যাপার। হাজার হলেও নিকিৎস্কি একটা বুর্জোয়া।'

স্লাভা বলল, 'হয়তো এর মধ্যে কিছু সামরিক রহস্য গোপন আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তো ঘটেছিল মহাযুদ্ধের সময় এক যুদ্ধজাহাজে ...'

মিশা বাধা দিয়ে বলল, 'আমিও সেই কথাটাই ভেবেছি। কিন্তু ধর্ যদি নিকিৎস্কি জার্মান গোয়েন্দা হয়, তাহলে উনিশ শো একুশ সালে কেন ছোরার খোঁজ করেছিল সে? তখন তো কবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

স্লাভা বলেই চলল, 'সূত্র না জানা থাকলেও সমস্ত সাঙ্কেতিক লিপির অর্থ উদ্ধার করা যায়। এডগার আলান পো বলেছেন ...'

'জানি, জানি!' মিশা ওকে বাধা দিয়ে বলল, ' "সোনার ছারপোকা"। ও বই আমাদের পড়া আছে। কিন্তু এ অন্য ব্যাপার। এই দ্যাখ্।' সবাই ধাতুর পাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে। 'দেখতে পাচ্ছিস? মাত্র তিন রকমের চিহ্ন আছে এখানে: ফুট্‌কি, ড্যাশ্ আর গোল দাগ। একটা চিহ্নে যদি একটামাত্র অক্ষর বোঝায় তাহলে তিনটে মাত্র অক্ষর আছে বুঝতে হবে। বুঝলি তো? আসলে চিহ্নগুলো রকমারি কায়দায় ভাগে ভাগে সাজানো রয়েছে।'

'হয়তো একেক ধরনের সাজানোয় একেকরকম হরফ বোঝায়?' স্লাভা ভেবেচিন্তে বলল।

মিশা জবাব দিল, 'সে কথাও ভেবেছি আমি। কিন্তু পাঁচটা করে চিহ্ন নিয়েই মোটামুটি ভাগগুলো সাজানো। গুনে দ্যাখ্! ঠিক সত্তরটা ভাগে সাজানো রয়েছে, তার মধ্যে চল্লিশটাতে আছে পাঁচটা পাঁচটা করে চিহ্ন। সত্তরের মধ্যে একই অক্ষর নিশ্চয় চল্লিশবার আসবে না?'

গেঙ্কা বলল, 'লেখাটার মাথামুণ্ড খুঁজে লাভ কী? আসল কাজ হল খাপটা উদ্ধার করা। বিশেষ করে নিকিৎস্কি যখন এখানেই আছে।'

স্লাভা আপত্তি তুলল, 'ভালো করে এখনো জানাই গেল না লোকটা নিকিৎস্কি কিনা। এ তোর নেহাতই আন্দাজ, তাই না রে মিশা?'

গেঙ্কার জেদ চাপে, ‘লোকটা নির্ঘাৎ নিকিৎস্কি। ফিলিন আর নিকিৎস্কি হল একই দলের লোক। ঠিক বলিনি রে মিশা, বল্?’

মিশা একটু বেকুব বনে যায়। মাথাটা সজোরে হেলিয়ে বলল:

‘তোদের যখন সব কথাই বলে দিয়েছি, তখন খোলাখুলি জানানোই উচিত আমার। আসল কথা হল আমি এখনো জানি না এ লোকটাই সত্যিকারের ফিলিন কিনা।’

ছেলেরা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘জানিস না মানে?’

‘মানে ঠিক যা বললাম। পলেভোয় তো আমাকে শুধু নামটাই বলেছিল। আমাদের জানা দরকার এই ফিলিনই সেই লোক কিনা। ফিলিন তো আছে হাজারটা। কিন্তু তবুও আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই সেই লোক।’

স্লাভা আস্তে আস্তে বলল, ‘ব্যাপারটা হল ঠিক দুটো অজ্ঞাত রাশি নিয়ে সমীকরণের অঙ্ক কষার মতো।’

‘এই দ্যাখ্, আবার অঙ্ক টেনে এনেছে এর মধ্যে!’ গেঙ্কা গরম হয়ে উঠল, ‘ফিলিনই আমাদের সেই লোক। কোনো সন্দেহ নেই। ও মুখ দেখলেই বোঝা যায় লোকটা বদমায়েশ।’

‘মুখ দেখলেই! কিন্তু সেটা তো কোনো প্রমাণ হল না।’ স্লাভা তর্ক জুড়ে দিল।

মিশা বলল, ‘ব্যস্ ঠিক আছে। মেনে নিলাম যে কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু এবার একটু ভালো করে ভেবে দেখা যাক্। সবুর এক মিনিট। প্রথম কথা হল, লোকটার নাম ফিলিন — সেটা মিলে যাচ্ছে। তারপর, লোকটা কি সন্দেহজনক চরিত্রের? হ্যাঁ, তাও বটে। সন্দেহ নেই তাতে। ফাটকাবাজ, আরো অনেক কিছু ... বেশ। দ্বিতীয় কথা হল: আড়ালে কোনো নোংরা কাজ ওরা করছে কিনা? খুব সম্ভব করছে। তলাকুঠরিতে বাক্সভর্তি একটা ঘর রয়েছে ওদের। তার ওপর দরজায় ওরা তক্তা এ'টে দিয়েছে, রাস্তা বন্ধ করেছে। তিন নম্বর: ঢ্যাঙা লোকটা কি সন্দেহজনক ধরনের? হ্যাঁ, তাও ঠিক। কেমন করে রাস্তার এদিকে ওদিকে তাকায় আর মুখ ঢেকে চলে সেটা লক্ষ্য করেছিস? তারপর তার গলার স্বর।

আমি স্বর চিনি। যদি ধরেও নিই যে ও নিকিৎস্কি নয়, তবু খারাপ লোকের একটা দল যে এখানে কাজ করছে সেটা তো সত্যি। হয়তো ওরা শ্বেতরক্ষী। কিংবা গোয়েন্দা। আমরা কি তাহলে হাত গুটিয়ে বসেই থাকব, অ্যাঁ? সেটা কি উচিত হবে? না। আমাদের কর্তব্য হল এই দলটার মুখোশ খুলে দেওয়া।'

গেঙ্কা ওর কথাটা মেনে নিল, 'ঠিক! এ দলটাকে আমাদের ধরতেই হবে। খাপটা কেড়ে নিয়ে গুপ্তধন সমান তিনভাগে ভাগ করে নেব।'

'তোর গুপ্তধন রাখ তো একটু! বাগড়া দিস না!' মিশা রেগে গিয়ে বলল। 'ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই রকম। আমরা অবিশ্যি মিলিশিয়াকে খবর দিতে পারি। কিন্তু এসবই যদি নেহাৎ ঝুটো হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে? হঠাৎ যদি তাই হয় তখন কী হবে? আমরা একেবারে বোকা বনে যাব। না! প্রথমে আমাদের সব খুঁজে পেতে বের করতে হবে। দেখতে হবে এই লোকটাই সত্যিকারের ফিলিন কিনা, তলাকুঠরিতে ওরা কী লুকিয়ে রাখে? তার চেয়েও বড়ো কাজ হবে সাদা ককেসীয় কোর্তা-পরা ওই ঢ্যাঙা লোকটার চলাফেরা লক্ষ্য করা, ওর আসল পরিচয় খুঁজে বের করা।'

স্লাভা বলল, 'ব্যাপারটা অতো সোজা হবে না।' কিন্তু গেঙ্কার বিদ্রুপভরা দৃষ্টি দেখেই তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'দলটার আসল চেহারা আমাদের খুলে দিতেই হবে, নিশ্চয়। কিন্তু খুব সাবধানে আমাদের মতলব ভাঁজতে হবে।'

মিশা কথাটা মেনে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস। সবই আগে ছক বেঁধে তৈরি রাখতে হবে। তা না করলেই নয়। আমাদের একেকজন পালা করে নজর রাখবে যাতে ফিলিন বা বরকা কোনোরকম সন্দেহ না করে। তারপর যখন গোটা দলটার গতিবিধির হদিস পাব, সবকিছু পরিষ্কার জানতে পারব, তখন খবর দেব "চেকা"কে*।'

* সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম যুগে রাষ্ট্রের শত্রুদের সঙ্গে, বিপ্লববিরোধী, গোয়েন্দা, আর ফাটকাবাজদের সঙ্গে লড়বার জন্য যে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল তার নাম 'চেকা'।

গেঙ্কা ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'দারুণ কাজ হবে কিন্তু একটা! গোটা দলটাকে পাকড়াও করব আমরা।'

মিশা বলল, 'আলবৎ। এইভাবেই তো বদমায়েশদের দলগুলোকে ধরে। তখন আমাদের যথার্থ পরিচয়টা সকলে জানবে, এতো আর মিথ্যে তড়পানো নয় — কাজের মতো কাজ।'

তৃতীয় পর্ব

নতুন বন্ধুদল

২৯

এলেন বুশ্

কয়েকদিন বাদে মিশা আর শুরা স্মলেন্স্কি বাজারে গেল সাজের রঙ কিনতে। ফিলিনের গুদামঘরের পাশে দিয়ে যাবার সময় দেখে গেঙ্কা গেটের সামনে পায়চারি করছে।

শুরা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন রে? আয় না আমাদের সঙ্গে। রঙ কিনে আনি।'

গেঙ্কা খুব মাতব্বরি চালে বলল, 'ব্যস্ত আছি এখন।' মিশার দিকে অর্থভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল।

মিশা আর শুরা বাজারে এসে ঢুকল। বাজারে দোকানের সারিগুলোর মধ্যে মানুষের ভিড়। বাউন্ডুলে ছোকরারা ভিড়ের ভেতরে ছুটোছুটি করছে। ক্যাঁ ক্যাঁ করে গ্রামোফোন বাজছে, দুয়েকজন খদ্দের ঘড়ির দর কষাকষি করছে। ছন্নছাড়ার মতো পোশাক পরা, সাবেকী টুপি মাথায় দিয়ে বুড়িরা ভাঙা তালা আর পেতলের মোমদানি বিক্রি করছে। গাঁয়ের একটা ছেলে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সারা সকাল একটা হারমোনিয়মের দর কষাকষি করে। সঙ্গীত পিপাসুর দল ওকে ঘিরে রয়েছে আর ও সেই একই করুণ গৎ ক্রমাগত বাজিয়ে চলেছে। কাছেই একটা টিয়েপাখি ঠোঁট দিয়ে খাম তুলছে, খামের মধ্যের কাগজে ভূত-ভবিষ্যতের কথা বিশদভাবে লেখা। বড়ো বড়ো ঘাগরা আর বাহারে ওড়না পরা জিপ্‌সী স্ত্রীলোকরা যাতায়াত করছে। মিশা আর শুরার মনে হয় বাজারের যেন আর শেষ নেই। সূর্যমুখীর বিচির খোসা ছড়ানো রাস্তার পাশে পাশে বাজারটা চলেছে তো চলেছেই। রাস্তাটা গেছে নভিন্‌স্কি বুলভার অবধি। পৌর প্রতিষ্ঠানের মজুররা সেখানে এই প্রথম জঞ্জাল-ফেলা বাক্স বসিয়ে চক্‌চকে তার দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে আধমরা ঘাসগুলোকে।

এক বুড়ো 'থিয়েটারের যাবতীয় জিনিস' বিক্রি করছিল। ওরা দু'জন দেখতে লাগল তার মালগুলো। এমন সময় হঠাৎ কে যেন মিশার কাঁধে হাত রাখল। ও পিছন ফিরে দেখে সেই খেলোয়াড় মেয়েটা। পরনে একটা সাধারণ পোশাক। এখন আর মোটেই অভিনেত্রীর মতো দেখাচ্ছে না।

হাতটা বাড়িয়ে সে বলল, 'এই যে, দাঙ্গাবাজ!'

মিশার ভালো লাগল না ওর কথা বলার ধরনটা।

কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে সে জবাব দিল, 'এই যে।'

'এত গোমড়া দেখাচ্ছে কেন মুখখানা?'

'কই না তো। আমি সবসময়ই ওরকম।'

'কী নাম তোমার?'

'মিশা।'

'আমার নাম এলেন।'

'ওটা আবার একটা নাম হল নাকি?'

'ওটা আমার থিয়েটারি নাম। এলেন বুশ্। সব অভিনেত্রীদেরই অমন একেকটা নাম থাকে। আমার আসল নাম ইয়েলেনা ফ্রলোভা।'

'তোমার সঙ্গে যে খেলা দেখাচ্ছিল সে কে?'

'আমার ভাই। ইগর্।'

'আর ওই দাড়ি কামানো লোকটি?'

'কোন্ দাড়ি কামানো লোক?'

'তুমি খেলা দেখাবার সময় যে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই তোমাদের দলের মালিক নাকি?'

'মালিক?' হাসল ইয়েলেনা, 'না, না। উনি আমার বাবা।'

'তাহলে বুশ্ বলে ডাকছিলে কেন ওঁকে?'

'সে তো বললামই: বুশ্ হল আমাদের থিয়েটারি নাম।'

'এখনো কি বাড়ি বাড়ি খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছ?'

'না। বাবা একটা কাজ নিয়েছেন। মরসুম শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসে আমরা খেলা দেখাব। গেছ ওখানে কখনো?'

'নিশ্চয়। কিন্তু এখন তো আমরা নিজেরাই আমাদের বাড়িতে একটা নাট্যচক্র খুলেছি। এ হল আমাদের স্টেজ ম্যানেজার।' শুরাকে দেখিয়ে দিল সে।

শুরা সামনে এগিয়ে এসে বেশ একটা মুরুব্বী চালে মাথা নোয়াল।

মিশা আবার বলল, 'রোববারে আমাদের প্রথম অভিনয় হচ্ছে। নাটকটাও

বেশ ভালো। তোমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসো। অভিনয়ের পর তোমরাও খেলা দেখাবে।'

ইয়েলেনা বলল, 'আচ্ছা, বলব বুশ্‌কে।' তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কতো দেবে তোমরা?'

'কী দেব?' বুঝতে পারেনি মিশা।

'টাকা কতো দেবে? খেলা দেখাবার জন্য?'

মিশা চটে গিয়ে বলল, 'টাকা?' পাগল হয়েছ? ভোল্‌গা অঞ্চলের ভুখা ছেলেমেয়েদের সাহায্যের জন্য আমরা অভিনয় করছি। আমাদের সমস্ত অভিনেতাই বিনিপয়সায় থিয়েটারে নামছে।'

ইয়েলেনা একটু অনিশ্চিতভাবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু... আমি তো জানি না... বুশ রাজি হবে কিনা।'

'তাহলে তোমাদের আসার দরকার নেই। তোমাদের বাদ দিয়েই আমাদের চলবে। যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের জন্য অন্যরা যতটা পারে দিচ্ছে, আর তোমরা এদিকে তার ওপর ভাগ বসতে চাও। লজ্জা করে না বলতে?'

ইয়েলেনা হাসল, 'অতো রাগ করো না। কী কড়া মেজাজ বাবা! আচ্ছা, আমাদের মতলবটা বলছি। ইগর্ আর আমি বেড়াতে বেরুবার হুকুম নিয়ে তোমাদের অভিনয়ে চলে আসব। কেমন হল তো?'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে, এবার চলি?' মিশা আর শুরার হাতে হাত মিলিয়ে ইয়েলেনা বলল, 'তবে দোহাই অতো মেজাজ দেখিও না।'

'আমার মেজাজ খারাপ নয়।' জবাব দিল মিশা।

ইয়েলেনা চলে যাবার পর মিশা শুরাকে বলল, 'মেয়েগুলো বড়ো জ্বালায়, নারে!'

কেনা কাটা

আবার রঙের দিকে নজর দিল ওরা দু'জন।

রঙ পেন্সিলের একটা বাক্স নাড়াচাড়া করে শুরা বলল, 'এগুলো সবচেয়ে ভালো হবে। এই রঙটার নাম "বেগুনি-লাল"। নিয়ে নে রে মিশা।'

মিশা পকেটে হাত পুরে পয়সা বের করতে গিয়েই একেবারে ঘাবড়ে যায়— ব্যাগটা তো নেই। মুহূর্তের জন্য মাথা ঘুরে যায় ওর। ভিড়ের ভেতরে একটা বাউন্ডুলে ছেলেকে ঢুকতে আর বেরুতে দেখেই ওর সম্বিত আসে। সঙ্গে সঙ্গে মরীয়া হয়ে চিৎকার করে ছেলেটার দিকে প্রাণপণে ধাওয়া করে ও।

দোকানের সারিগুলো থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে ছোকরাটা। একটা গলির ভেতর ঢুকেই ছুটতে থাকে। গায়ের লম্বা ছেঁড়া কোটখানার জন্য দৌড়ুতে অসুবিধে হয় ছেলেটার। কোটের ফুটো দিয়ে নোংরা তুলোর আস্তর বেরিয়ে এসেছে, কোটের হাতাদুটো মাটির ওপর ছেঁচড়াচ্ছে। পাশেই একটা উঠোনের ভেতর ছুটে যায় ও। কিন্তু মিশা সমানে লেগে থাকে ওর পেছনে। অবশেষে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে ধরে ফেলে ছেলেটাকে।

জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটার ছেঁড়া কোট চেপে ধরে ও বলল, 'ফিরিয়ে দে ওটা!'

'আমাকে ছুঁস্‌নি, আমি পাগল!' চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। সাদা

চোখদুটো ঘোরায়, কালো ঝুলকালি-মাখা মুখখানা তাতে আরো ভয়ঙ্কর দেখায়।

দু'জনে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। ছোকরাটা সরু গলায় চিৎকার করে দাঁত বসাবার চেষ্টা করে, কিন্তু মিশা ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাটির ওপর ওকে চেপে ধরে ধুকড়ি কোটের মধ্যে ব্যাগটা খোঁজে। ছোকরা ছটফট করে, মিশার হাত কামড়ে ধরে। মিশা ওর কোটের হাতা ধরে টানে। সঙ্গে সঙ্গে হাতাটা ছিঁড়ে গিয়ে ব্যাগখানা বেরিয়ে পড়ে। ব্যাগটা তুলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর রাগে রী রী করে মিশার শরীর। নাট্যচক্রটা গড়ে তোলার জন্য এত পরিশ্রম ও করল, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, চেয়ে চিন্তে, সাধ্যসাধনা করে, গোগলের বইখানা পর্যন্ত বিসর্জন এতকিছু করল, আর এই ছিঁচকে চোরটা আর একটু হলে সব মাটি করে দিত। সাথীরা হয়তো ভাবত পয়সাটা হজম করে দিয়েছে ও-ই। ছোকরাকে আচ্ছামতো ধোলাই দেবে ঠিক করল মিশা।

মাটিতে উবুড় হয়ে পড়েছিল ছেলেটা। কোটের চওড়া কলারের ভেতর ওর নোংরা ঘাড়টা যেন আরও বেশি করে রোগা দেখাচ্ছে, আর ছেঁড়া হাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা নোংরা আঁচড়ভরা খালি হাতটাও যেন বড়ো বদখত্।

ঠিক আছে। ঘায়েল লোককে ফের মারবে এমন লোক মিশা নয়। তবু ছেলেটাকে পা দিয়ে একটু খোঁচাল মিশা।

'শিক্ষা হয়েছে তো, আর জীবনে চুরি করবি না!'

ছোকরা কিন্তু উঠল না।

কয়েক পা এগিয়ে গেল মিশা, তারপর আবার ফিরে এল।

গম্ভীরভাবে বলল, 'এই, ওঠ্। আর ভান করতে হবে না!'

ছেলেটা উঠে বসল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাতের মুঠো দিয়ে মুখখানা মুছে বলল, 'সন্তুষ্ট হয়েছিস তো?'

'কেন আমার ব্যাগ চুরি করলি? আমি তোর কিছু করেছিলাম?'

'মর্ গে যা!'

'গালাগাল যদি না থামাস, ফের কয়েক ঘা বসিয়ে দেব কিন্তু, হ্যাঁ!'

কিন্তু মিশার মনে আর রাগ নেই। ও জানে ছেলেটাকে এখন আর ও মারতে পারবে না।

আগের মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতেই ছেলেটা কোটের ছেঁড়া আস্তিনটা তুলে নিল। কোটটা খুলে গেছে, দেখা যাচ্ছে উলঙ্গ শীর্ণ একটা দেহ। কোটের নিচে একটা শার্টও নেই।

গুটিসুটি করে বসে আস্তিনটা ভালো করে দেখে মিশা বলল, 'কেমন করে সেলাই করবি এখন?'

একটুও কথা না বলে বিষণ্ণভাবে আস্তিনখানা ঘুরিয়ে দেখল ছেলেটা।

'আমার কথা শোন্।' বলল মিশা, 'আমার বাড়িতে আয়, মা সেলাই করে দেবে।'

ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল ছেলেটা:

'ধরিয়ে দেবার মৎলব, না?'

'আমি কথা দিচ্ছি। নাম কী?'

'মিখাইল।'

'বাঃ বেশ তো!' হাসল মিশা, 'আমার নামও মিখাইল। আমাদের ক্লাবে আয় না।'

'হ্যাঁ, ওই জন্যই তো সারা জীবন অপেক্ষা করে রয়েছি কিনা!'

'ওসব ছাড় দিকি। ওখানকার মেয়েরা তোর আস্তিন এক সেকেণ্ডে সেলাই করে দেবে।'

'হ্যাঁ, ওই জন্যই তো অপেক্ষা করে রয়েছি!'

'আচ্ছা ক্লাবে যেতে না চাস আমার বাড়িতে আয়। আমাদের সঙ্গে খাবি।'

'হ্যাঁ, ওই জন্যই সারা জীবন পথ চেয়ে বসে আছি!'

'তুই তো আচ্ছা একগুঁয়ে!' চটে গিয়ে বলল মিশা। 'আয়, আয়!' উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার ভালো আস্তিনখানা ধরে টানে ও। 'এই, উঠে পড়্।'

ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাদ্দিকি!' কিন্তু ততোক্ষণে বড় দেরি হয়ে গেছে। পট্ করে সেলাই কেটে গিয়ে দ্বিতীয় আস্তিনটাও ঝুলতে থাকে মিশার হাতে।

মিশা বোকা বনে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এই দ্যাখ্! বললাম না আসতে?'

'তুই-ই তো আমায় জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিলি, অ্যাঁ?..'

এবারে ছেলেটার কোটের হাতা নেই। খালি হাতদুটো দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে।

আস্তিনদুটো নিয়ে মিশা কড়া গলায় বলল, 'এবার তোকে আসতেই হবে। যদি না আসিস এ দুটো পাবি না, আস্তিন ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে হবে।'

৩১

মিখাইল করোভিন

ছেলেটার পাশাপাশি চলতে চলতে মিশা ভাবে, 'মা কি বলবে কে জানে? খুব সম্ভব দু'জনকেই ঝেঁটিয়ে বের করে দেবে। যাক গে, এখন আর উপায় নেই, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।'

গেঙ্কার ঘাঁটির সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। মিশা আর তার ছন্নছাড়া সঙ্গীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ও। আঙিনার ছেলেরাও হাঁ করে চেয়ে থাকে। মিশা লটারির টাকা গুনে স্লাভার হাতে তুলে দিল।

বলল, 'এই নে! শুরা এলেই ওকে দিবি আর বলবি রঙটঙ সব কিনে নিতে। আমার সময় নেই।'

নিজের বাড়ির সিঁড়ির কাছে গিয়ে মিশা ছোকরাটাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দৃঢ়ভাবে বলল:

'মা, এই ছেলেটা আমাদের সঙ্গে এবেলা খাবে...'

মা কিচ্ছু বলল না।

'হঠাৎ ওর আস্তিনজোড়া ছিঁড়ে ফেলেছি। ওর নাম মিখাইল।'

'পদবী কী?'

ছেলেটার দিকে তাকাল মিশা। সে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে।

গম্ভীর চালে বলল, 'আমার পদবী করোভিন।'

মা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বেশ, বেশ, কমরেড করোভিন। দয়া করে এবার গিয়ে হাত মুখটা ধুয়ে ফেলুন তো অন্তত।'

মিশা ওকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল, কিন্তু করোভিন হাত মুখ ধোবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখাল না। আর সেটা দেখালেও গায়ের ময়লা সাফ করা তো চাট্টিখানি কথা নয় মোটেই। মিনিট খানেক কলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওরা ঘরে ফিরে এসে টেবিলের ধারে বসল।

করোভিন গম্ভীরভাবে খাচ্ছে। একেক চাম্‌চে গিলেই চামচটা নামিয়ে রাখছে। টেবিলের কাপড়ের ওপর যেখানে ওর কনুই দুটো রয়েছে সেখানে গোল গোল কালো দুটো দাগ পড়ে গেল।

নীরবে খেল মিশা। মাঝে মাঝে মার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে। করোভিনের কোটটা মা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রেখে আস্তিনজোড়া সেলাই করছে। মার কুঁচকে ওঠা মুখখানা দেখে মিশা বোঝে করোভিনের বিদায় নেবার পরেই একটা অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত হবে। মাথা নিচু করে সে নীরবে খেয়েই চলে।

ঝোলটুকু শেষ করার পর মা এক পাত্র ভাজা আলু এনে দিল পাতে।

মিশা প্লেটখানা ঠেলে সরিয়ে দিল।

বলল, 'থাক্ মা। পেট ভরে গেছে।'

'খা না, খা। অনেক রয়েছে, আমাদের সকলের যথেষ্ট হবে।'

আস্তিনদুটো সেলাই হয়ে যাবার পরে এবার ছেঁড়া আস্তরটা সেলাই করতে লেগে গেল মা।

করোভিন খাওয়া শেষ করে চামচটা টেবিলের ওপর রাখল।

হাতের ওপর কোটটা সমান করে মেলে করোভিনকে দিল মা। বলল, 'এই নাও। তোমার কোট ঠিক হয়ে গেছে। এইরকম দিনে এমন কোট গরম লাগে না পরতে ?'

করোভিন তখন তখনি কোনো জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে দিল।

তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কিস্‌সু না। এসব আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই ?'

করোভিন নিরুত্তর।

'মা, বাবা, কেউ না ?'

করোভিন ততোক্ষণে দরজার কাছে এগিয়ে গেছে। জবাব দেবার বদলে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস টানছে।

মিশা ভাবল, 'যাচ্ছে কোথায় ছোকরা ? আবার রাস্তায় ?'

মায়ের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করল মিশা। বলল, 'এখন কোথায় যাবি তুই ?'

এ প্রশ্নে ছেলেটা যেন অবাক হয়ে গেল। কোটটা আরো টেনে গায়ের ওপর চাপিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা আসি।'

মিশা পেছন পেছন গেল।

'একটু দাঁড়া। এখানে আবার অন্ধকার।' সামনের দরজাটা খুলে করোভিনকে যাবার রাস্তা করে দিল মিশা। ও চলে যাবার সময় বলল, 'যখনি ইচ্ছে হবে চলে আসিস। আমাকে সব সময়ই হয় বাড়িতে, নয় উঠোনে পাবি।'

একটি কথাও না বলে ছেলেটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

৩২

মায়ের সঙ্গে কথা

মিশা যখন ফিরে এল মা তখন সেলাই কলের সামনে ঝুঁকে বসে ছুঁচে সুতো পরাতে ব্যস্ত। সেলাই কলটা জানলার কাছে। ধাতুর তৈরি অংশগুলোর ওপর রোদ পড়ে ঝক্‌মক্‌ করছে।

একটা বই নিয়ে পাতা খুলল মিশা। ঘরের ভেতরটা বেশ চুপচাপ। শুধু যতোবার মা সেলাই কলের চাকাটা ঘোরাচ্ছে ততোবার একটা গুঞ্জন। মিশা জানত কপালে আজ বকুনি আছে। এড়াবার কোনো উপায় নেই কারণ মা এক সময় মুখ খুলবেই। কিন্তু একটু চট্‌পট্‌ সেটা শেষ করে দিলে হয় না?

অবশেষে মুখ না ফিরিয়েই মা বলল, 'ওর সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?'

'বাজারে। আমার টাকা চুরি করেছিল।'

কলটা থামিয়ে মা মিশার দিকে তাকাল।

'কোন্‌ টাকা?'

'লটারির। তোমাকে তো আগেই বলেছি। শুরা আর আমি রঙ কিনতে গিয়েছিলাম।'

'ও, তা টাকাটা ফিরিয়ে দিয়েছে?'

মিশা হাসল।

'হ্যাঁ দিয়েছে। আমি ধরে ফেলেছিলাম। তাই অমনি একটু হাতাহাতিও হল...'

'এইভাবেই বুঝি তোদের পরিচয় হল?'

মা মাথা নেড়ে আবার কলটার দিকে ফিরল।

'মজা মন্দ নয় দেখছি: রাস্তায় বাউণ্ডুলে ছোকরাদের সঙ্গে লড়াই।'

'কেউ আমাদের দেখেনি মা। একটা ফাঁকা জায়গায় হাতাহাতি হল। তা ছাড়া আমরা তো লড়িনি, শুধু একটু মাটির ওপর ঠেসে ধরেছিলাম ওকে।'
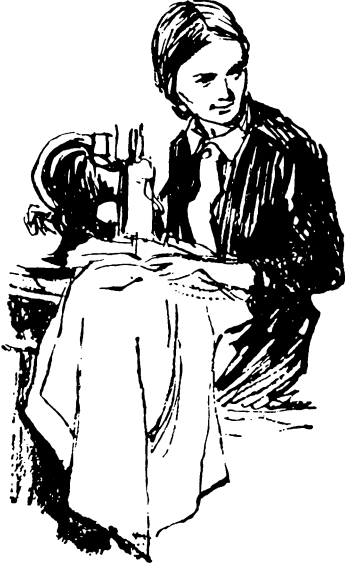
মা ফের মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ ... কিন্তু ওকে তুই বাড়ি নিয়ে এলি কী বলে? এখানেও কিছু চুরি করুক, সেইজন্য?'

'চুরি ও করত না।'

'কেমন করে জানলি?'

'মনে হল, তাই বলছি। ব্যস্।'

এরপর আবার চুপচাপ। শুধু সেলাই কলের একঘেয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজে যা একটু নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছে।

মিশা বলল, 'খুব বিরক্ত হয়েছ, না?'

জবাব না দিয়ে মা জিজ্ঞেস করল:

'এখানে ওকে কেন আনলি বল্ তো?'

'তা জানি না।'

'ওর জন্য তোর দুঃখ হয়েছিল নাকি রে?' মা ওর দিকে ফিরে খুঁটিয়ে দেখল একবার মুখটা।

মিশা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দুঃখ কেন হবে। এই এমনি একটু ... ওর আস্তিনগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, সেলাই করা দরকার, তাই।'

'হ্যাঁ, তা বটে।' ফের কল চালিয়ে দিয়ে মা বলল।

কল থেকে আস্তে আস্তে সাদা কাপড় বেরিয়ে আসে। চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর ঢেউ খেলে ভাঁজ হয়ে যায়।

মিশা বলল, 'মনে হচ্ছে, ওকে এনেছিলাম বলে তুমি রাগ করেছ?'

'কই, আমি তো কিছু বলিনি। তবে হ্যাঁ, পরিচয়টা খুব সুখের নয়। এই হল প্রথম কথা। তাছাড়া, তুই ওকে আমাদের এখানেই থাকবার কথা বলতে গিয়েছিলি। আমাকে আগে তোর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, বুঝলি। এ বাড়ির ব্যাপারে আমারও খানিকটা হাত আছে বলে মনে হয়।'

মিশা মেনে নিয়ে বলল, 'ঠিক। কিন্তু আমার যে দুঃখ হচ্ছে ওর জন্য, ফের রাস্তায় যাবে, চুরি চামারি করবে।'

মা সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সেটা অবশ্য দুঃখের কথাই বটে, অনেক লোক এসব ছেলেদের ঘরে জায়গাও দিচ্ছে, কিন্তু... তুই তো জানিস আমার এখন তেমন অবস্থা নয়।'

মিশা একটু আবেগ দিয়ে বলল, 'অল্পদিনের ভেতর ওরা সব ছেলেকেই রাস্তা থেকে ঘরে তুলে নেবে, দেখে নিও। এর মধ্যেই কতো শিশু-আবাস খুলেছে তা জানো?'

মা জবাব দিল, 'তা তো জানি। কিন্তু তাহলেও এসব ছেলেদের নতুন করে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করা ভয়ানক কঠিন কাজ। রাস্তায় বাউণ্ডুলেপনা করে এরা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'জানো মা, মস্কোতে একদল ছেলে আছে, তাদের ইয়ং পাইওনিয়র বলে। ওরা অনেকটা কমসমোলের সভ্যদের মতোই, অনাথ ছেলেদের ভেতর কাজ করে, আর নানা ধরনের...' একটা অনির্দিষ্ট ভঙ্গি করল মিশা, 'এটা সেটা নানারকম কাজই করে ওরা। গেঙ্কা, স্লাভা আর আমি যোগ দেব ঠিক করেছি। ঠিকানাও জোগাড় করা হয়েছে। পান্তেলেয়েভ্‌কায়। রোববার ওখানে আমরা যাব।'

'পান্তেলেয়েভ্‌কায়? সে তো অনেক দূর।'

'তাতে কী! এখন তো গরমের ছুটি, হাতে সময়ও অনেক। চোদ্দবছর বয়েস হলে আমরা কমসমোলে ঢুকব।'

চোখ তুলে মিশার দিকে তাকিয়ে হাসল মা।

'এর মধ্যেই কমসমোলে ঢোকার ইচ্ছে হয়েছে?'

'এখন নয়। এখন তো আর নেবে না। পরে ...'

'কমসমোলে ঢুকলে দিনরাত এত ব্যস্ত থাকবি, আমার দিকে ফিরেও তাকাবি না।' নিঃশ্বাস ফেলে হাসল মা।

মিশাও হাসল, 'তা কেন, মা? তোমার কাছে থাকার অনেক ফুরসৎ পাব।' মুখ লাল করে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল মিশা।

সেলাই কলের হাতল ঘুরিয়ে মা বলল, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

মায়ের দিকে একবার লুকিয়ে তাকাল মিশা। কাজে মগ্ন হয়ে আছে মা। শক্ত

করে বাঁধা বাদামি চুলের খোঁপাটা সবুজ ব্লাউজের ওপর এসে পড়েছে। জামাটা চকচকে, ছিমছাম ইস্ত্রি করা, নির্ভাঁজ কলারওয়ালা।

মিশা উঠে পা টিপে টিপে মার কাছে গেল। দু'হাতে মার কাঁধ জড়িয়ে তার চুলের ওপর গালটা চেপে ধরল।

হাঁটুর ওপর সেলাইটা রেখে মা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল রে, অ্যাঁ?'

মিশা বলল, 'জানো মা, আমি কী ভাবছিলাম?'

'কী?'

'তোমাকে শুধু সত্যি করে জবাব দিতে হবে—"হ্যাঁ" কি "না"।'

'বেশ তো, দেব।'

'তুমি বোধহয় আমার ওপর একটুও রাগ করোনি। তাই না? সত্যি বলো!'

মা আস্তে করে হেসে মিশার হাতদুটো ছাড়াতে চেষ্টা করল।

মিশা খুশি হয়ে বলে উঠল, 'না, আগে বলো। বলো না! আরও কী ভাবছি আমি জানো?'

'কী?'

'ভাবছি,' একটু থেমে আবার বলল, 'ভাবছি তুমি হলেও ঠিক একই কাজ করতে। করতে কিনা বলো? ঠিক বলেছি, না?'

ওর হাতদুটো ছাড়িয়ে চুল সমান করতে করতে মা বলল, 'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। দেখিস বাড়িতে তাই বলে একপাল বাউণ্ডুলে ছেলে নিয়ে আসিসনি যেন।'

৩৩

কালো পাখা

আঙিনা থেকে গেঙ্কা ডাকল, 'মিশা!'

জানলা দিয়ে মিশা মাথা বাড়াল। ওপর দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে গেঙ্কা।

'কী চাই?'

'তাড়াতাড়ি নেমে আয়। খুব জরুরি কথা!' ফিলিনের গুদামঘরটার দিকে চোখ ইশারা করে গেঙ্কা বলল।

মিশা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' বেরোবার ইচ্ছে ওর ছিল না।

'জল্‌দি!' মুখ বেঁকাল গেঙ্কা। নানা রকম ভাবে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা দারুণ জরুরি। 'বুঝেছিস তো?'

মিশা ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটল নিচে। আঙিনায় গিয়ে পৌঁছুতেই গেঙ্কা দৌড়ে এল সামনে।

'জানিস ওই ঢ্যাঙা লোকটা কোথায় আছে?'

'কোথায়?'

'সরাইখানায়।'

দু'জনে রাস্তায় এসে সরাইখানার সামনে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড নিষ্প্রভ জানলাটার ভেতর উঁকি দিয়ে ওরা দেখল ছোট ছোট মার্বেলের টেবিলগুলো ঘিরে লোক বসে রয়েছে। ভেতরের ছাদে প্লাস্টারের মূর্তিগুলোকে মনে হচ্ছে যেন তামাকের ধোঁয়ার নীল ঢেউয়ের ভেতর সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

একটা টেবিলে বসেছিল ফিলিন। কিন্তু সে একলা।

মিশা বলল, 'কই রে, তোর লোকটা গেল কোথায়?'

গেঙ্কা হতভম্ব হয়ে বলল, 'এক মিনিট আগেও তো ছিল এখানে। ফিলিনের ঠিক সামনেই বসেছিল। কোথায় যেতে পারে এর মধ্যে?'

মিশা বলল, 'যদি এখানেই থাকে তাহলে তো বেশি দূরে যাবার কথা নয়। তুই বাঁ দিক দিয়ে স্‌মলেন্‌স্কায়া স্কোয়ারে চলে যা তো। আমি ডান দিক ধরে আরবাত স্কোয়ারে যাচ্ছি।'

মিশা হন্‌ হন্‌ করে চলল আরবাত স্কোয়ারের দিকে। রাস্তাটা ভালো করে নজর করে দেখছিল ও। পাশের একটা গলি পেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দেখল গলির ভেতরে সাদা শার্ট পরা একটি লোক বাঁকটা ঘুরেই একটা গির্জার কাছে

আরেক গলির ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে। যতো জোর পারা যায় মিশা ছুটল গির্জার দিকে। তারপর দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকাল। ঢ্যাঙা লোকটা খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে প্রেচিস্তেঙ্কা স্ট্রীটের দিকে চলেছে। মিশা ছুটল পেছন পেছন। প্রেচিস্তেঙ্কা স্ট্রীট পার হয়ে লোকটা আরেকটা গলির ভেতর চলল। অস্তোজেঙ্কা স্ট্রীটের কাছে এসে মিশা প্রায় ধরে ফেলল ওকে। কিন্তু একটা ট্রাম মাঝখানে এসে পড়ায় দু'জন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ফের। ট্রাম চলে যেতেই দেখা গেল লম্বা লোকটা অদৃশ্য।

কিন্তু কোথায়? মিশা বিব্রত হয়ে সমস্ত রাস্তাটা দেখল। উল্টো তরফে একটা স্ট্যাম্পের দোকান নজরে পড়ল। এ দোকানটায় সে অনেকবার এসেছে নিজের ডাকটিকিট-খাতার টিকিট জোগাড় করতে। এইটেই সেই দোকান যেটার কথা গেঙ্কা বলেছিল — বর্‌কা ফিলিন নাকি এখানে কী উদ্দেশ্যে আসা যাওয়া করে ... মিশা দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলতেই সজোরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

কেউ নেই এখানে। কাউণ্টারের কাঁচের নিচে ডাকটিকিট পড়ে আছে, তাকগুলো বাক্স আর এ্যালবাম ভর্তি।

ঘণ্টার আওয়াজে পেছনের কামরা থেকে মালিক বেরিয়ে এল। টাকমাথা বুড়ো মানুষ, নাকটা লাল। পেছনের দরজাটা ভালো করে এঁটে দিয়ে মিশাকে জিজ্ঞেস করল কী সে চায়।

'একটু স্ট্যাম্প দেখতে পারি?'

বুড়ো লোকটা কাউণ্টারের ওপর অনেকগুলো স্ট্যাম্পের খাম ছুঁড়ে দিয়ে পেছনের ঘরে ফিরে গেল, দরজাটা একটুখানি খুলে রাখল দোকানের ওপর নজর রাখার জন্য।

বোস্‌নিয়া আর হার্‌জিগোভিনা স্ট্যাম্প

দেখবার ভান করে মিশা চোরা চাউনি হানল পেছনের ঘরটার দিকে। ঘরটায় কোনো জানলা নেই, বেশ অন্ধকার। শুধু একটা ঢাকনাওয়ালা বাতি রয়েছে টেবিলের ওপর। বুড়ো লোকটা ছাড়াও আরেকজন আছে কামরার মধ্যে। চাপা গলায় আলাপ করছে ওরা। অন্য লোকটাকে মিশা দেখতে পাচ্ছিল না সামনের কাউণ্টারটার জন্য। কিন্তু কেন যেন ওর মনে হল এই লোকটাই সে যার পেছু ও নিয়েছিল। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল কী আলাপ চলেছে, কিন্তু বড়ো আস্তে কথা বলছে ওরা।

পেছনের কামরায় চেয়ার টানার শব্দ হল। মিশা বুঝল এবার দু'জন লোক দোকানের ভেতরে এসে পড়বে। উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় ও তাই ঝুঁকে রইল স্ট্যাম্পগুলোর ওপর... এখ্‌খুনি হয়তো সেই মানুষটাকে দেখতে পাবে ও ... ক্যাঁচ্ করে একটা দরজায় আওয়াজ হল, কয়েক মিনিট বাদে বুড়ো লোকটা দোকানে ঢুকল। ও যা ভাবতে পারেনি তাই হয়েছে! ঢ্যাঙা লোকটা খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে...

ভুরু কুঁচকে কাউণ্টারের ওপাশে এসে বুড়োটা বলল, 'কী? বাছাই করে নিয়েছ যা নেবার?'

মিশা যেন খুব মন দিয়ে স্ট্যাম্প দেখছে এমনি ভান করে জবাব দিল, 'এক মিনিট।'

বুড়ো বলল, 'তাড়াতাড়ি করো। দোকান বন্ধ করার সময় হল।'

পেছনের কামরায় ফিরে গেল বুড়ো। এবার আর দরজা ভেজিয়ে দেবার গরজ দেখাল না সে।

টেবিলের ধারে বাতির আলো পড়েছে। সেই আলোয় মিশা দেখল বুড়োর হাড্ডিসার হাতদুটো। টেবিল থেকে কাগজপত্র তুলে, ভাঁজ করে, একটা দেরাজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে সে। তারপর একটা কালো হাত-পাখা দেখা গেল

লোকটার হাতে। পাখাটা খানিকক্ষণ মেলে ধরে থাকল সে, তারপর আস্তে করে গুটিয়ে ভাঁজ করে ফেলল—তখন সেটার আকার দাঁড়াল একটা ছোট ছড়ির মতো...

এরপরেই বুড়ো চক্‌চকে দুটো ধাতুর জিনিস তুলে নিল। একটা দেখতে আংটির মতো আর একটা বলের মতো। পাখার সঙ্গে ও দুটো জিনিসও সে দেরাজে রেখে দিল।

৩৪

আগ্রিপ্পিনা তিখনভনা

ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এল মিশা। রহস্যময় লোকটা ওর চোখে ধুলো দিয়ে গেল। কিন্তু ডাকটিকিটের দোকানে ও যা দেখেছে সেটা খুবই সন্দেহজনক। খিড়কি দরজা দিয়ে লোকটা উধাও হল, দোকানদারের চালচলনটাও কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া হার্ডকিপ্‌টে বর্‌কাটা ওখানে প্রায়ই যাওয়া আসা করে ...

বাড়িতে প্রায় এসে পড়েছে। কালো হাত-পাখাটার কথা মনে হতেই একটা অদ্ভুত চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেল। বুড়োটা যখন পাখাটা ভাঁজ করেছিল তখন ওটা দেখতে ঠিক একটা খাপের মতো মনে হচ্ছিল। তার ওপর সেই আংটিটা। খাপটা সেই ছোরার নয় তো?

এই আন্দাজে উদ্বিগ্ন হয়ে বন্ধুদের খোঁজে ছুটল মিশা।

গেঙ্কার বাড়িতে ওরা টেবিল ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল। একটা কাগজের ওপর স্লাভা লাইন কাটছিল আর গেঙ্কা লিখছিল। চেয়ারে পা রেখে টেবিলের ওপর ঝুঁকে প্রায় শুয়ে পড়েছে সে। আগ্রিপ্পিনা পিসি বসে আছেন ওদের উল্টো দিকে। তাঁর নাকের ডগায় লোহার ফ্রেমের চশমা। চশমার ওপর দিয়ে মিশার দিকে তাকালেন উনি। হাতদুটো চোখ বরাবর টেবিলের ওপর বাড়িয়ে ধরে একটা কাগজ থেকে ডিকটেসন দিচ্ছিলেন।

আস্তে আস্তে পড়লেন, 'রুব্‌ৎসভা, আন্না গ্রিগোরিয়েভনা, লিখেছিস? আরো সুন্দর, পরিষ্কার করে লেখ, তড়বড় করে নয়। ব্যস্‌। সেমিওনভা, ইয়েভ্‌দাকিয়া গাভ্রিলভ্‌না।'

খিলখিল করে হেসে গেঙ্কা বলে উঠল, 'এই দ্যাখ্‌ মিশা। নতুন একটা কাজ জুটেছে—"মহিলা বিভাগের সচিব"।'

আগ্রিপ্পিনা পিসি এবার জোর গলায় বললেন, 'ছট্‌ফটানি বন্ধ কর্‌ তো! কাগজটা নোংরা করে ফেলবি!'

গেঙ্কার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল মিশা—'কারখানার যে সমস্ত নারীশ্রমিক অশিক্ষা দূরীকরণ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁদের নামের তালিকা'। প্রত্যেক নামের সঙ্গে একটা করে সংখ্যা: সেটা হল বয়েস। প্রত্যেকের বয়েসই চল্লিশের ওপর।

আগ্রিপ্পিনা পিসি গজগজ করে ওঠেন, 'চুপ করে থাকতে পারছিস না? দ্যাখ্‌ তো স্লাভা কেমন চমৎকার লাইন টানছে, আর তুই সমানে উসখুস করছিস... কীরে? ইয়েভ্‌দাকিয়া গাভ্রিলভ্‌না হল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে যাও। এই বুড়িগুলোকে কেন মিথ্যে পড়াবার চেষ্টা করছ?'

গেঙ্কার দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন পিসি।

'কেন জিজ্ঞেস করছিস, মানে? একটু তলিয়ে ভেবে দেখেছিস?'

'নিশ্চয়!' ঝগড়ার সুরে গেঙ্কা বলল, যদিও পিসির প্রশ্নটা ওকে একটু বিব্রত করেছে সেটা বেশ বোঝা গেল। তালিকার ওপর কলমটা ঠেকিয়ে বলল, 'ও বাবাঃ চুয়ান্ন। বলতে পারো এ কিসের জন্য লেখাপড়া শিখতে চায়?'

'ও, এই রকম ছেলে হয়েছিস তুই?' চশমাটা খুলে আস্তে আস্তে বললেন আগ্রিপ্পিনা পিসি, 'তুই যে এমনটা হবি তা আমি ভাবতে পারিনি!'

'কী হয়েছে?' গেঙ্কা এবার আমতা আমতা করে বলল।

গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে পিসি বললেন, 'বুঝেছি, তুই ভাবিস খালি তোরই লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে আছে, না?'

'আমি তো...'

'চুপ কর্। কথার ওপর কথা বলিস না। লেখাপড়াটা শুধু তোর জন্যই, নাকি? এই সব ব্যবস্থা হল বিশেষ করে তোর জন্যই তাই ভেবেছিস, না? চল্লিশ বছর কারখানায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেছে সেমিওনভা, সে মুখ্যু থেকেই মারা যাক তাতে তোর কিছু আসে যায় না? তাহলে আমিও লেখাপড়া বৃথা শিখলাম বল্? গৃহযুদ্ধে আমার দুটি ছেলেকে হারিয়েছি যাতে গেঙ্কা লেখাপড়া শেখে আর আমি যেমনটি ছিলাম তেমনিটি থাকি, তাই না? আর আসাফিয়েভাকে যে কুঠরিঘর থেকে একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হল, সেটাও তাহলে করা উচিত হয়নি বল্? ষাট বছর ওই কুঠরিঘরে কাটাল, এখন সে ওইখানেই মরুক্? এই তো হল তোর মত। ঠিক করে বল্ তো?'

গেঙ্কা জোরে ফুঁপিয়ে উঠল, 'পিসিমা! তুমি আমার কথাটাই বুঝলে না! আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

আগ্রিপ্পিনা পিসি রাগ করে বললেন, 'তোকে আমি ঠিকই বুঝেছি। ভালো করেই বুঝেছি রে ছোক্‌রা। তোর মাথায় যে এইরকম সব ধারণা আছে তা কখনো ভাবিনি। স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুই এইভাবে খেটেখাওয়া মানুষদের এমনি ছোট নজরে দেখিস।'

মাথা নিচু করে করুণ গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল গেঙ্কা, 'পিসিমা! কথাটা না ভেবেই বলে ফেলেছি, পিসিমা। কথাটা মাথায় আসতেই ফস্ করে বলে ফেলেছি।'

পিসিমা ধমক দিয়ে বললেন, 'কথা তো চড়ুই' এর মতো নয়, উড়ে গেলে ধরা অসম্ভব। কী বলিস একটু ভেবেচিন্তে বলবি তো।' চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আগ্রিপ্পিনা পিসি। 'যাক্ গে, ঠিক আছে। দোষ স্বীকার করলেই অর্ধেক মাপ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরে কথা বলার সময় একটু ভেবেচিন্তে বলিস...'

৩৫

ফিলিন

আগ্রিপ্পিনা পিসি গেলেন রান্নাঘরে। গেঙ্কা রয়ে গেল টেবিলের পাশেই। নিজের কথা ভেবে ওর খুব দুঃখ হচ্ছিল।

মিশা ঠাট্টা করল, 'কীরে, খুব শিক্ষা হল তো? তোর ওই জিভের জন্যই অবিশ্যি এর ডবল শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।'

সান্ত্বনার সুরে স্লাভা বলল, 'যাক্‌গে মিশা। ও তো নিজের দোষটা মেনেই নিয়েছে, কী বলিস?'

মিশা জবাব দিল, 'ঠিক আছে। সেই ঢ্যাঙা লোকটাকে দেখেছিলি গেঙ্কা?'

মাথা না তুলে ভুরু কুঁচকে গেঙ্কা জবাব দিল, 'কাউকে দেখিনি আমি।'

'তাহলে শোন,' মিশা ড্রয়ার আলমারির কিনারায় কনুই রেখে নির্বিকার ভাবে বলল, 'তোরা যখন এখানে বসেছিলি... সেই সময় আমি... খাপটা দেখেছি।'

'কোন্ খাপ?' মিশার কথার মানে বুঝতে না পেরে স্লাভা জিজ্ঞেস করল।

'সাধারণ একটা খাপ। আমার ছোরার।'

মাথা তুলে অবিশ্বাসভরে মিশার দিকে তাকাল গেঙ্কা।

স্লাভা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। নিজের চোখে। এইমাত্র দেখে এলাম।'

'কোথায়?' গেঙ্কা উঠে দাঁড়াল।

'অস্তোজেঙ্কা স্ট্রীটের ডাকটিকিটের দোকানে।'

'মিছে কথা বলছিস!'

'মোটেই না। মিছে কথা আমি বলি না।'

'তাজ্জব!' টেনে টেনে বলল গেঙ্কা, 'কোথায় রাখে সে ওটা?'

আগ্রিপ্পিনা পিসি রান্নাঘরে থাকতে থাকতেই মিশা তাড়াতাড়ি বন্ধুদের কাছে ডাকটিকিটওয়ালার কথা, ঢ্যাঙা লোকটা আর সেই কালো পাখাটার কথা বলে নিল।

হতাশভাবে গেঙ্কা বলল, 'বাঃ বেশ! আমি ভাবলাম খাপটা দেখেছিস সেই কথা বুঝি বলবি, তা না কোথাকার কোন্ এক বাজে পাখার গপ্প ফেঁদেছিস।'

স্লাভা বলল, 'বুঝলি, আগে আমাদের দুটো অজ্ঞাত রাশি নিয়ে সমীকরণ করতে হয়েছিল আর এখন হল তিনটে: প্রথম ফিলিন, দ্বিতীয় নিকিৎস্কি, আর তৃতীয় হল পাখাটা। মিশা, নিশ্চয় বুঝতেই পারছিস যে ফিলিন যদি আমাদের সেই লোক না হয়, তাহলে বাকিটাও সব আজগুবি।'

গেঙ্কা বলল, 'ও ঠিকই বলেছে রে মিশা। হয়তো সবই তোর কল্পনা।'

মিশা জবাব দিল না। তখনও ও ড্রয়ার আলমারির কিনারায় কনুই দিয়েই রয়েছে। লেসের পাড় লাগানো একটা সাদা কাপড় আলমারির দুপাশে ঝুলে আছে।

ড্রয়ার আলমারির ওপর একটা চারকোণা আয়না। আয়নাটার মাথায় বাঁ দিকের কোণে একটা সবুজ পাঁপড়ি বসানো। লম্বা ছুঁচ-গাঁথা একগুলি সুতো পড়ে আছে ডিমের আকারের কাঠামোয় কতগুলো পুরনো ফটোগ্রাফের পাশে। কাঠামোয় সোনালি অক্ষরে ফটোগ্রাফারদের নাম খোদাই করা। নামগুলো আলাদা কিন্তু সমস্ত ছবির পেছনে এক দৃশ্যপট—ধূসর একজোড়া পর্দার মাঝখানে একটু পুকুর আর দূরে কুয়াশাঘেরা গ্রীষ্মাবাস।

মিশা ভাবল, 'স্লাভা অবিশ্যি ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তবু যেন এ সবের মধ্যে একটা কী ব্যাপার আছে।' গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে ও বলল:

'যদি পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া না করতিস তাহলে এতক্ষণে ফিলিনের খবর কিছুটা পেতিস।'

'তার মানে?'

'মানে যা বলছি তাই। ফিলিনকে উনি চেনেন। উনি তো অন্তত এটুকু বলতে পারতেন সে রেভস্কের লোক কিনা।'

'কেন ভেবে নিয়েছিস পিসিমা বলবে না? নিশ্চয় বলবে।'

'হ্যাঁ, তাই ভাবছিস কিনা। এখন তোর সঙ্গে উনি কথাই বলবেন না।'

'কথা বলবে না আমার সঙ্গে? তাহলে তোরা পিসিমাকে চিনিস না। অনেক আগেই বিলকুল ভুলে গেছে, বিশেষ করে আমি যখন মাপ চেয়েছি। একটু কায়দা করে এগোতে হয় কাছে। এক মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবি।'

আগ্রিপ্পিনা পিসি ঘরে ঢুকলেন। ছেলেরা চুপ করে গেল। ওদের একবার খুঁটিয়ে নজর করে পিসিমা টেবিল সাফ করতে লেগে গেলেন।

গেঙ্কা এমন ভান করল যেন একটা গল্প বলছিল, এর মধ্যে পিসিমা এসে পড়ায় বাধা পড়েছে।

'আমি তাকে বললাম, "তোর বাবা তো তোদের বাড়ির আর সকলের মতোই ফাটকাবাজ। রেভস্কের সবাই তোদের হাঁড়ির খবর রাখে!"'

'কার কথা বলছিস রে?' আগ্রিপ্পিনা পিসি জিজ্ঞেস করলেন।

পিসিমার দিকে সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেঙ্কা বলল, 'এই বর্‌কা ফিলিনের কথা বলছিলাম। আমি ওকে বললাম, "রেভস্কের সবাই তোদের নাম জানে"। ও বললে, "রেভস্কে আমরা ছিলামই না, কাদের কথা বলছিস তা আমি বুঝতে পারছি না"।'

ছেলেরা আগ্রিপ্পিনা পিসির জবাবের প্রতীক্ষায় থাকে। গরম মেজাজে টেবিলের কাপড়টা উনি জোরে একবার ঝেড়ে বললেন:

'ওর সঙ্গে তোর এত দহরম-মহরম কিসের রে? পই পই করে বলেছি ওই ছোকরাটার সঙ্গে মিশবিনে। তোকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।'

'তাহলে মিছে কথা বলে কেন? যদি রেভস্কেরই লোক হয় ওরা তো সেটা বললেই পারে, লুকোয় কেন?'

'হয়তো কোনোদিন রেভস্কে ও ছিল না।'

'ও ছিল সে কথা তো আমি বলিনি। কিন্তু ওর বাবা তো রেভস্কের লোক। চাপা দেবার কী আছে এতে?'

'হয়তো বাপের কথা ও কিছুই জানে না।'

'কিন্তু ফিলিন তো কাছেই বসেছিল। সে শুধু হাসল আর বলল, "আমরা খাঁটি মস্কোর লোক, মজদুর"।'

'"মজদুর" বলেছে নাকি?' আগ্রিপ্পিনা পিসি অবশেষে হার মানলেন। 'তাহলে শুনে রাখ্, ওর বাপ ছিল ওয়ার্ডার, রেভস্কের গুপ্ত পুলিশের লোক, আর এখন কিনা মজদুর বলে চালাচ্ছে। মজদুরই বটে!'

'তার মানে ফিলিন নিজেই গুপ্ত পুলিশের লোক ছিল বলছেন?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'না। ওর বাপ ছিল। তা বাপ যেমন, বেটাও তো তেমনি হবে। ওদের সঙ্গে মিশিস না।'

টেবিল-ঢাকা কাপড়টা ভাঁজ করে পিসিমা বেরিয়ে গেলেন।

পেছন থেকে চোখ টিপে গেঙ্কা ফুর্তিভরা গলায় বলল, 'দেখলি তো? আর তোরা বলছিলি কিছুই বলবে না। সবই তো বলে দিল! আমি তো পিসিমাকে চিনি। এখন সব পরিষ্কার। ফিলিন আমাদের সেই লোক। তার মানে নিকিৎস্কি এখানে আছে, আর সেই খাপটাও আছে। আমি তো বেশ টের পাচ্ছি গুপ্তধন এবার হাতের কাছে এসে পড়ল বলে!' মহা আনন্দে ও হাত কচলাতে শুরু করল।

স্লাভা আপত্তি তুলল, 'সব কিছু সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল না তো। তুই নিজেই বলেছিলি রেভস্কে নাকি ফিলিন নামের লোক গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। হয়তো এ আরেক ফিলিন।'

মাথা নেড়ে গেঙ্কা বলল, 'কী যে বলিস। পুলিশের লোকের বাচ্ছা! ওই হল আমাদের সেই লোক, কোনো সন্দেহ নেই!'

মিশা সকৌতুকে বলল, 'ঠিক আছে। হয়তো ওই আমাদের লোক কিংবা হয়তো তা নয়। কিন্তু খাঁটি কথাটা হল ও রেভস্কেরই বাসিন্দা ছিল। এখন আমাদের বের করা দরকার—"সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজে ও কখনো কাজ করেছিল কিনা।'

গেঙ্কা প্রশ্ন করল, 'কী করে সেটা বের করা যাবে?'

'সে খুব সোজা। বর্কা আমাদের বলবে না ভেবেছিস?'

৩৬

ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়া মহল্লায়

রোববার তিন বন্ধু ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়া মহল্লার পান্তেলেয়েভ্‌কায় সেই ছাপাখানাটার দিকে রওনা হল ইয়ং পাইওনিয়রদের সংগঠন দেখতে। বিজলির অভাব হয় বলে রোববার ট্রাম চলে না। তাই খুব ভোর থাকতেই রওনা হয়েছিল ওরা।

ধূসর কুয়াশায় ঢাকা আরবাত স্ট্রীট। এখন রাস্তাটা জনশূন্য, এমন কি ঝাড়ু হাতে ঝাড়ুদাররাও আসেনি এখন পর্যন্ত।

সকালের তাজা খুশি খুশি ভাব নিয়ে ছেলেরা হন্ হন্ করে হাঁটছে। ঠাণ্ডা, ঠন্‌ঠনে অ্যাস্‌ফাল্টের ওপর ওদের জুতোর গোড়ালিগুলো আওয়াজ তুলছে, ফাঁকা রাস্তায় উঠছে প্রতিধ্বনি। দোকানের জানলাগুলোর ওপর ওদের ছোট ছোট দেহের ছায়া পড়ছে।

মিশা ভাবে, 'আরবাত স্ট্রীটটা ফাঁকা থাকলে কেমন জানি অদ্ভুত দেখায়'— রাস্তাটাকে মনে হয় যেন ছোট্ট, ঘিঞ্জি আর চুপচাপ। এখন বাড়িগুলোকে বেশ নজর করে দেখা চলে। মিশা চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। একদিকে 'কার্নাভাল' সিনেমা, তার পেছনে সামরিক আদালতের বাড়ি। আর ওই সেই বাড়িটা যেখানে আলেক্সান্দ্র্ সের্গেয়েভিচ্ পুশ্‌কিন* থাকতেন এক সময়। সাধারণ একটা দোতলা বাড়ি, নজরে পড়বার মতো কিছু নয়। পুশ্‌কিন যে কখনো এখানে থাকতেন সেটা ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগে। অবিশ্যি সেকালে উনি আর-আর দশজন মানুষদের মতোই আরবাত স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তা নিয়ে অবাক হত না। কিন্তু আজ যদি ফের আরবাত স্ট্রীটে এসে উদয় হতেন পুশ্‌কিন,

---

* পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭) মহান রুশ কবি; রুশ সাহিত্যে বাস্তবধর্মিতার প্রবর্তন তিনি করেন।

তাহলে যে কী কাণ্ড হত! সারা মস্কো বোধহয় ছুটে আসত এখানে।

গেঙ্কা বক্‌বকানি শুরু করল, 'ইয়ং পাইওনিয়ররা কেমন সেটা দেখতে হবে। দেখব হয়তো সেখানে অবাক হবার মতো কিছু নেই, হয়তো বা দেখব শিশুসদনের মেয়েদের মতো কাপড়ে ফুলের নক্‌শা তুলছে বসে বসে।'

মিশা বলল, 'দূর বোকা! ওটা হল কমিউনিস্ট সংগঠন, বুঝেছিস্ তো? তার মানে কিছু কাজের কাজ ওরা করে।'

স্লাভা বলল, 'ওখানে যেতে আমার কেমন যেন একটু অস্বস্তি লাগছে।'

'কেন?'

'লাগছে তাই বলছি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ও। 'জিজ্ঞেস করবে আমরা কারা, কেন এসেছি। কেন যেন অস্বস্তি লাগে আমার।'

মিশা দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, 'অস্বস্তি লাগবার কোন কারণ নেই। কেন, খারাপ কী আছে এতে? হয়তো আমরাও ইয়ং পাইওনিয়র হতে চাই? আমাদের সে অধিকার তো আছেই, কি বল্?'

ছেলেরা সবাই চুপ করে গেল। বাড়িগুলোর পেছন থেকে ভোরের ঝলমলে সূর্য উঠছে। তেরছা আলোয় দালান-বাড়িগুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে চারকোণা হয়ে, ছায়াগুলো ক্রমেই ছোট হচ্ছে, আস্তে আস্তে রাস্তার একপাশে সরে যাচ্ছে, ওপাশে উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো রোদের সামনে যেন আর টিকতে পারছে না।

রাস্তায় প্রাণের সাড়া জাগে। বড়ো বড়ো চামড়ার থলিতে ঠাসা খবরের কাগজ নিয়ে পোস্টম্যানরা বেরিয়ে আসছে ডাকঘর থেকে। গোয়ালিনীরা টুংটাং শব্দ তুলে দুধের বাল্‌তি নিয়ে যাচ্ছে।

ছেলেরা কুদ্রিন্‌স্কায়া স্কোয়ারে পৌঁছল।

মিশা কোণের দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওই দ্যাখ্ গেঙ্কা!' বাড়িটার দেয়াল বুলেট আর কামানের গোলার টুকরো লেগে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। 'জানিস্ ওই দেয়ালগুলোর অমন চেহারা কেন?'

'না তো।'

'অক্টোবর বিপ্লবের সময় দারুণ দারুণ কয়েকটা লড়াই হয়ে গেছে ঠিক এই জায়গাটায়। আমাদের পক্ষের লোকরা ক্যাডেটদের* ওপর গোলা ছুঁড়েছিল। স্লাভার সঙ্গেই আমরা সে সব দেখেছি ... মনে আছে তোর স্লাভা?'

স্লাভা বলে ফেলল, 'আমি তখন ছিলামই না এখানে। আর তুইও ছিলি বলে মনে হয় না।'

'আমি? কতোবার এসেছি এখানে! শুরার সঙ্গে তো প্রায়ই আসতাম। একবার টুপিতে করে কার্তুজের খাপ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। অনেকদিন আগের কথা—তা ঠিক। আমার তখন আটবছর বয়েস। কোনোদিন আমাদের দেখিসনি তার অবিশ্যি কারণ আছে। তোকে তো সবসময় বাড়ির মধ্যেই কাটাতে হত কিনা। তোর মা তোকে বেরুতেই দিত না একদম।'

ছেলেরা পান্তেলেয়েভ্কায় এসে পড়ল।

ছাপাখানার বড়ো জানলার ভেতর দিয়ে ওরা দেখল বড় হলঘরের ভেতরে কতো মেশিন। ছাপাখানায় কোনো কর্মী নেই। ফটকের ওপর একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে: 'মস্কো প্রকাশভবনের ছাপাখানা'। ছেলেরা দরজার কাছে গেল।

তক্তার তৈরি একটা ছোট ঘরে নিচু রেলিংগুলোর ওপাশে বসে একটা লোক। বড়ো একটা গামলা থেকে ঝোল ঢালছে। চেহারাটা ঠিক চৌকিদারের মতোই।

এখানেও বছর দশেকের একটি মেয়ে রয়েছে। লাল ফিতে দিয়ে ছোট ছোট বেণীদুটো বেঁধেছে সে।

ছেলেরা ঢুকতেই চৌকিদার মাথা তুলল, হাতের পেছন দিকটা দিয়ে গোঁফ মুছল। ওদের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে।

---

* ক্যাডেট — জার আমলের রাশিয়ার 'সংবিধানী গণতন্ত্রী দল' নামে একটি বুর্জোয়া পার্টির সদস্য; সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে যেসব পালটা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটেছিল তার সব কটিতে তারা যোগ দিয়েছিল।

মিশা জিজ্ঞেস করল, 'ইয়ং পাইওনিয়ররা কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'ইয়ং পাইওনিয়র?' আবার চাম্‌চে তুলল চৌকিদার। 'কে পাঠিয়েছে তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি? পার্টির জেলা কমিটি, না আর কেউ?'

'না, এই... হ্যাঁ, আমরা এসেছি...' মিশা তোৎলাতে থাকে, 'আমরা এসেছি একটা কাজে।'

ছোট মেয়েটাও কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকাল। চৌকিদার ঝোলটা শেষ করে গামলা সরিয়ে রাখল।

'ইয়ং পাইওনিয়ররা আমাদের এখানেই আছে। খুব সম্ভব তারা এখন ক্লাবঘরে।'

'সেটা কোথায় দয়া করে বলবেন?'

এ প্রশ্নে ছোট্ট মেয়েটা একটু অবাক হল যেন।

'হুম্‌। তার মানে তোমরা বলতে চাও ক্লাবঘরের খবর তোমরা রাখো না, কেমন?' জিজ্ঞেস করল চৌকিদার।

মিশার মুখে কথা আটকে যায়, 'বুঝলেন তো... আমরা এসেছি অন্য এক পাড়া থেকে। খামোভ্‌নিকি পাড়া থেকে।'

চৌকিদার টেনে টেনে বলল, 'ও-ও! তা বেশ, তা বেশ... ওদের ক্লাবটা হল সাদোভায়া স্ট্রীটে। এখান থেকে খুব দূরে নয়।'

'কোন সাদোভায়া স্ট্রীট?'

মেয়েটা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'বেশ মজার লোক এরা না বাবা! ক্লাবের কথা জানে না! কোথায় আবার তাও চেনে না!'

'তুই থাম!' ছোট মেয়েটাকে ধমক দিয়ে চৌকিদার বলল। 'বয়েসের তুলনায় একটু বেশি পেকে গেছিস! যা তো, রাস্তাটা দেখিয়ে দে ওদের। হয়তো সত্যিই খুব জরুরি দরকারে এসেছে।' ছেলেদের দিকে একবার সন্দিগ্ধ নজর হেনে বলল লোকটা।

'এক মিনিট সবুর।'

বাচ্চা মেয়েটা ছোট একটা চৌবাচ্চার কলের নিচে গামলা আর চাম্‌চে ধ্বয়ে তারপর সেগ্বলো একটা তোয়ালের মধ্যে বেঁধে রেখে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

মেয়েটি বক্‌বক্‌ করে, 'ইয়ং পাইওনিয়রদের আমি খ্বব ভালো করে চিনি। ঐ যে আমাদের ভাসিয়া হল দলের পাণ্ডা, সে ড্রাম বাজায়।'

ওর দিকে বিদ্রূপভরা চোখে তাকাল মিশা, কিন্তু কিছ্ব বলল না। কী হবে কাচ্চাবাচ্চার সঙ্গে তর্ক করে!

মেয়েটা বলেই চলল, 'ওদের একটা বিউগলও আছে। আর কী নিয়মের কড়াক্কড়, ওরে ব্যস্‌! গালমন্দ দেওয়া, ট্রামগাড়ির বামপারে উঠে যাওয়া, পকেটে হাত গ্বঁজে চলা, মেয়েদের সঙ্গে মারামারি করা ওদের একেবারে বারণ। এই রকম ব্যাপার। ওরা শ্বধ্ব ব্বর্জোয়াদের সঙ্গে লড়তে পারে। যখন লড়ে তখন টাই খ্বলে নিতে হয়। টাই পরে ওদের লড়াই করা নিষেধ।'

মিশা কড়া গলায় বলল, 'পা মাড়িও না বলছি!'

ওর কথায় কান না দিয়ে ছোট মেয়েটা বলেই চলল, 'মেয়েরাও যোগ দিতে পারে। তবে সব্‌বাই নয়, শ্বধ্ব যাদের বয়েস হয়েছে তারা।'

স্লাভা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সেই ভাসিয়ার বয়েস কতো?'

'ও তো ম-স্তো বড়ো! এই চোদ্দ, পনেরোও হতে পারে। আর কি দার্বণ কাজের ছেলে জানো? সিধে বাড়িতে ঢুকে সবকিছ্ব নিয়ে চলে যায়।'

ছেলেরা অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে।

গেঙ্কা বলল, 'সব নিয়ে চলে যায় কেমন করে?'

'তা ব্বঝি জানো না?' ম্বর্ব্বি চালে জবাব দিল মেয়েটা, 'ওই সব... মানে ওই অনাথ শিশ্বসদনের ছেলেমেয়েদের জন্য আর কি। বাড়ি বাড়ি ঘ্বরে ইয়ং পাইওনিয়ররা জিনিসপত্র জোগাড় করে। আমার জামাটাও তো নিয়েছে ওরা।' গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল ও।

'তোমার জামা নিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এতো মিথ্যে কথা। যা খুশি তাই নিয়ে চলে যাবার কারও অধিকার নেই।' গেঙ্কা বলল।

ছোট মেয়েটি যেন লজ্জা পেল।

'ওরা নিজেরা তো আর নেয়নি। মা দিয়েছে ওদের।'

'আর তোমার বুঝি কষ্ট হচ্ছিল জামাটার জন্য?' স্লাভা হাসল।

'একটুও না। আমি আমার গেল-বছরের টুপিটাও ওদের দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভাসিয়া বলল দরকার নেই, কারণ এর পরের বার তাহলে দেবার কিছু থাকবে না। বলেছিল ঠিকই, কারণ সকালে ওরা জামাটা নিয়েছিল, ফের বিকেলে এল টুপিটা নিতে।' নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা, 'অনাথ ছেলেমেয়ে কতো আছে! ওদের সকলের জামাকাপড় জুতো জোগাড় করতে অনেকদিন লেগে যাবে...'

সাদোভায়া স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছল ওরা।

'ওই যে, তেতলায়!' ছোট মেয়েটা আঙুল দেখিয়ে একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'এখানেই তোমাদের ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, নয়তো ভাসিয়া ফের দেখে ফেলবে আমাকে...'

৩৭

সামান্য ভুল বোঝাবুঝি

ছোট্ট মেয়েটি ওদের দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কী একটা কারণে ওরা যেন একটু ঘাবড়ে গেছে। দরজার ওপাশ থেকে উঁকি দিল একটা ছোট ছেলে। ওদের দিকে এক নজর দেখেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার উঁকি দিল আরেকটা কটা-চুলো মাথা, সেটাও অদৃশ্য হল...

ছেলেরা একটু ইতস্তত করল। মিশার হঠাৎ ইচ্ছে হল বাড়ি ফিরে যায়। ভাবল হয়তো খুব সম্ভব ওদের তাড়া খেতে হবে। কিন্তু গেঙ্কা আর স্লাভার

সামনে তো দুর্বলতা দেখানো যায় না, তাই গট্‌গট্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছন পেছন গেঙ্কা আর স্লাভা।

তেতলায় উঠে প্রকাণ্ড ভারি একটা ওক কাঠের নক্‌শা-কাটা দরজা খুলল ওরা। মস্তবড়ো একটা চারকোণা ঘরের ভেতর এসে পড়ল। উল্টো দিকের দেয়ালে সোনালি সুতোর গোছাওয়ালা একটা ভাঁজ-করা নিশান কাত হয়ে আছে, নিশানের ব্রোঞ্জ বর্শা-ফলকটা ডিমের আকারের। নিশানের ওপর সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটা লাল ফিতে। তাতে লেখা রয়েছে: 'কমিউনার্ডদের শিক্ষিত করার সবচেয়ে ভালো রাস্তা হল শিশুদের সংগঠন। লেনিন।' নিশানের পাশে ছোট টেবিলের ওপর একটা ড্রাম আর বিউগল।

কামরার চার কোণায় একেকটা ছোট পতাকা, তাতে একেক ধরনের প্রতীক আঁকা। দেয়ালে ঝুলছে ছবি আর পোস্টার।

কামরায় বা সিঁড়িমুখে জনপ্রাণী নেই। এক সেকেণ্ডের জন্য তিন বন্ধু শুনতে পেল ওপরের তলায় পায়ের আওয়াজ। তারপর সবকিছু আগের মতোই চুপচাপ।

কামরায় ঢুকে মিশা গেঙ্কা আর স্লাভা ইয়ং পাইওনিয়রদের ক্লাবটা দেখতে লাগল। চারটে ছোট পতাকায় একেকটা করে প্রতীক আঁকা — পেঁচা, শেয়াল, ভালুক আর চিতাবাঘ। দেয়ালে ঝুলছে আঁকা, খবরের কাগজ থেকে কাটা ছবি। একখানা বড়ো কাগজে আবার নিশান দেখাবার নিয়ম আর টেলিগ্রাফের কোড্‌ লেখা।

পেরেকে ঝুলছে কয়েকটি একসারসাইজ্‌ খাতা, তাতে লেখা — 'উপদলের কাজের হিসাবখাতা।'

খাতাগুলো ওরা দেখছে এমন সময় পেছনে একটা হাল্‌কা আওয়াজ শুনতে পেল। ঘুরেই দেখল লাল টাই বাঁধা কয়েকটা ছেলে চুপিসাড়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে উদ্দেশ্যটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমাদের বন্ধুরাও সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হল।

পাইওনিয়ররা যখন বুঝল যে ছেলেরা ওদের দেখেই ফেলেছে, তখন

জোরসে চিৎকার করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেছু হঠতে হল।

মাঝখানে মিশা আর দু'পাশ বাঁচাচ্ছে গেঙ্কা আর স্লাভা। পেছন দিকটায় ঘরের একটা কোণের আড়াল পড়েছে। মরীয়া হয়ে ওরা হাত পা চালাচ্ছে যাতে হামলাদাররা ওদের জোটটার ভেতর ঢুকে পড়ে ছত্রভঙ্গ না করে দেয়।

দ্বিতীয়বার ছুটল পাইওনিয়ররা, এবার ওদের সামনে রয়েছে কটা-চুলো পাতলা একটা ছেলে, জামার হাতায় বন্ধনীচিহ্ন আঁটা। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে সে একবার সামনে এগোচ্ছে আবার পেছোচ্ছে, আর সঙ্গীদের উৎসাহ দিচ্ছে এগোবার জন্য।

'আগে বাড়ো! এ্যাই, সাবধান। ... ব্যস্ ঠিক হ্যায় ... খেয়াল রাখো ... পালাতে দিও না ... খবরদার ... টেনে সরিয়ে দাও ... সাবধান!'

দ্বিতীয়বারের আক্রমণে ফল হল। পাইওনিয়ররা কোনো রকমে স্লাভাকে টেনে সরিয়ে নিতে পেরেছে। লাইন ভেঙে ওকে বাঁচাতে গেল মিশা। তিনজনকেই এবার একা একা লড়তে হল...

'ব্যস্! হয়েছে... সাবধান!' স্লাভাকে আঁকড়ে ধরে কটা-চুলো ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল। 'হুঁশিয়ার... মারো ঘুষি! সামলে... সেরিওজা, লাগা পাগলা ঘণ্টি!'

দল ছেড়ে একটা ছেলে বেরিয়ে গিয়েই ড্রামটা বাজাতে লাগল গায়ের জোরে।

অবশেষে স্লাভাকে বাঁচাল মিশা।

হামলাদারদের দিকে লাথি ছুঁড়ে তিনজন ফের দেয়ালের ধারে গিয়ে আগের সেই কোণটাতেই দাঁড়াল।

দু'পক্ষই বিচ্ছিরি রকম ঘায়েল। সকলেরই দম ফুরিয়ে এসেছে। পাইওনিয়রদের নেকটাইগুলো দুমড়ে গেছে, স্লাভার জামার কলার ছিঁড়ে গেছে আর গেঙকা হাত দিয়ে দেখছে লাল চুলগুলো, মনে হচ্ছে অনেকগুলো চুল বোধহয় খোয়া গেল।

মিশা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী চাই তোমাদের?'

'চোপরাও! তোমরা বন্দী!' চেঁচিয়ে উঠল ওদের নেতাটি। 'মুখ না বুজলে কিন্তু ডবল রীফ-নট্ গেরো লাগিয়ে দেব।'

ড্রামটা তখনো বেপরোয়া বেজেই চলেছে, এক এক করে ঘরের ভেতর ঢুকছে আরো অনেক পাইওনিয়র।

কটা-চুলো ছেলেটা এবার ঘরের এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'হুঁশিয়ার! সরে দাঁড়াও সব! এরা আমাদের বন্দী ... এ্যাই

“ভালুক!” “শেয়াল!” ... তোমরা নাক গলাতে এসো না। এরা তোমাদের বন্দী নয়, আমাদের ... আমরাই ধরেছি।’

গেঞ্জি গায়ে, লম্বা কালো পাৎলুন আর লাল টাই পরা গাঁট্টাগোট্টা চওড়া-কাঁধ একটি জোয়ান ছোকরা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

সেলাম ঠুকল কটা-চুলো পাইওনিয়র।

উত্তেজিতভাবে খবর দিতে লাগল সে, ‘আমাদের গ্রুপ তিনজন বয়স্কাউট্-গোয়েন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে। ওরা আমাদের দলের পতাকা চুরি করার ফিকিরে ছিল। রাস্তায় থাকতেই নজর করেছিলাম আমরা। দেখলাম বাড়ির দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এরা গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ করছে, সুযোগ খুঁজছে ভেতরে ঢোকার।’

‘দাঁড়াও একমিনিট।’ কথার মাঝখানে জোয়ান ছোকরাটা ওকে থামিয়ে দিল, ‘ছেড়ে দাও ওদের।’

পাইওনিয়র দল তখন ভিড় করে ওদের ছেঁকে ধরছিল চারদিক থেকে। সরে দাঁড়াল সবাই। কোণা থেকে বেরিয়ে এল তিনজন।

ওদের দিকে নজর বুলিয়ে ছোকরাটি বলল, ‘ঠিক আছে। এবার বলো ভাসিয়া কী বলছিলে।’

কটা-চুলো ছেলেটা আবার শুরু করল, ‘হ্যাঁ, ভেতরে ঢোকার সুযোগ খুঁজছিল ওরা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। আমরা পেছনদিকের সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠলাম। ওরা এ ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, আশেপাশে কেউ নেই, তখন ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিন্তু আমরাও তখন লাফিয়ে পড়েছি ওদের ওপর। বন্দী করে ফেললাম।’ একটু থেমে ছেলেটা এবার কাজের মানুষের ঢঙে বলল, ‘এখন ওদের নিয়ে কী করা যায় ? নিজেরাই বিচার করব, না সোপর্দ করে দেব ?’

পাইওনিয়রদের নেতা ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, ‘তা, তোমরা কে বলো তো হে ?’

মিশা বিমর্ষভাবে জবাব দিল, ‘কেউ না। দেখতে এসেছিলাম পাইওনিয়ররা কী রকম।’

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

ভাসিয়া চেঁচাল, ‘মিছে কথা বলছে! ওরা স্কাউট। ইটিকে তো আমি আগেই চিনি।’ স্লাভাকে দেখিয়ে দিল সে, ‘এ হল ওদের একজন টহলদার।’

‘মোটেই না!’ চটে লাল হয়ে স্লাভা বলল, ‘কোনোকালেও স্কাউট ছিলাম না আমি!’

‘তাই নাকি? কোনোকালেও না? ও কথা আর বোলো না, আমি তোমাকে চিনি। অনেকবার দেখেছি তোমাকে, আমরা সব্বাই দেখেছি। তাই নারে সেরিওজা?’

‘হুঁ হুঁ।’ ড্রাম-বাজিয়ে ছেলেটা সায় দিল, চোখের পাতাও পড়ল না একটিবার।

ভাসিয়া জোর গলায় বলল, ‘দেখলে তো? এখন আর অস্বীকার করতে পারবে না। ওদের আমি ভালোমতোই চিনি। ব্রন্নায়া স্ট্রীটে থাকে।’

মিশা বলল, ‘মিথ্যে কথা। আমরা থাকি আরবাত স্ট্রীটে।’

‘আরবাত স্ট্রীটে?’ পাইওনিয়রদের নেতা অবাক হয়ে বলল। ‘তাহলে এখানে এসে উদয় হলে কেমন করে?’

‘হেঁটেই এলাম ... একমাত্র এই জায়গাতেই তো একটা পাইওনিয়র দল রয়েছে।’

‘না, তা নয়।’ জবাব দিল ওদের নেতা। ‘খামোভ্‌নিকি পাড়ায় গজ্‌নাক কারখানাতেও আছে একটা। ওদের আবার পাইওনিয়র দল রয়েছে। তাছাড়া ওদের পাইওনিয়র ভবনও আছে। ওখানে গেলে না কেন?’

‘আমরা জানতাম না।’ একটু বিব্রত হয়ে মিশা বলল। ‘শুনেছিলাম মস্কোয় মাত্র একটা দলই আছে — তোমাদের এই দলটা।’

‘কে বলেছে তোমাকে?’

‘কমরেড জুর্‌বিন।’

‘কমরেড জুর্‌বিন? তাঁকে তোমরা চিনলে কেমন করে?’

‘আমাদের বাড়িতেই থাকেন উনি।’

‘ও, তাই বুঝি ...’ এবার বন্ধুর মতো হাসল ওদের নেতা। ‘কমরেড

জ্বর্বিনকে আমি চিনি। বলছ উনি তোমায় খবরটা দিয়েছেন? এখন কিন্তু আমাদের দলটাই একমাত্র দল নয়। সকোল্নিকি পাড়ার রেল কারখানায় একটা আছে, তোমাদের পাড়ার গজ্নাক কারখানায়ও হয়েছে। তোমাদের বাপ মা কোথায় কাজ করেন?'

গেঙ্কা জানিয়ে দিল, 'স্ভের্দলভ কারখানায়। বাড়িতে আমাদের একটা ক্লাবও আছে। আর আমাদের নিজস্ব নাট্যচক্র আছে।'

মিশা সায় দিল, 'হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব নাট্যচক্র আছে। তবে... আমরা... আমরা তবু পাইওনিয়র হতে চাই কিনা।'

নেতা হেসে বলল, 'ঠিক আছে। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমার দলের ছেলেরা এখনও অভ্যেসের বশে লড়েই চলেছে স্কাউটদের সঙ্গে, আর তোমরাও ভুলে বিপাকে পড়েছ। কিচ্ছু মনে কোরো না, সব ঠিক করে ফেলব আমরা।'

চ্যাপ্টা হুইস্ল্টা বাজাল সে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গোটা দলটা দেয়ালের পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল একটা চতুষ্কোণের আকারে — মাঝখানে রইল ওদের নেতা আর মিশা, গেঙ্কা, স্লাভা।

পাইওনিয়রদের দিকে তারিফ করে চেয়ে রইল ওরা। ওদের এখন আর কেবল ছেলেমেয়েদের একটা দঙ্গল বলা যায় না, রীতিমতো ফৌজী দল। আলাদা আলাদা উপদল হিসেবে ওরা জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেক উপদলের ডানদিকে তাদের নিজের নিজের পতাকা। উঁচু উঁচু জানলার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল রোদের তেরছা রেখা এসে পড়েছে, লাল টাইয়ের সোজা লাইনগুলোকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। ছেলেদের পরনে হ্যাফ-প্যাণ্ট, আর মেয়েরা পরেছে খেলার পোশাক। সবারই রোদে পোড়া চেহারা, সতেজ সপ্রতিভ।

নেতা হুকুম দিল, 'বিউগল, সেলাম জানাও!' বিউগলের শেষ সুরটুকু মিলিয়ে যেতেই সে বলল, 'ছেলেমেয়েরা শোনো। খামোভ্নিকি পাড়া থেকে আমাদের অতিথিরা এসেছে। ওরা আমাদের এখানকার কাজকর্ম ধরনধারন বুঝতে চায়, আমাদের অনুসরণ করতে চায়। এদের ইচ্ছে পাইওনিয়র হবার।

খামোভ্নিকি মহল্লার ছেলেমেয়েদের কাছে আমাদের পাইওনিয়র দলের আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে অনুরোধ করছি।'

খামোভ্নিকি মহল্লার ভাবী পাইওনিয়রদের উদ্দেশে ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়া মহল্লার পাইওনিয়ররা তিনবার জয়ধ্বনি করল।

৩৮

মনের পটে

পাইওনিয়র ক্লাবের অতিথি হয়ে ছেলেরা বেশ আনন্দেই প্রায় সারাটা দিন কাটিয়ে দিল। যা কিছু দেখল ওরা, সবই ওদের ভালো লাগল, সন্ধ্যের সময় সাদোভায়া স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফেরার সময়ও মন ওদের ভরপুর হয়ে রইল।

গেঙ্কা হাত নাড়িয়ে বলছিল, ' "পাইওনিয়ররা স্বাস্থ্যবান আর শক্তিমান" — ওদের এ নিয়মটা সত্যিই একটা নিয়মের মতো নিয়ম বটে। চমৎকার নিয়ম! আমায় আরো ব্যায়াম করতে হবে, মাস্ল্গুলো শক্ত করা দরকার।'

স্লাভা মন্তব্য করল, 'ওর চেয়েও বেশি দরকারী নিয়ম ওদের আছে।'

'আছে নাকি? কী কী বল্ তো শুনি।' গেঙ্কা পালটা জেরা করল।

'বেশ। এই যেমন ধর্: "পাইওনিয়ররা জ্ঞানপিপাসু। শ্রমিকদের লক্ষ্যসাধনের সংগ্রামে জ্ঞান ও সামর্থ্যই প্রকৃত শক্তি"।'

'ওইটাকে তুই বেশি জরুরি মনে করিস নাকি? তাহলে দেখছি তোর দৌড় ওই পর্যন্তই! দুর্বল হলে বুর্জোয়ারা যে দেখতে দেখতে সব সাবাড় করে দেবে রে, তখন সারা দুনিয়ার জ্ঞান দিয়েও কিচ্ছু সুবিধে হবে না। তাই না রে মিশা?'

মিশা মুরুব্বি চালে বলল, 'ওদের দুটো নিয়ম হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী। প্রথমটা হল: "শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্যের প্রতি পাইওনিয়ররা অনুগত" আর দু' নম্বর হল: "পাইওনিয়ররা নির্ভীক, অধ্যবসায়ী, কখনো তারা নিরুৎসাহ হয় না"। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল লেনিন যা বলেছেন। শুনেছিলি সেই যে

পাইওনিয়রদের নেতা পড়ে শোনাল? "শিশুরা হল ভাবীকালের শ্রমজীবী, তাদের কর্তব্য বিপ্লবের কাজে সাহায্য করা"। এইটেই হল সবচেয়ে আসল জিনিস।'

স্লাভা বলল, 'আর সেই ছাপাখানার চৌকিদারটা কেমনভাবে ওদের কথা বলছিল লক্ষ্য করেছিলি? রীতিমতো সম্মান করে।'

'তাই তো হবে।' মিশা বলল, 'ওদের নিজেদের ছাপাখানার কথা বাদ দে, গোটা তল্লাটেই তো ওদের নাম ডাক। আমাদের দলটা গড়া হলে আমরা উপদলগুলোর অন্যরকমের নাম দেব। বিপ্লবী নাম হলে সবচেয়ে খাসা হয়— যেমন ধর্ 'কার্ল লিব্নেখ্ট্'* কিংবা 'স্পার্টাকাস'**। ওইসব জন্তুজানোয়ারের নামের চেয়ে সে অনেক ভালো হবে। ওগুলো তো নেহাৎ ছেলেমানুষি।'

গেঙ্কা ফোঁড়ন দিল, 'এ তো আর তোর নিজের মাথা থেকে বেরোয়নি। ওরাও তো নিজেদের নাম বদলাতে চাইছে। ওদের নেতা যে বলল শুনিসনি?'

'তা জানি, তবে আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম, যখন সেই জানোয়ারের প্রতীকগুলো দেখি, তখুনি। আর শুনেছিস তো ওদের নেতা বলল আন্তর্জাতিক যুব দিবসে ওরা সেরা সেরা পাইওনিয়রদের কমসমোলে পাঠাবে? বিশ্বাস করতে পারিস? ওই কটা-চুলো ছোকরাটা কিনা কমসমোলে ঢুকে যাবে অথচ আমরা এখনো পাইওনিয়রই হতে পারলাম না!'

'ওঃ, ওই ছেলেটা! ওকে আচ্ছামতো ধোলাই দেওয়া দরকার।' গজ্গজ্ করে উঠল গেঙ্কা।

'কী জন্য শুনি?' আপত্তি তুলল মিশা, 'ওরা তো নিজেদের পতাকা বাঁচাবার চেষ্টাই করছিল। কেমন করে জানবে আমরা কে? কটা-চুলো ছেলেটার যাহোক্ বেশ লড়িয়ে মেজাজ আছে।'

---

* কার্ল লিব্নেখ্ট্ (১৮৭১-১৯১৯)—জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা।

** স্পার্টাকাস—খৃঃ পূঃ ৭৪-৭১ সনে রোমে ক্রীতদাসদের যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয় তার নায়ক ছিলেন ইনি।

স্লাভা বলল, 'এবার আমাদের গজ্‌নাক কারখানায় যেতে হবে। হয়তো ওখানকার দলে আমাদের যোগ দিতে দেবে ওরা, কিংবা বলে দেবে কোথায় পাইওনিয়র ভবন গড়া হচ্ছে।'

মিশা প্রতিবাদ করল, 'আমাদের নিজেদেরই যখন কারখানা রয়েছে ওখানে আমরা যাব কেন? শুনলি না ওদের নেতা বলল সমস্ত কলে-কারখানায় দল গড়া হবে এবার? এ সম্পর্কে কমসমোল একটা সিদ্ধান্তই নিয়েছে।'

গেঙ্কা শিস্‌ কাটল, 'ফুঃ! এখন সব কাজের জন্য খালি বসে বসে ধর্না দে আমাদের পরিচালক আর তার বাবার দরজায়!' স্লাভার দিকে হাত নেড়ে বলল, 'পিসিমা বলেন ওরা টাকা পয়সার ব্যাপারে হাড়কেপ্‌পন।'

স্লাভা রাগ করে বলল, 'তুই তো কেবল যা জানিস না তাই নিয়ে বক্‌বক্‌ করিস। অনেকগুলো কলঘর এখনও চালু হচ্ছে না, অথচ কারখানাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারখানা চালানো বড়ো চাট্টিখানি কথা নয়।'

মিশা বলল, 'আমাদের যেতে হবে পার্টি সেলে, আর পার্টি জেলা কমিটির কাছে। এই ফাঁকে একবার জুর্‌বিনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেবার যখন শেষ দেখা হয় উনি পাইওনিয়রদের কথা বলেছিলেন।'

তিন বন্ধু বাড়ির কাছাকাছি আসতে ওরা পেছনের আঙিনা থেকে একটা হৈ-হট্টগোলের আওয়াজ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে দেখল করোভিনকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এক দঙ্গল ছেলে। করোভিন পেছনের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ফাঁদে পড়া নেকড়ের বাচ্চার মতো বুনো চোখে তাকিয়ে দেখছে প্রত্যেককে।

বর্‌কা ফিলিন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'কেন এসেছিস এখানে, অ্যাঁ?' চেঁচাতে লাগল ও, 'চুরি করতে? অ্যাঁ? আরে, বল্‌ না! চুরি করতে? দে না ঠুকে সবাই মিলে!'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল মিশা। বাউণ্ডুলে ছোকরাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও।

‘ওকে ছেড়ে দিচ্ছিস না কেন?’ বলল মিশা, ‘একজন লোকের পেছনে গোটা দঙ্গল লেগেছে! তোর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে বর্‌কা!’

গেঙ্কা বলল, ‘ছেড়ে দে রে মিশা। এই ছোকরাই তো তোর পয়সা চুরি করেছিল! ওকে বাঁচাচ্ছিস কেন? ওরা সবাই এক জাতের — এই রাস্তার ছোঁড়াগুলো ... সেরেফ্‌ খুদে চোর, আর কিচ্ছু নয়!’ তাচ্ছিল্য করে শেষ কথাটুকু জুড়ে দিল গেঙ্কা।

হঠাৎ নাক সিঁটকে বলে উঠল করোভিন, ‘চোর তুই নিজে, লাল মুণ্ডওয়ালা চোট্টা!’

এ কথায় সবাই একেবারে হো হো করে হেসে উঠল।

মিশা বলল, ‘আয়, আয়, ক্লাবে আয় আমাদের সঙ্গে।’

ছেলেটার আস্তিন ধরে টানল মিশা, কিন্তু তক্ষুনি আবার ছেড়ে দিল, মনে পড়ল করোভিনের আস্তিন কেমন ফস্‌ করে খুলে গিয়েছিল সেবার।

গেঙ্কার দিকে অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল ছেলেটা, ‘আমি যাব না।’

হঠাৎ বর্‌কা মাঝখানে পড়ে বলল, ‘ঠিক কথা। তুই এখানেই থাক্‌ রে ভাই। আমার সঙ্গে পয়সা মারা খেলবি।’

ছেলেটাকে টানতে টানতে মিশা আবার বলল, ‘আয়, আয়। ওসব চালাকি ছেড়ে দিয়ে আয় তো।’

৩৯

শিল্পী

নাট্যচক্রের দলবল ক্লাবঘরে সিনারি আঁকছিল — ওদের সর্দার হল ধেড়ে শুরা। স্টেজের ওপর লম্বা লম্বা সাদা কাগজের বড় ফালি পড়ে আছে। ছিঁচকাঁদুনে খুদে ভভ্‌কা বারানভ বৃথাই চেষ্টা করছিল

চমৎকার একটা চাষীর কুটির আঁকতে — কুলাক পাখোমভের বাড়ি বোঝাতে হবে।

শুরা ধমকাল, 'এই হতভাগা ছিঁচকাঁদুনে, এই! একটা সাধারণ কুঁড়েঘরও আঁকতে পারছিস না, অ্যাঁ? আর তুই কিনা শিল্পীর ছেলে!'

ছিঁচকাঁদুনেও পালটা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? আমার বাবা আমার বাবা, আমি আমি, ব্যস্।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে করোভিন স্কেচ্টা একবার দেখেই একটুকরো কাঠকয়লা তুলে নিয়ে আঁকতে শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে উনোন, জানলা আর লম্বা বেঞ্চিগুলোর রেখা ফুটে উঠতে লাগল সাদা কাগজের ওপর।

গেঙ্কাকে কনুই দিয়ে ঠেলে মিশা বলল, 'দেখছিস তো?'

'এ আর এমন কি!' সশ্লেষে লাল চুলগুলো ঝাঁকিয়ে গেঙ্কা বলল, 'আঁকতে পারে এর মধ্যে কিছুই কৃতিত্ব নেই। কেন যে ওকে নিয়ে তুই মাথা ঘামাস।'

মিশা ধমক দিল, 'ছাড়্ দিকি ওসব! আমাদের প্রত্যেকে যদি একজন করে বাউণ্ডুলে ছেলেকে ঠিক পথে নিয়ে আসত, তাহলে আর রাস্তায় কেউ ঘুরে বেড়াত না।'

করোভিন ছবিটা শেষ করে যেন নিজের মনেই বলল, 'তুলিগুলো সব পচা!'

শুরা ওকে আরো কতগুলো দিল, কিন্তু সেগুলোও সে নিতে চাইল না।

'অন্য জিনিস চাই।'

মিশা পকেট থেকে লটারির বাদবাকি পয়সাগুলো ঝেড়েঝুড়ে বের করে এগিয়ে দিল করোভিনের দিকে।

'এই নে, ঠিক জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আয়।'

করোভিন পয়সা না নিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল মিশার দিকে।

মিশা বলল, 'যা না রে, কিনে আন্ গে। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কী?'

খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে করোভিন পয়সা নিল, ছেলেদের দিকে একবার নীরবে তাকিয়ে ক্লাবঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ফুঃ!' গেঙ্কা শিস দিল, 'আমাদের পয়সাটা এবার গেল আর কি!'

শুরা জানিয়ে দিল, 'দ্যাখ্, আমাদের পয়সা যদি এভাবে চারধারে বিলোতে থাকিস তাহলে আমি বাবা থিয়েটারের দায়িত্ব ছেড়ে দেব।'

মিশা বলল, 'না জেনেশুনেই খেপে উঠে মাথা গরম করিসনে। আগে সবুর কর, ফিরে আসুক।'

মহা দুশ্চিন্তায় অপেক্ষা করতে থাকে ছেলেরা। ক্লাবঘরে বড়োরা আসতে শুরু করেছে অথচ করোভিনের কোনো পাত্তাই নেই।

মিশা ভাবনায় পড়ল, 'ঠকাল নাকি ছেলেটা?' কিন্তু তারপরেই মনে হয় পয়সাটা নেবার সময় করোভিন কীভাবে ওর দিকে চেয়েছিল। 'না, না। ও ঠিক ফিরে আসবে।'

কিন্তু তবু করোভিনের আসার কোনো লক্ষণ নেই।

শুরা বলল, 'আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। এই ছিঁচকাঁদুনে, নে ধর, শেষ করে দে কাজটা।'

ভভ্কা রঙ গুলতে শুরু করেছে এমন সময় হঠাৎ ক্লাবঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল করোভিন। ও একা নয়। বব্ করা কালো চুলওয়ালা লম্বা কাল্চেপানা একটি মেয়ে ওর কাঁধ ধরে ঠেলে নিয়ে আসছে। মেয়েটার পরনে নীল স্কার্ট আর খাকি কোর্তা, পাতলা কোমরে চওড়া ফৌজী পেটি বাঁধা। কিন্তু ওর পোশাকের সবচেয়ে লক্ষ্য করবার জিনিস হল একটা লাল টাই, খাঁটি পাইওনিয়র টাই। এক হাতে করোভিনের কাঁধটা সজোরে চেপে ধরেছে, অন্য হাতে আঁকার তুলি-বুরুশের একটা বাণ্ডিল। দেখে মনে হল মেয়েটা যেন খুব দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছে।

ছেলেদের কাছে এগিয়ে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওকে তুলি আনতে পাঠিয়েছিল কে?' করোভিনকে চেপে ধরে রেখেছে আগের মতোই।

মিশা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, 'আমি। কেন?'

'তুলি দিয়ে কী করবে তোমরা?'

'থিয়েটারের সিনারি আঁকছি।'

করোভিনকে ছেড়ে দিল মেয়েটা। স্টেজের কাছে এগিয়ে গিয়ে সিনারিটা দেখল।

'কী নাটক দেখাচ্ছ?'

ধেড়ে শুরা সামনে এগিয়ে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলল, '"কুলাক আর খেতমজুর"। আমার পরিচয়টাও এই সঙ্গে দিচ্ছি: শুরা অগুরেয়েভ। শিল্প নির্দেশক, স্টেজ ম্যানেজার।' হাত বাড়িয়ে দিল শুরা।

কেতামাফিক করমর্দন করতে গিয়ে মেয়েটি হাসল।

'আমি ভালিয়া ইভানোভা। পাড়ার ইয়ং পাইওনিয়র ভবন থেকে এসেছি।'

শুরা গভীরভাবে বলল, 'কী গোলমাল হয়েছে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

মেয়েটার গলার স্বর আবার কঠিন হয়ে উঠল, 'ঘটনাটা হল, আমরা বাউন্ডুলে ছেলেদের চুরি চামারি বন্ধ করার চেষ্টা করছি, অথচ এদিকে তোমরা চুরি করতে শেখাচ্ছ। এই ছেলেটা এসে আমাদের রঙের তুলি চুরি করছিল।'

করোভিন বিড়বিড় করে বলল, 'আমি চুরি করিনি। আমি তো ধার করেছি ওগুলো।'

মিশা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মেয়েটার দিকে। সতেরোর বেশি বয়েস মনে হয় না অথচ এর মধ্যেই পাইওনিয়রদের নেতা হয়ে গেছে, ইয়ং পাইওনিয়র ভবনে কাজ করছে!

অবিশ্বাসের সুরে ও বলল, 'তোমাদের সেই সংঘটা কোথায়?'

'দেভিচিয়ে পলিয়ে-তে।' ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, 'সত্যি বলতে কি, সবে গড়ে তোলা হচ্ছে সংঘটা। কিন্তু তোমাদের এই চক্রটা কিসের বলো তো? কে তোমাদের পরিচালক? কোন্ সংগঠনের ভেতর আছ তোমরা?'

গেঙ্কা চড়া গলায় বলল, 'বাড়ি কমিটির ভেতর!'

'সত্যি!' হাসল মেয়েটা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়ং পাইওনিয়রদের কথা শুনেছ তোমরা?'

মিশা, গেঙকা আর স্লাভা একসঙ্গে বলে উঠল 'হ্যাঁ', কিন্তু আর সকলে এত জোরে 'না, জানি না' বলে উঠল যে ওদের গলার আওয়াজ ডুবেই গেল।

'উহঃ, অতো জোরে নয়!' হাত তুলে বলে উঠল মেয়েটি। সবাই চুপ করতে এবার সে বলতে লাগল, 'পাইওনিয়ররা হল কমসমোলদের উত্তরাধিকারী। সমস্ত ছেলেই এখন পাইওনিয়র দলে যোগ দিচ্ছে আর সেখান থেকেই তারা ভবিষ্যতের কমসমোল সভ্য হবার শিক্ষা পাচ্ছে, পরে তারা সত্যিকারের কমিউনিস্ট হবে।' ছেলেদের দিকে দুষ্টুমি করে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'তোমরা বোধহয় ভেবেছিলে আমি রঙের তুলিগুলোর জন্যই এসেছি? না। আমি তো ওগুলো অনায়াসেই ওর কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু ও বলল কোন্ এক নাট্যচক্রের জন্য নাকি ওগুলো নিয়েছে। তাই একবার নিজের চোখে দেখবার ইচ্ছে হল ব্যাপারখানা।'

'দেখবার মতোই বটে আমরা!' গেঙকা চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর হাসির হররাটা কমতেই ও ফের জুড়ে দিল আরেকটা কথা:

'আমরা পাইওনিয়রও হব!'

'নিশ্চয়।' বলল মেয়েটি, 'তোমাদের ক্লাবের খবর আমি নেব, কেমন করে সাহায্য করা যায় দেখব। এর মধ্যে একদিন এসো না আমাদের ইয়ং পাইওনিয়র ভবনে? আমরা তো অনেক কারখানা আর চক্র গড়ে তুলছি। আসবে কিন্তু ঠিক। তুলিগুলোও সেদিন ফেরৎ দিয়ে আসতে পারো। তোমাদের নেতা কে?'

মিশাকে সামনে ঠেলে দিল গেঙকা।

বলল, 'এই যে আমাদের সভাপতি।'

'বেশ,' মিশার দিকে তারিফ করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল মেয়েটি, 'তুলিগুলোর জন্য তুমিই দায়ী রইলে। তোমার দলবল নিয়ে একদিন এসো আমাদের ওখানে। ভুলো না যেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল মিশা, 'আর আপনিও আমাদের অভিনয় দেখতে আসবেন রোববারে।'

মেয়েটি চলে যেতেই করোভিন মিশাকে পয়সাটা ফিরিয়ে দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করল।

'দোকানে গেলি না কেন তুলি কিনতে?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'নেহাৎ বাজে পয়সা খরচা হত!' গেঙ্কার দিকে একবার তাকিয়ে করোভিন বলল, 'আমার নিজের জন্য তো আর করিনি কাজটা!'

গেঙ্কা ব্যঙ্গ করে বলল, 'জিনিসের দাম দেওয়ার অভ্যেস তো ওর নেই!' তারপর একটু নরম গলায় বলল, 'ব্যস্, এখন আঁকতে শুরু কর্ দিকি।'

৪০

ঝানু গোয়েন্দা

'ওই যে যাচ্ছে!' স্লাভাকে গুঁতো দিয়ে ফিস্ফিস্ করে বলল গেঙ্কা, 'আয় না দেখি!'

ফটকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফিলিন। নিকল্স্কি গলির ভেতর ঢুকে প্রেচিস্তেঙ্কা স্ট্রীটের দিকে চলল। ওর জন্য ওৎ পেতে ছিল গেঙ্কা আর স্লাভা। এবার ওরা পেছু নিল। মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ওর হেলে দুলে চলার ভঙ্গিটা।

ফিস্ফিসিয়ে গেঙ্কা বলল, 'কেমন হাঁটছে দেখেছিস? নিশ্চয়ই এক সময় জাহাজে কাজ করেছিল। কেমন পা ফাঁক করে হাঁটছে দ্যাখ্, যেন জাহাজের ডেকের ওপর চলাফেরা করছে।'

স্লাভা তর্ক তুলল, 'আমি তো বাবা বেয়াড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ওরকম তো সবাই হাঁটে। তার ওপর উঁচু বুট পরেছে। জাহাজীরা সব সময় ঢোলা পাৎলুন পরে।'

'পাৎলুন-টাৎলুনের ব্যাপার নেই এখানে! সবুর কর্, যখন মোড় ঘুরবে তখন ওর মুখখানা চেয়ে দেখিস একবার। দেখবি ঠিক বীটের মতো

টকটকে লাল। পরিষ্কার বোঝা যায় জাহাজে থেকে থেকে রোদে জলে ওইরকম হয়েছে।'

স্লাভা স্বীকার করে নিল, 'তা মুখখানা সত্যিই লাল বটে। কিন্তু ফিলিন যে মদখোর তা তো জানিস। ভদ্‌কা খেলেও মুখ লাল হয়।'

গেঙ্কা গরম হয়ে বলল, 'আজ্ঞে না! ভদ্‌কাতে নাকটা লাল হয়, কিন্তু মুখখানা বেগুনে হয়ে ওঠে।'

স্লাভা বলতে থাকে, 'তা ছাড়া দ্যাখ, হাতদুটো পকেটে পোরা। খাঁটি জাহাজীরা কখ্‌খনো তা করে না। আসল জাহাজীরা সব সময় হাতদুটো দোলায়, কারণ জাহাজ চলার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে ওইরকম অভ্যেস দাঁড়িয়ে যায়।'

একেবারে চটে উঠে গেঙ্কা বলল, 'এসব কথা ছেড়ে দে। "হাতদুটো পকেটে পোরা!.." জানিস, জাহাজীরা ঝড়ের সময় পকেটে হাত গুঁজে মুখে পাইপ ধরে রাখাটা খুব হিম্মতের কাজ মনে করে? ব্যাপারটা তাই। তা ছাড়া তোর যদি বিশ্বাস না থাকে ফিলিনই সেই লোক, তাহলে তোর বাড়িতে থাকাই ভাল ছিল!'

আর কোনো কথাবার্তা না বলে দু'জন এগিয়ে চলল ফিলিনের পেছু পেছু। ফিলিন প্রেচিস্তেঙ্কা স্ট্রীট পার হয়ে এগিয়ে এসে ডাকটিকিটের দোকানের সামনে থামল। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

স্লাভা বলল, 'ওই তো বোঝাই গেল। আমাদের আর কিছু করার নেই এখন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গেঙ্কা বলল, 'চল্‌ দোকানের ভেতর ঢুকি।'

স্লাভা ওকে ধমক লাগাল, 'তোর লজ্জা হওয়া উচিত গেঙ্কা! আমরা ঠিক করেছিলাম ঢুকব না। আর মিশাও আমাদের নিষেধ করেছে ঢুকতে। বুড়োটা মিশাকে ভাগিয়ে দিয়েছিল, এবার আমাদেরও ভাগাবে।'

'না, ভাগাবে না। আমরা যদি ডাকটিকিট কিনি তাহলে কে ঠেকাবে শুনি? আয়, আয়।'

স্লাভা ওকে আটকাতে চেষ্টা করল কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গেঙকা এর মধ্যেই দৃঢ়ভাবে দরজাটা খুলে ফেলেছে। স্লাভাকেও ওর পেছন পেছন ঢুকতে হল ভেতরে।

বুড়ো ডাকটিকিটওয়ালা কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ফিলিনের সঙ্গে কথা বলছিল। ছেলেরা ঢুকতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই তোমাদের?'

গেঙকা বলল, 'স্ট্যাম্প দেখতে।'

'দেখবার মতো আর কিছু নেই। রোজই তোমরা আসো অথচ কিছু কেনো না। কী স্ট্যাম্প চাই বলো তো?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেঙকা চাপা গলায় বলল, 'গুয়াতেমালা।'

তাক থেকে একটা বাক্স নামাল বুড়ো। একখানা খাম বের করে ছুঁড়ে দিল কাউণ্টারের ওপর।

'ওই নাও, যা দরকার খুঁজে নাও।'

বেসামাল হয়ে গেঙকা স্ট্যাম্পগুলো হাতড়াতে থাকে। প্রত্যেকেই ওকে নীরবে লক্ষ্য করছে। শেষ অবধি আর সইতে না পেরে ও একটা স্ট্যাম্প দেখিয়ে বলে, 'এই যে, এইটা।'

ডাকটিকিটওয়ালা খামটা সরিয়ে নিল, গেঙকার বাছাই করা টিকিটটাই শুধু রেখে দিল কাউণ্টারে।

'কুড়ি কোপেক।'

গেঙকা অসহায়ভাবে স্লাভার দিকে তাকাল। স্লাভা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল গেঙকার পকেট ফাঁকা। কিন্তু ওর নিজেরও কিছু নেই।

বুড়ো লোকটা আর ফিলিন একদৃষ্টে চেয়ে রইল ছেলেদুটোর দিকে।

বুড়ো ফের বলল, 'হ্যাঁ, কুড়ি কোপেক।'

জবাব দেবার বদলে গেঙকা পেছন ফিরে সিধে দৌড়োল দোকান ছেড়ে। স্লাভাও ছুটল পেছন পেছন।

দৌড়ে রাস্তা পেরিয়েই ওরা হন্‌হন্‌ করে রওনা হল বাড়িমুখো।

'বললাম না যাসনে!' শুরু করল স্লাভা।

বেপরোয়া ভঙ্গিতে জবাব দিল গেঙ্কা, 'তাতে আর কি হয়েছে?'

'কী বলছিস রে তুই? ওরা তো এবার খুব ভালো করে আমাদের দেখে নিল, আর আমরা যে ওদের ওপর নজর রাখছি তাও বুঝতে পেরেছে।'

'ওরা কেমন করে জানবে? গণ্ডা গণ্ডা ছেলে পয়সা না নিয়েই দোকানে যায়।'

'সবুর কর্‌। খাবি মিশার কাছ থেকে একচোট।'

'ওর হুকুমে তো চলি না আমি!'

কারুর তোয়াক্কা করে না এমনি ভাব দেখাল গেঙ্কা, 'আমি কাকে গ্রাহ্যি করি?'

'মিশা কাউকে হুকুম করে না। কিন্তু ছোরাটা তো ওরই। তুই যতো বাজে বোকামো করে সব পণ্ড করে দিবি।'

'আমার কাজ আমি বুঝি!' মুখের ওপর জবাব দিল গেঙ্কা, 'আমারও নিজস্ব একটা ভাববার ক্ষমতা আছে।'

এতক্ষণে ওরা বাড়িতে এসে পেশছেছে। দেখে মিশা জুর্‌বিনের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে গেঙ্কা ডাকল, 'এই মিশা! তোর কিছু খবর আছে, শোন্‌!'

'কী খবর রে?'

'খুব ভালো!' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল গেঙ্কা, 'ফিলিনের পেছু নিয়েছিলাম। বুড়ো স্ট্যাম্পওয়ালাটার ওখানে গিয়েছিল ও। কী ভাবে হাঁটে সেটা লক্ষ্য করলাম। জাহাজী না হয়েই পারে না, জান কবুল করে বলতে পারি!'

মিশা বলল, 'দ্যাখ্‌ তাহলে! বলেছিলুম কিনা। আমারও সব খবর ভালো। জুর্‌বিনের সঙ্গে দেখা করলাম, তারপর গেলাম ইয়ং পাইওনিয়র ভবনে, কমসমোল বিভাগের সভাপতির সঙ্গে কথাও হল।'

'কী খবর পেলি?'

রহস্য করে জবাব দিল মিশা, 'সে রোববার দিনই দেখতে পাবি।'

'এখন বলতে পারবি না?'

'সময় হলেই দেখবি। সব ঠিক আছে। এখন আমাদের পাকাপাকিভাবে জেনে নিতে হবে ফিলিন কখনো যুদ্ধজাহাজে কাজ করেছিল কিনা। তারপর স্ট্যাম্পওয়ালার ব্যাপারটা দেখব। তবে ও কাজটা তোদেরই করতে হবে: আমাকে আর কখনো দোকানে ঢুকতে দেবে না বুড়ো।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল স্লাভা। এবার বলল, 'সে আর ভাবতে হবে না মিশা। আমাদেরও একাজ করতে হবে না।' অর্থপূর্ণভাবে একবার গেঙকার দিকে তাকাল ও।

'কেন?'

'কারণ আমাদেরও ঢুকতে দেবে না।'

হতভম্ব হয়ে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে চাইল মিশা। বলল, 'কেন দেবে না? কী হয়েছে রে?'

গেঙকাকে দেখিয়ে স্লাভা বলল, 'ও-ই বলুক।'

মুখ লাল করে গেঙকা বলেই ফেলল, 'বুঝলি মিশা, আমরা তো ফিলিনের পেছু নিয়েছিলাম কোথায় যায় তাই দেখব বলে। সে একটা গলির ভেতর ঢুকল, আমরাও ঢুকলাম। অস্তোজেঙ্কা ধরে সে এগিয়ে চলল, আমরাও চললাম। সে দোকানে ঢুকতে আমরা পেছন পেছন ভেতরে গেলাম। স্ট্যাম্পের দাম দেবার মতো পয়সা আমাদের ছিল না। তাই, ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে এলাম। ব্যস্ এই।'

মাথা নেড়ে টেনে টেনে বলল মিশা, 'হুঁ, বুঝলাম। তার মানে ধরা পড়ে গেছিস। কতোবার তোদের বারণ করলাম দোকানে যাবি না। আর এখন সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিলি, কারুরই আর যাওয়া চলবে না ওখানে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তুই সব পণ্ড করলি। প্রথমবার বরকাকে সেই বাক্সগুলোর কথা জানিয়ে দিয়েছিলি, আর এবার ঝামেলা বাধালি দোকানে।

তোর ওপর আমার আর ভরসা নেই। তোকে বাদ দিয়েই আমাদের চলতে হবে।'

এবার আর তর্ক তুলল না গেঙকা।ও জানে মিশার রাগ পড়বেই, ওকে বাদ দিয়ে কিছু তারা কখনোই করবে না।

৪১

অভিনয় উৎসব

ক্লাবের দরজার ওপর কদিন ধরেই একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে—'রবিবার ছোটদের জন্য তিন অঙ্কের নাটক "কুলাক আর খেতমজুর"।' আরো ঘোষণা রয়েছে: স্টুডিও পরিচালক—শুরা অগুরেয়েভ। স্টেজ ম্যানেজার—শুরা অগুরেয়েভ। প্রধান ভূমিকায়—শুরা অগুরেয়েভ। আর একেবারে নিচে খুদে হরফে লেখা রয়েছে: শিল্পী—শুরা অগুরেয়েভের পরিচালনায় মিখাইল করোভিন।

ঘোষণার মধ্যে নিজের নাম দেখে করোভিনের দারুণ গর্ব, রাস্তার ছেলেরা সবাই দল বেঁধে পড়েছে বিজ্ঞাপনটা।

অভিনয়ের অনেক আগে থেকে টিকিট বিক্রি হচ্ছিল। বিক্রির পয়সাকড়ি 'ইজভেস্তিয়া' খবরের কাগজের প্রকাশালয়ে নিয়ে এল ছেলেরা—ভোল্‌গা এলাকার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য রিলিফ তহবিলে জমা হবে।

রবিবার সকালে ক্লাবঘর ভরে গেল ছেলেমেয়েতে। হৈ- হট্টগোল, চেয়ারের পেছন বেয়ে ওঠা আর ঝগড়ায় মেতে উঠল সবাই। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকেও ছেলেপিলেরা এসেছে, আর করোভিন বাউণ্ডুলে ছেলের বড় দল নিয়ে এসেছে। খেলোয়াড় ইগর্ আর ইয়েলেনাও এসেছে—মিশা ওদের বসতে জায়গা দিয়েছে একেবারে সামনের সারিতে, স্লাভার জিম্মায় রেখে গেছে ওদের।

সবকিছু তৈরি হয়ে যাবার পর মিশা ছুটল জুর্বিনকে ডেকে আনবার জন্য। জুর্বিনের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখে ভালিয়া ইভানোভা, এবং আরেকজন তরুণ কমসমোল সভ্য রয়েছে সেখানে—ছেলেটির পরনে টুপি আর চামড়ার জ্যাকেট, পকেট থেকে এক বাণ্ডিল খবরের কাগজ বেরিয়ে আছে। জ্যাকেটের বোতাম খোলা, ভেতর থেকে একটা নীল রাশিয়ান কামিজ উঁকি দিচ্ছে, তাতে কমসমোল সভ্যদের ব্যাজ আঁটা।

মিশাকে দেখিয়ে জুর্বিন বললেন, 'ব্যাপারটা শুরু করেছিল এই ছেলেটিই।'

মিশার দিকে চেয়ে সৌহার্দের হাসি হেসে ভালিয়া মন্তব্য করল, 'আমাদের আগেই সাক্ষাৎ হয়েছে।'

ছোকরাটা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম নিকলাই সেভস্তিয়ানভ, বা সংক্ষেপে কেবল কোলিয়া।'

কথা বলতে বলতে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ছেলেটি মিশাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ছেলেটি ঢ্যাঙা, কাঁধদুটো একটু কুঁজো, টুপির নিচে থেকে এক গোছা হাল্কা শণরঙা চুল বেরিয়ে এসে ফ্যাকাশে কপালটার ওপর ঝুলে পড়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল মিশাকে যে ওর মনে হল যেন ধূসর, ক্লান্ত অথচ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো ওর ভেতর অবধি দেখে নিচ্ছে।

জুর্বিন বললেন, 'কমরেড সেভস্তিয়ানভ তোমাদের অভিনয় দেখতে চান। অভিনয়ের শেষে উনি একটা ঘোষণা করবেন।'

স্টেজের পর্দা ওঠার আগে ক্লাবের ম্যানেজার মিতিয়া সাখারভ একটা বক্তৃতা দিলেন। চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে সরিয়ে শুরু করলেন:

'কমরেডগণ!' দর্শকদের চেয়ে জুর্বিনকে উদ্দেশ করেই কথাগুলো বেশি করে বলা, 'এবার আপনারা আমাদের ক্লাবের শিশু নাট্যচক্রের অভিনয় দেখবেন।'

আবার চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিলেন উনি।

'অভিনয়ের জন্য আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে ওদের চক্রটিকে প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্যই দেওয়া হয়েছে, কারণ শিশুদের ভেতর কাজ করার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। আশা করি আমাদের খরচ-খরচা সবটুকুই উঠে আসবে। এবার আসুন, কমরেডগণ, আমরা অভিনেতাদের আহ্বান করি।' উনি হাততালি দিতেই সারা হলঘরটায় প্রচণ্ড হাততালি ফেটে পড়ল।

খুবই চমৎকার হল অভিনয়।

জিনা ক্লুগলোভার অভিনয়ে তো রীতিমতো সাড়াই পড়ে গিয়েছিল যখন শুরার পিঠের ওপর উনোনের খুঁচুনিটা দিয়ে সে প্রচণ্ড মার লাগাচ্ছিল। দেখে বাচ্চা ছেলেদের এমন ফুর্তি হল যে তারস্বরে তারা চেঁচাতে লাগল, 'লাগাও, জিনা, বেশ কষে দু'ঘা বসিয়ে দাও, হাঁ!' আর শুরাও খাঁটি অভিনেতার মতো মুখ বুজে ছিল, ব্যথা লাগছে অথচ একটুও বুঝতে দেয়নি।

অভিনয়ের শেষে অভিনেতারা সবাই মিলে নাচগান করল। ইগর্ আর ইয়েলেনা অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ করল নিজেদের একটা খেলা দেখিয়ে, ওদের সঙ্গে পিয়ানো সঙ্গত করল স্লাভা।

খেলার পর কোলিয়া সেভস্তিয়ানভ স্টেজে গিয়ে দাঁড়াল।

দর্শকদের মুখগুলো ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'তোমাদের সকলের ভালো লাগল তো?'

'হ্যাঁ!' একসঙ্গে জবাব দিল সবাই।

কোলিয়া বলল, 'তাহলেই দেখছ এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভোল্গা অঞ্চলে আমাদের ছোট ছোট বন্ধুদের সাহায্য করেছে। তোমরাই বলো ওরা ভালো কাজ করেছে কিনা?'

'হ্যাঁ!' ছেলেমেয়েরা আবার সমস্বরে জবাব দিল।

কোলিয়া বলে চলল, 'চমৎকার কথা। এবার আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন

করব,’ এক মুহূর্ত চুপ করল সে, দর্শকরা অপেক্ষা করতে লাগল, ‘এখন বলো দেখি তোমরা কখনো ইয়ং পাইওনিয়রদের নাম শুনেছ?’

গেঙ্কা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ!’

মিশা ওকে গুঁতো দিল।

‘চেঁচাসনে, থাম্! তুই হয়তো জানিস কিন্তু অন্যরা তো জানে না।’

হলের মধ্যে তুমুল কলরব উঠেছে। একদল ছেলে বলছে, ‘আমরা জানি’, অন্যরা বলছে, ‘না, জানিনে’। সবাই চাইছে চিৎকার করে অন্যদলকে বসিয়ে দিতে আর হলঘরের কয়েক জায়গায় শুরু হয়ে গেছে হাতাহাতি।

কোলিয়া হাত তুলে ওদের থামতে বলল। সবাই চুপ করতে সে ফের শুরু করল:

‘যেসব শিশুরা ইয়ং পাইওনিয়র হয়েছে তারাই বড়ো হয়ে কমসমোল সভ্য হবে। তাদের বাবা দাদারা যে কাজ আরম্ভ করে গেছেন সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে পাইওনিয়রদেরই — সে কাজ হল কমিউনিজম গড়ে তোলা। আমাদের মহল্লায় এইরকম তিনটে দল রয়েছে এখন: রবার কারখানায়, “লিভারস্” ওয়ার্কে এবং গজ্নাক ফ্যাক্টরিতে।’

মিশা বলল, ‘আমাদের এখানে হচ্ছে না কেন?’

‘সেই কথাটা নিয়েই তো তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। ছেলেমেয়েরা সবাই শোনো, আমাদের ফ্যাকটরি এই ক্লাবটাকে নিয়ে নিচ্ছে, আর ফ্যাকটরিতে আমরা একটা ইয়ং পাইওনিয়র দল গড়ে তুলতে যাচ্ছি।’

‘হুরা!’ চেঁচিয়ে উঠল গেঙ্কা, ‘আমরা পাইওনিয়র হব!’

আরো কিছু বলতে গিয়েছিল কিন্তু মিশা ওর পাঁজরায় একটা গুঁতো মারতেই ও চুপ করে গেল।

কোলিয়া বক্তব্য শেষ করল, ‘বোধহয় আর কিছু বলার নেই আমার। যারা যোগ দিতে চাও তারা আমার কাছে এসে এখুনি সই দিতে পার। আজই আমাদের প্রথম বৈঠক হবে।’

গেঙ্কা বিড়বিড় করে বলল, 'একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব ওঁকে।'

কান খাড়া করে মিশা বলল, 'কী?'

'বয়স্কাউটদের সঙ্গে মারামারি করার হুকুম আছে কিনা পাইওনিয়রদের?'

'আবার যতো বাজে প্রশ্ন!' চটে গিয়ে মিশা বলল, ' "কথা বলতে হবে তাই বলছি," তোর এই অভ্যেসটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। যখন মুখ খুলবি তখন একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলবি।'

চতুর্থ পর্ব

সতেরো নম্বর দল

৪২

পাইওনিয়র উপদলের ঘাঁটি

হাতুড়িটা একবার দুলিয়ে সামনে বাড়িয়ে ধরে গেঙ্কা বলল, 'পাইওনিয়ররা কাজ করে চট্‌পটে হাতে, গুছিয়ে।'

একটা কাঠের মইয়ের একেবারে ওপরের সিঁড়িটাতে দাঁড়িয়েছে গেঙ্কা। ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে পেরেক দিয়ে পোস্টার আঁটছে।

স্লাভা বলল, 'কথাটা ঠিক: "চট্‌পটে হাতে, গুছিয়ে"। এর মধ্যে তো তুই পুরো একটা ঘণ্টা নষ্ট করেছিস।' একহাতে মইটা ধরে অন্যহাতে পোস্টারের নিচের দিকটা চেপে রেখেছিল স্লাভা।

কারখানাটা এতদিনে এই প্রথম পুরো দমে কাজ করতে শুরু করেছে। সেই উপলক্ষ্যে এবার একটা উৎসবের আয়োজন করছে ক্লাব। ফারগাছের ডালের তৈরি মালাগুলো ছাদে ঝুলছে, মধ্যে মধ্যে রঙিন বাতি। ইয়ং পাইওনিয়র উপদলের জায়গায় শেষ বারের মতো একবার হাত বুলিয়ে নিচ্ছে। সবদিকে পাইনকাঠ, শিরীষ আঠা আর রঙের গন্ধ।

পাইওনিয়ররা প্রত্যেকেই নতুন খাকী উর্দি পরেছে। ওদের শপথ গ্রহণের সময় ফ্যাক্টরির কর্তৃপক্ষই দিয়েছিল ওগুলো। একটা পতাকা, একটা ড্রাম আর বিউগলও উপহার পেয়েছে ওরা।

ফ্যাক্টরির পরিচালক বলেছিলেন, 'ছেলেমেয়েরা শোনো। আমাদের দেশে এখন জুতো আর কাপড়ের অভাব, সবে ধ্বংসের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে দেশ, তবু তোমাদের জন্য আমরা সব করতে পারি। সে কথাটি মনে রেখো।'

গেঙ্কার কাজকর্ম লক্ষ্য করছিল মিশা। পোস্টারের আরেক দিকটা দেয়ালে আঁটার সময় বন্ধুকে সে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, 'নেমে আয় রে, অনেক বক্‌বক্‌ করেছিস!'

মই বেয়ে নেমে মিশা আর স্লাভার পাশে দাঁড়াল গেঙ্কা। তিনজনে মিলে এবার বেশ তৃপ্তির সঙ্গে নিজেদের কাজ দেখতে লাগল।

'লাল নৌবহর নামে ১ নং উপদল' লেখা একটা পাতলা কাঠের তক্তা উপদলের জায়গার মাঝখানটায় ঝোলানো রয়েছে। তক্তা কেটে অক্ষরগুলো বের করা হয়েছিল, পেছনে লাল কাগজ সাঁটা। তক্তার পেছনে একটা ইলেকট্রিক বাতি বসানো, লাল অক্ষরগুলোকে তাই জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। চমৎকার দাঁড়িয়েছে জিনিসটা।

গেঙ্কা বুক ফুলিয়ে বলল, 'কীরে, পছন্দ হচ্ছে? আর কারুর মাথায় এমন বুদ্ধিই আসেনি!'

অন্য উপদলগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখাল ও। সত্যিই অন্য উপদলগুলোর কারোই এমন আলোর হরফওয়ালা তক্তা নেই। ওদের জায়গাগুলো সাধারণভাবে সাজানো, ছবি, খবরের কাগজের কাটিং আর স্লোগান দিয়ে।

ঠিক এমনি সময় খুদে ভভ্‌কা বারানভ হাতে এক টিন রঙ নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। গেঙ্কার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে যাবার দাখিল। গেঙ্কা এক লাফে পাশে সরে গিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে নিজের আনকোরা জামাটার আস্তিন দেখতে লাগল — ছিঁচকাঁদুনেটা শেষে জামাটাতেই রঙ লাগিয়ে দিল নাকি? কিছু হয়নি অবিশ্যি।

গেঙ্কা চটেমটে বলল, 'হতভাগা ছিঁচকাঁদুনেটা! পাগলের মতো ছুটছে দ্যাখ্‌! জামাটা আরেকটু হলেই দিয়েছিল নষ্ট করে!' খুব আদর করে জামায় হাত বুলোতে লাগল গেঙ্কা। 'ফার্স্ট ক্লাস কাপড়টা!' জিভ চাটতে চাটতে বলল, 'কাপড়ের কারখানা বটে একটা! ওই রবার কারখানার ছেলেগুলো হাঁ করে চেয়ে দেখবে এমন জিনিস। ছেলেগুলো "রসায়নবিদ্‌" হচ্ছে, "রবারের মিস্তিরি" হচ্ছে বলে যখন জাঁক করে বেড়ায় তখন তো আমার শুনে দুঃখই হয় ... কপালে যখন রবারের আলখাল্লা জুটবে তখনই ওদের "রবার মিস্তিরি" হবার শখ মিটে যাবে।'

কোলিয়া সেভস্তিয়ানভ এসে যোগ দিল।

গেঙ্কা বলল, 'এই যে কোলিয়া, দ্যাখো। খুব চমৎকার হয়েছে না? ওদের সক্কলের চেয়ে ভালো!'

কোলিয়া নিস্পৃহভাবে জবাব দিল, 'মন্দ নয়। গর্ব করার কী আছে এতে। অন্য উপদলের ছেলেমেয়েদের চেয়ে তোমরা বয়েসে বড়ো, তোমাদের সাজানোটাও তাই সবচেয়ে ভালো হতে হবে।' মিশার দিকে ফিরে বলল, 'পলিয়াকোভ!'

'আজ্ঞে?' মিশা জবাব দিল।

'চট করে তোমার উপদলটাকে নিয়ে খেলার মাঠে এসো তো। করোভিন তার দলবল নিয়ে ওখানে রয়েছে।'

'বেশ!'

কোলিয়া আবার বলল, 'আর মনে রেখো প্রথমবারের সাক্ষাৎটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি মিতালি করে ফেলতে পারো তাহলে ওরা রোজই আসবে আমাদের এখানে। আর তা যদি না পারো কোনোদিনই আসবে না। মেলামেশা করো। প্রথমে চেষ্টা করো তোমাদের খেলাধুলোর মধ্যে টেনে আনতে। বুঝতে পেরেছ? বেশ, এবার চলে যাও!'

মিশা হাঁক দিল, 'লাল নৌবহর উপদল! সারি বেঁধে দাঁড়াও!'

৪৩

খেলার মাঠ

উপদলের ছেলেমেয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াল। দলের বড়ো বড়ো ছেলেদের নিয়ে ওদের গ্রুপটা। মিশা ওদের উপদলের নেতা, আর আছে স্লাভা, গেঙ্কা, শুরা, জিনা ক্রুগ্‌লোভা এবং আশেপাশের বাড়িগুলোর আরো কয়েকটি ছেলেপিলে।

সারি না ভেঙে ওরা খেলার মাঠের দিকে ছুটল। পেছনের আঙিনাটার নাম হয়েছে এখন খেলার মাঠ। শুধু একটা ভলিবলের নেট্ টাঙানো, নতুন কিছু পরিবর্তন অবিশ্যি হয়নি।

বাড়ির কাছে অ্যাস্‌ফাল্‌টের ওপর গুটি দশেক বাউণ্ডুলে ছেলে দল পাকিয়ে বসে আছে। কয়েকজন সিগারেট ফুঁকছে। সকলেরই ছন্নছাড়া নোংরা চেহারা, চুলগুলো লম্বা, উশ্‌কোখুশ্‌কো। একজনের মাথায় শুধু একটা নতুন ধূসর রঙের টুপি। আজই নিশ্চয় জোগাড় করেছে ওটা। চুপচাপ বসে ওরা মাঝে মাঝে এটা সেটা টিপ্পনি কাটছে। অন্য ছেলেপিলেরা যে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে চলেছে সেদিকে ওদের কোনো নজরই নেই।

পাইওনিয়ররা আঙিনায় এসেই দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। আগে থেকেই সেটা বন্দোবস্ত করা ছিল। তারা গেল ভলিবল খেলার মাঠে।

মিশা হেঁকে বলল, 'আরো ছ'জন খেলুড়ে চাই!' রাস্তার ছেলেগুলোকে এইভাবেই খেলায় নিতে চেষ্টা করল ও।

ওরা কিন্তু নড়ল না। পাইওনিয়ররা খেলতে শুরু করল, ওরা কিন্তু আগের মতোই চুপচাপ বসে রইল। খেলায়, আশেপাশের কোনো কিছুতেই তাদের কোনো উৎসাহ নেই।

ফিস্‌ফিস্‌ করে মিশাকে গেঙ্কা বলল, 'ভবি ভুলবার নয়!'

জবাব না দিয়ে মিশা বল্‌ ছুঁড়ল, লম্বা এক মার দিয়ে ছেলেগুলোর দলের ভেতর সিধে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। অলসভাবে লাথি মেরে বল্‌টাকে ফিরিয়ে দিল করোভিন।

মহা উৎসাহে খেলতে থাকে পাইওনিয়ররা, প্রতি মুহূর্তে হাঁক পাড়ে, 'এদিকে ঠেলে দে', 'তোর মার', 'সোজা মেরে দে', 'চাপ্‌', 'ক্যান্ডেল্‌', 'ঘুষিয়ে', 'ফস্কে গেল' কিন্তু বাউণ্ডুলে ছেলেগুলো তবু নড়ে না। কেউ কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে এর মধ্যেই রোদের জন্য চোখ বুজে ঝিমুতে শুরু করেছে।

মিশা ভাবল, 'নিশ্চয় আমাদের দৌড় কতদূর বুঝবার চেষ্টা করছে। চট্‌ করে টেনে আনা যাবে না। তবু ভয় হচ্ছে কেটে পড়বে এখান থেকে।'

মিশা হুইস্‌ল্‌ বাজাতেই খেলা থেমে গেল। মেয়েরা মাঠের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেরা এসে বাউণ্ডুলে ছোঁড়াগুলোর পাশে বসল।

মিশা শুরু করল, 'করোভিন যে! কেমন চলছে, মিতে?'

করোভিন গাঁইগুঁই করে জবাব দিল, 'মন্দ না।'

'ঐ দাণ্ডাটা কিসের রে?' হঠাৎ একটি ছোকরা জিজ্ঞেস করে বসল। দুটো গাছের ওপর একটা জলের পাইপ বসিয়ে 'হরাইজণ্টাল বার' বানানো হয়েছে, সেইদিকে আঙুল দেখাল সে। ছোকরার মুখের ওপর এত বেশি মেচেতার দাগ যে পুরু ময়লার আস্তরেও তা ঢাকা পড়েনি।

মিশা খুব উৎসাহের সঙ্গে বুঝিয়ে বলল, 'ওটা হল হরাইজণ্টাল বার।'

'কী হয় ওটা দিয়ে?'

'এই দ্যাখ্ তাহলে, দেখিয়ে দিচ্ছি!' বারটার কাছে গিয়ে মিশা দুহাতে ভর দিয়ে ওপরে উঠে, তারপর ঝুলে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। 'করতে পারবি তুই এরকম?'

ছেলেটা জবাব দিল, 'জানি না, করে দেখিনি তো কখনো।'

মিশা ডাকল, 'আয় না একবার, চেষ্টা কর্।'

'কেন পারব না? মনে হয় পারব ...'

ছেলেটা অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে হেলেদুলে এগিয়ে গেল বারের কাছে। মিনিটখানেক ওটা দেখল আর সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ল। তারপর লাফ দিয়ে ধরে উঠে হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। গায়ের কোটখানা মাথার ওপর নেমে এল, শূন্যে ঝুলতে লাগল নোংরা একজোড়া খালি পা, কিন্তু তবু ও দাঁড়াল ঠিকই।

তারপরেই লাফিয়ে নিচে নেমে ও আবার হেলেদুলে নিজের জায়গায় ফিরে বসল। ছোকরাগুলো দাঁত বার করে হেসে বিদ্রূপভরা চোখে পাইওনিয়রদের দিকে তাকাল।

মিশা বলল, 'সাবাস্, বেড়ে হয়েছে! আমাদের মধ্যে কেউ পারবে না। এই গেঙ্কা! তুই একবার দ্যাখা না।'

গেঙ্কা জবাব দিল, 'আমি না, বাবা, আমি পারব না।'

মিশা সাধাসাধি করল, 'যা না, যা। চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই।'

বারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল গেঙ্কা। মাথা উঁচু করে হাতদুটো ওপরে তুলল। তারপর একটু কুঁজো হয়েই দিল এক লাফ। পাদুটোকে একেবারে টান টান করে বার ধরে দুলতে থাকল ও।

ক্রমেই জোরে জোরে দুলতে দুলতে হঠাৎ ও হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আবার বারের ওপর দিয়েই ডিগবাজি খেয়ে দ্বিতীয়বার হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর তৃতীয়বার! জোরে জোরে পাক খাচ্ছে, ওর লাল টাইখানা বাতাসে উড়ছে। আস্তে আস্তে ডিগবাজি কমে এল, শেষ পর্যন্ত ধপ্ করে নেমে পড়ল মাটিতে।

করোভিন বলল, 'মন্দ হয়নি।'

মিশা বুঝিয়ে দিল, 'এটাকে বলে "সূর্য পাক দেওয়া"।'

টুপি-পরা ছোকরাটা বলল, 'ও দিয়ে আমাদের কী দরকার?'

ধেড়ে শুরা হঠাৎ তাদের কথায় বাধা দিল, 'কাজে লাগতেও তো পারে। সবকিছুই আমাদের করতে শিখতে হবে, জানতে হবে।' মুরুব্বি চালে বলল ও।

'ওরে, সেই "কুলাক" বুঝি?' খিলখিল করে হেসে উঠল খুদে ছেলেটা, 'উনুনের খুঁচুনি দিয়ে জব্বর ঘা কষিয়েছিল তোর পাৎলুনে।'

শুরা বলল, 'তাতে কি! খাঁটি অভিনেতাকে সব কিছুই অভ্যেস করে নিতে হয়। ত্যাগস্বীকার না করলে আর্ট হয় না।'

টুপি-পরা ছেলেটা সায় দিল, 'তা ঠিক। বাজিকর লাজারেঙ্কোর তো সব সময় ঘাড় ভাঙার ভয়, তবু দ্যাখ্ সমানে লাফ ঝাঁপ করে।'

মেচেতাওয়ালা ছেলেটাও সেই সঙ্গে ফোঁড়ন দিল, 'আর সার্কাসেও ওরা কতো উঁচুতে ডিগবাজি খায়, অথচ ভয় পায় না একটুও।'

এইভাবেই শুরু হল। ধেড়ে শুরাটাই সূত্রপাত করে আলোচনার। 'ব্রিগেড সেনাপতি ইভানোভ' নামে নতুন ফিল্ম্‌টার কথা সবে তুলেছে এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ওদের অমন চমৎকারভাবে জমে-ওঠা আলাপে ছেদ পড়ল।

৪৪

য়ুরার বাইসিক্‌ল

স্কাউট য়ুরা আর বর্‌কা এসে হাজির হল আঙিনায়। আর ওদের আসাটাও একটা দেখবার মতো দৃশ্য বটে। এসেছে বাইসিকেলে চেপে। লেডিজ সাইকেল হলেও একেবারে খাঁটি, দু'চাকাওয়ালা আনকোরা নতুন সাইকেল। পেছনের চাকার ওপর একটা রঙ-চঙে সিল্কের নেট।

য়ুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করছিল আর বর্কা বসেছিল সীটে, পা দুটো রেখেছে বেজায় ফাঁক করে, মুখে আকর্ণবিস্তৃত বিজয়ীর হাসি।

আঙিনার চারদিকে পাক খেল ওরা। তারপর বর্কা নেমে গেল কিন্তু য়ুরা একাই চালাতে লাগল। নানা রকম কায়দায় সাইকেল চড়ার খেল্ দেখাতে থাকল সে।

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে, সীটের ওপর হাঁটু মুড়ে, তারপর দুটো হাত হাতলে আর একটা পা সীটে রেখে অন্য পাটা শূন্যে তুলে, তারপর এক পায়ে প্যাডেল করে ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো তড়াক করে লাফ দিয়ে নেমে ও অনেক খেলাই দেখাল। এদিকে এসব চলছে আর ওদিকে বর্কা তখন সকলের নজর টানতে চেষ্টা করছে য়ুরার দিকে। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, 'দেখেছিস, দেখেছিস, সাবাশ! ঠিক হ্যায়! দেখিয়ে দে রে য়ুরা!' উৎসাহের চোটে পাৎলুন চাপড়াচ্ছে আর শূন্যে টুপি ছুঁড়ছে।

সকলের চোখ এখন য়ুরার দিকে। পাইওনিয়র আর বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোর কথাবার্তায় বাধা পড়ল।

মিশা ভাবল, 'নিশ্চয় ওরা ইচ্ছে করেই করছে এসব, আমাদের কাজে বাদ সাধবার মতলব।'

গেঙ্কা ফিস্ফিস্ করে বুদ্ধি দিল, 'আয় না ওদের মজা দেখিয়ে দি।'

কিন্তু মিশা ওকে সরিয়ে দেয়। মারামারি বাধিয়ে লাভ নেই—তাতে সব ভণ্ডুলই হয়ে যাবে মাঝখান থেকে।

মনে দারুণ উত্তেজনা নিয়ে একটা উপায় বের করার কথা ও ভাবছে এমন সময় হঠাৎ দেখে য়ুরার বাবা ডাক্তার স্তোৎস্কি ফটকের কাছেই

দাঁড়িয়ে। মিশা য়ুরার দিকে তাকায়—না, বাবাকে এখনো দেখতে পায়নি ও। বাড়ির কোণটার দিকে দাঁড়িয়ে সাইকেলের চেন পরাচ্ছে, বর্‌কা সাহায্য করছে ওকে।

মিশা হাঁকল, 'এই য়ুরা-আ-আ! এদিকে আয়!' য়ুরার বাপকে ইশারা করে দেখিয়ে ও গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল।

য়ুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে তাকাল মিশার দিকে।

মিশা আবার হাঁকল, 'আয়, ভয় পাস না।'

কোনো কিছু ঠিক করতে না পেরে সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে য়ুরা।

মিশা সাইকেলটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা কী সাইকেল রে?'

'রয়াল এনফিল্‌ড।'

‘ও, রয়াল এনফিল্ড্!’ সাইকেলের গায়ে হাত বুলিয়ে ও বলল, ‘মন্দ নয় বাইক্টা।’

করোভিন আর টুপি-পরা ছোকরাটাও সাইকেলে হাত বুলোতে শুরু করল।

গেঙ্কা হঠাৎ মুখে আঙুল পুরে যতোটা জোরে সম্ভব শিস্ দিয়ে উঠল। ফটকের কাছে ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর নজর পড়ল এদিকে। মুখ ফিরিয়ে য়ুরাকে দেখতে পেয়েই উনি হন্‌হন্ করে এগিয়ে এলেন ছেলেদের কাছে। ভদ্রলোক সুপুরুষ। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, হাতগুলো ফর্সা, মোটা। গা থেকে অডিকোলন আর ওষুধের দোকানের গন্ধ মিশে একটা কেমন গন্ধ বেরুচ্ছে।

সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে য়ুরা। বোকা বনে গিয়ে বাপের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার কড়া গলায় বললেন, ‘য়ুরা, বাড়ি ফিরে যাও!’

য়ুরা বলল, ‘কিন্তু ...’

‘বাড়ি যাও বলছি।’ কঠিন স্বরে ডাক্তার বললেন। রাস্তার ছেলেগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে ঘেন্নায় নাক সিঁটকোলেন উনি, তারপর গোড়ালি ঘুরিয়েই আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে ওঁর পেছন পেছন চলল য়ুরা আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

করোভিন বলল, ‘এইবার ঠিক বোকা বনে গেছে।’

মেচেতার দাগওয়ালা ছেলেটা নীতিকথা শুনিয়ে দিল, ‘দেমাক করা উচিত নয় ওর।’

৪৫

ফিতের রহস্য

আগের মতোই আবার গল্প শ্বর্ হল। প্ররো এক ঘণ্টা ধরে আলাপ চলল। যাবার সময় বাইরের ছেলেরা বলল ওরা ফের কাল আসবে।

প্রথম সাফল্যে পাইওনিয়ররা খ্রশি হল খ্রব, মহা উৎসাহে ওরা আলোচনা করতে লাগল বাইরের ওই ছেলেগ্রলোর চালচলন নিয়ে। কাছেই অ্যাসফাল্ট্ রাস্তাটার ওপর বসে বর্কা একা একাই পয়সা-মারা খেলছিল।

গেঙ্কা ওকে ডেকে বলল, 'এই হাড়কিপ্টে! সাইকেল চালাচ্ছিস না যে?'

বর্কা ম্বখ ব্রজে রইল।

গেঙ্কা বলেই চলল, 'মনে রাখিস ব্রঝলি, আমাদের কাজ পণ্ড করার চেষ্টা করলে তোদের এমন শিক্ষা দেব যে বছরখানেকের মধ্যে ভুলতে পারবি না! তোর ওই মোটা মগজে এই আক্কেলটুকু থাকে যেন আর তোর ওই হতচ্ছাড়া স্কাউট বন্ধ্রটাকেও বলে দিস।'

বর্কা তব্র ম্বখ ব্রজেই রইল।

মিশা নরম গলায় বলল, 'ওর পেছনে তুই লাগিসনে তো গেঙ্কা। ঝগড়ার কোনো দরকার নেই। বর্কা ঠিকই আছে, তবে ওই স্কাউটটার সঙ্গে ওর বেশি মাখামাখি করাটা ভালো নয়।'

বর্কা ওদের কথাগ্রলো মন দিয়ে শ্বনছিল, ওর সন্দেহ বোধহয় ওকে নিয়ে কোনো চালাকি খেলবার মতলবে আছে ওরা।

মিশা ফের বলল, 'আমি ঠিক ব্রঝতেই পারি না ওদের অতো খাতির কিসের। য়্বরা তো ওকে মান্বষই মনে করে না। ওর বাপ কেমন করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে দেখেছিলি?'

বর্কা এবারও কিছ্র বলল না। মিশার মতলবটা ও কিছ্রতেই ধরতে পারছে না।

মিশা আবার বলল, 'তোরা তো সবাই দেখেছিলি, নারে?'

বর্‌কার দিকে ফিরে বলল, 'যা বললাম সত্যি নারে বর্‌কা?'

বর্‌কা জবাব দিল, 'কেন আমায় বোঝাতে চেষ্টা করছিস শুনি? আমায় পাইওনিয়র দলে নাম লেখাতে বলছিস? দ্যাখ্, তোদের ওই পাইওনিয়র দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই। নেহাৎই সময় নষ্ট করছিস।'

গেঙ্কা চেঁচিয়ে উঠল, 'কে তোকে দিচ্ছে নাম লেখাতে!'

বাধা দিয়ে মিশা বলল, 'সবুর, এক মিনিট।' তারপর আবার বর্‌কাকে বলতে লাগল, 'আমি তোকে বোঝাতে চেষ্টা করছি না। শুধু কথাটা বলছিলাম। আরেকটা ব্যাপার হল, তুই আমাকে একটা কাজে সাহায্য করবি? বিরাট ব্যাপার কিন্তু। এই তো মাত্র কালই স্লাভাতে আমাতে কথা হচ্ছিল। তাই নারে স্লাভা?'

মিশার কথার মানে ধরতে পারেনি স্লাভা, কিন্তু তবু সে সায় দিল, 'হ্যাঁ, কথা হয়েছিল বটে কাল।'

বর্‌কা সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই শুনি?'

মিশা বলল, 'বুঝলি, আমরা একটা নতুন নাটক করতে যাচ্ছি। নাবিকদের নিয়ে নাটক, তাই একটা জাহাজী উর্দির দরকার। বুঝলি তো? আসল ডোরাদার গেঞ্জি, পাৎলুন আর টুপি। নতুন কি পুরনো তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জাহাজের নামটা যেন সত্যিকারের হয় সেইটেই হল আসল কথা। যেমন ধর, টুপির ফিতেটা। এইজন্যই তো তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিলাম। তুই তো এসবের নাড়িনক্ষত্র সব খবরই রাখিস। হয়তো আমাদের জোগাড় করেও দিতে পারবি।'

বর্‌কা বিদ্রূপ করে বলল, 'ভাবিস তোদের কাজ তো আমি করে দেবই রে? মাগ্‌না হলে আরো ভালো! হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন বোকা মুখ্যু পেয়েছিস আমাকে!'

'মোটেই না। আমরা পয়সা দেব।'

'হুম্!' বর্‌কা গম্ভীর হয়ে ভাবল, 'কতো দিবি?'

'আগে তো জিনিসটা দেখতে হবে। জোগাড় করতে পারবি মনে হয়?'

‘বাঘের দুধও এনে দিতে পারি।’ মিশার দিকে তাকাল ও, ‘বদলে তোর ছুরিটা আমায় দিবি? এখ্‌খুনি ফিতে এনে দিচ্ছি।’

‘সত্যিকারের ফিতে?’

‘বলেছিই তো।’

‘বেশ তো, নিয়ে আয়।’

‘ঠকাবি না তো?’ উঠে দাঁড়িয়ে বর্‌কা বলল।

‘কথা দিয়েছি। নিয়ে আয়, ছুরিটা পাবি।’

বর্‌কা ছুটল বাড়ির দিকে।

ধেড়ে শুরা রাগ করে বলল, ‘তোর মতলবটা কীরে মিশা? আবার কী নাটক করতে যাচ্ছিস? আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু জানানো হয়নি কেন?’

‘সে পরে বলব’খন। এটা অন্য একটা ব্যাপার।’

‘পরে, মানে? দলের নাট্যচক্রের পরিচালক তো আমিই। আমায় বাদ দেবার চেষ্টা করছিস কেন?’

গেঙ্কা বলল, ‘অতো মেজাজ গরম করিসনে। মিশা জানে ও কী করছে, সেইজন্যই তো ও উপদলের নেতা হয়েছে।’

‘আর আমি যে স্টেজ ম্যানেজার। নাটকের দায়িত্ব তো আমারই।’

‘দায়িত্ব না হয় তোরই থাকুক।’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে গেঙ্কা বলল, ‘কেউ তো তোকে মানা করেনি।’

মিশা ওকে থামিয়ে বলল, ‘চুপ কর। ওই যে বর্‌কা আসছে।’

বর্‌কা দৌড়ে এল ওদের কাছে। ওর হাতে কী একটা জিনিস।

‘এই যে, এবার ছুরিটা দে তো দেখি!’

‘আগে দ্যাখা তো কী এনেছিস।’

বরকা হাতটা অল্প একটু খুলে একটা দলা-পাকানো কালো ফিতের কানি দেখাল।

হাত বাড়িয়ে মিশা বলল, ‘দে না দেখি। হয়তো আসল জিনিস নয় ওটা।’

খপ্‌ করে হাতটা মুঠ করে ফেলল বর্‌কা।

'হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি আর কি! আগে ছুরিটা দে। ঘাবড়াসনি, খাঁটি জিনিসই আছে, আমার মাথাটা বাজি রেখেই বলতে পারি।'

'আচ্ছা, দেখাই যাক্!' নিঃশ্বাস ফেলে মিশা ছুরিটা তুলে দিল বর্কার হাতে।

বর্কা ছুরিখানা চেপে ধরে মিশাকে ফিতেটা দিল। মিশা ভাঁজ খুলল, গেঙ্কা আর স্লাভা ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ওরা দেখল পুরনো-হয়ে-যাওয়া ফিতেটার ওপর রুপোলি অক্ষরের লেখা পরিষ্কার পড়তে পারা যাচ্ছে: 'সম্রাজ্ঞী মারিয়া'।

৪৬

ফন্দি ফিকির

সেইদিন থেকে রাস্তার বাউণ্ডুলে ছেলেরা রোজই আসতে লাগল খেলার মাঠে। বন্ধুদের সঙ্গে করে আনে ওরা, লাপ্তা* খেলে, ভলিবল খেলে পাইওনিয়রদের সঙ্গে, আর গল্প শোনে শুরার মুখে। জুলাই মাসের এত গরম, কিন্তু তবু ওদের গা থেকে কিছুতেই আর ধুকড়ি কোট জামাগুলো নামানো গেল না।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বয়লারে অ্যাস্ফাল্ট্ গলানো হচ্ছে। তারই গরম ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসে। রাস্তার ওপর দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা জায়গাগুলোতে সবে অ্যাস্ফাল্ট্ ঢালা হয়েছে। গন্ধ আসে তার ধোঁয়া থেকেও।

নতুন রং-করা ট্রামগাড়ি, ছাদে বিজ্ঞাপন লেখা, ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে আসছে। রাস্তায় যারা কাজ করছে তাদের উদ্দেশ করে ট্রামের ড্রাইভাররা প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আঙিনাটা ভরে গেছে বয়লার, রেডিয়েটার,

---

* লাপ্তা — রুশ দেশের এক ধরনের বল খেলা।

পাইপ, ইট, চূণ আর সিমেণ্টের পিপেতে। নতুন করে তৈরি হচ্ছে মস্কো শহর।

'"ৎসিন্দেল" কারখানায় আবার কাজ শুরু হয়েছে।' বলল গেঙ্কা। ওর কাছে সব সময়ই সবচেয়ে টাট্‌কা খবরটা পাওয়া যাবে। দালানকোঠাগুলো ছাড়িয়ে ওপাশে অনেক দূরে কোথায় যেন একটা কারখানার চিম্‌নি থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে। সেটার দিকে আঙুল দেখাল গেঙ্কা। 'কাল ওখানে কাজ শুরু হয়েছে, আর আসছে কাল শুরু হবে "ত্রিয়খ্‌গরনায়া" সুতোকলে।'

মিশা ঠাট্টা করে বলল, 'তুই তো সবই জানিস! কার চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে সে খবরও রাখিস। কিন্তু এখানে কী হচ্ছে বল্‌ দেখি?' খাম্বাগুলোর ওপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কাজ করছিল, সেইদিকে দেখাল মিশা।

'দেখতে পাচ্ছিস না? ওরা তো ইলেকট্রিক মিস্তিরি, তার মেরামত করছে।'

'"তার মেরামত করছে"!' খোঁচা দিল মিশা, 'তাহলে তো তুই খুব জানিস। কেন মেরামত করছে বল্‌ তো?'

'বোধহয় ছিঁড়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এবার বোঝা গেছে তুই কেমন খবর রাখিস! শাতুরা বিজলি স্টেশনে কাজ শুরু হয়েছে বুঝলি। পীটের জ্বালানি দিয়ে কাজ হচ্ছে। এখন থেকে সারা রাত আলো জ্বলবে, আর রাস্তার দুপাশেই থাকবে বাতি। বুঝলি তো? ওরা কাশিরা কেন্দ্রটাকেও শেষ করে এনেছে। সেটা চলবে কয়লাতে। আর ভলখভ্‌ নদীতে এই প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে। জলের শক্তিতে চলবে...'

'তোর বলার আগেই ওসব খবর আমার জানা।' গেঙ্কা বলল, 'তুই ভাবিস তুই একাই খবরের কাগজ পড়িস?'

সত্যিসত্যিই গেঙ্কার বাড়িতে এক গাদা খবরের কাগজ রয়েছে। কিন্তু সবগুলোই 'ইজভেস্তিয়া' কাগজের একই সংখ্যা। ওতে 'ভোল্‌গা এলাকার রিলিফ তহবিল' হেডিং দিয়ে নিচে একটা লাইনে ছাপা হয়েছে: '২৬৭ নং

বাসিন্দা সমিতির শিশুদের তরফ হইতে—৮৭ রুবল'। ছেলেপিলেদের এটা নিয়ে দারুণ গর্ব, গেঙকাও সব সময় খবরের কাগজের ওই বিশেষ সংখ্যাটা সঙ্গে রাখে, সুযোগ পেলেই একবার করে দেখিয়ে দেয়।

দিন কেটে যায়। ছেলেরা কিন্তু ছোরার খাপটা উদ্ধার করার কোনো কায়দাই খুঁজে পায় না। ওরা যাকে খুঁজছিল ফিলিনই যে সেই লোক তা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে, এখন স্থিরভাবে জেনে নিতে হবে ডাকটিকিটের দোকানে মিশা যা দেখেছিল সেটাই সেই ছোরার খাপ, না নেহাৎই একটা পাখা। কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব?

গেঙকা বলল, 'বুড়োটা যখন থাকবে না, তখন ঢুকে পড়বি, ব্যস্। ওরা তো ডাকাত, আমাদের অতো আদিখ্যেতার কী দরকার?'

'কী ভাবে ঢুকব শুনি?'

'সোজা। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়বি। তার চেয়েও ভাল হয় যদি করোভিনকে দিয়ে কাজটা করাতে পারিস। এ ব্যাপারে ও তো ওস্তাদ।'

মিশা বলল, 'তুই তোর মুখটাকে সামলা তো। তোর দোষেই আমাদের দোকানে মুখ দেখাবার জো নেই। কাল চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বুড়ো দিল না ঢুকতে। আসল কথা হল, সন্দেহ করেছে। আর করোভিনকেও এ ব্যাপারে টানার দরকার নেই। ওকে জানলায় উঠিয়ে দিয়ে আমরা মজা দেখি আর কি। পাইওনিয়রদের সম্বন্ধে ওর ধারণাটা তাহলে কেমন হবে? ছোরা টোরা সম্পর্কে কিছুই তো জানে না ও। নারে, আমাদের অন্য ফন্দি আঁটতে হবে।'

সত্যিই মিশা অন্য এক উপায় খুঁজে বের করল। তবে ফন্দিটা ওর মাথায় এল বেশ কিছুদিন পরে—ওদের দলটা যখন সেনেজ হ্রদের পাশে দুদিনের ক্যাম্প করতে গিয়েছে সেই সময় ওর মাথায় বুদ্ধিটা খেলল।

৪৭

ক্যাম্পে যাবার প্রস্তুতি

ক্যাম্পে যাবার দিন মিশা খুব ভোর থাকতে উঠে পড়ল।

ঘরে এর মধ্যেই আলো এসে পড়েছে, ভোরের কুয়াশায় জানলার ভেতর দিয়ে আশেপাশের বাড়িগুলোর ধূসর দেয়াল নজরে পড়ে। কয়েকটা জানলায় টিম্‌টিম্‌ করে আলোও জ্বলছে।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মিশা বলল, 'ক'টা বেজেছে মা?'

'পাঁচটা। যা, ফের ঘুমো, অনেক সময় আছে এখনো।'

ঘরের ভেতর চলাফেরা করছে মা, প্রাতরাশের জন্য টেবিল সাজাচ্ছে।

মিশা হন্তদন্ত হয়ে জামা পরতে শুরু করল। বলল, 'না। আমাকে উঠতে হবে। গিয়ে অন্য সবাইকে জড়ো করার কথা। ওরা বোধহয় এখনো ঘুমুচ্ছে।'

মা বলল, 'আগে তো কিছু খেয়ে নিবি?'

'এক মিনিট।'

মিশা তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে ঝুলিটা গোছাতে শুরু করে দিল।

কাঁদ কাঁদ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, আমার চামচেটা কোথায়?'

'তুই নিজেই কোথাও রেখেছিস।'

'কিন্তু এখানে তো নেই!'

মিশা তাড়াতাড়ি ঝুলিটা হাতড়াল।

'ও, এই যে!'

'তোর ঝুলিতে কেউ হাত দেয়নি।'

মা হাই তোলে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকে। 'ওটা আর বেশি হাতড়াহাতড়ি করিসনি, সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলবি। এই নে তোর চা। কম্বলটা আমিই গুছিয়ে দিচ্ছি।'

'না না, তুমি জানোই না গোছাতে।'

মিশা কম্বলটা পাকিয়ে ঝুলির সঙ্গে বাঁধল। একটা মগ আর রান্নার পাত্র আগেই ঝুলছিল ওটার গায়ে।

'এইভাবে করতে হয়, বুঝলে।'

'বেশ তো। তুই নিজেই কর্ না। আর ওখানে গিয়ে কিছু হারাস-টারাস্ নে। দয়া করে পার থেকে দূরে সাঁতার কাটিস না।'

'নিজেই জানি তো।' চা খেতে গিয়ে গাল পুড়িয়ে ফেলে মিশা, 'আমি যে আর ছোট্টটি নেই সে যেন তুমি বুঝতেই চাও না। দেখবে ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে আমি ওই জিনিসটা আর আস্ত রাখব না।' কোণের দিকে ইটের তৈরি চুল্লীখানা দেখিয়ে দিল ও, 'বাষ্পের চুল্লী শীগগিরই চালু হবে বলে। তখন দেখবে কেমন গরম হয় ঘর।'

মা জবাব দিল, 'সে যখন চালু হবে তখন ভাঙতে দেব।'

কাঁধে ঝুলি নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে ছুটে বেরোল মিশা। সিঁড়ির মুখে গেঙ্কার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। সেও তখন ক্যাম্পের জন্য পুরোদস্তুর তৈরি। মিশা ওকে পাঠিয়ে দিল অন্য ছেলেমেয়েদের উঠোনে জড়ো করবার জন্য। তারপর চলল ওপর তলায় স্লাভাদের ফ্ল্যাটে।

ও ঠিক যা ভেবেছিল — স্লাভা তখনো ঘুমুচ্ছে।

মিশা চটে গিয়ে বলল, 'ঠিক! আর কতো ঘুমুবি রে তুই?'

স্লাভা হাতদুটো টানটান করে ঘুমভরা চোখ রগড়ে প্রতিবাদ জানাল, 'কিন্তু কথাই তো ছিল তুই আমাকে ডেকে তুলতে আসবি।'

'নিজের ওপরেও নির্ভর করা চাই। নে, চটপট কাপড় পরে নে!'

মিশা পিয়ানোর কাছে গিয়ে বিরক্তভাবে স্বরলিপিগুলো ওলটাতে থাকল।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্লাভার বাবা কন্স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ। পাৎলুনের বেল্ট্ ছাপিয়ে ভদ্রলোকের ভুঁড়িখানা বেরিয়ে এসেছে। রাশিয়ান সার্টের খোলা গলার ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে চওড়া বুকখানা, লাল লাল চুলে ভর্তি। দয়ামায়াভরা ফুলো মুখখানার মধ্যে ওঁর ঘুম-জড়ানো খুদে খুদে চোখ দুটোকে সরু চেরা দাগের মতো দেখাচ্ছে।

হাই তুলে উনি বললেন, 'কী গো পাইওনিয়ররা, ক্যাম্পে চলেছ তাহলে?' হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন মিশার দিকে, 'সুপ্রভাত, সেনাপতি মশাই। সেপাইদের এতো সকালেই বকছ? হ্যাঁ, এই তো চাই!'

'সুপ্রভাত,' জবাব দিল মিশা, 'এই একটু আলাপ করছিলাম ওর সঙ্গে।'

কেন জানি কন্‌স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচের সামনে পড়লেই মিশা হকচকিয়ে যায়। ওর খালি মনে হয় ভদ্রলোক বুঝি ওকে কিংবা ওর দলবলকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছেন। তাছাড়া তিনি কারখানার প্রধান ইঞ্জিনীয়র — আগ্রিপ্পিনা পিসিমার ভাষায় 'একজন বিশেষজ্ঞ।'

'ঠিক আছে। চালিয়ে যাও।'

চটি টেনে টেনে কন্‌স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ রান্নাঘরের দিকে চললেন। একটু বাদেই মিশাদের কানে গেল প্রাইমাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ।

মিশার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, 'আচ্ছা, আপদ! আবার চা বানাচ্ছেন দেখছি। মাঝখান থেকে দেরি হয়ে যাবে। সব ওই স্লাভাটার দোষে।'

'কোস্তিয়া!' শোবার ঘর থেকে শোনা গেল আল্লা সের্গেয়েভনার গলার আওয়াজ, 'কোস্তিয়া!'

স্লাভা চেঁচাল, 'বাবা রান্নাঘরে।'

'স্লাভা, এই স্লাভা!'

'এই যে, মা!'

'বাবাকে বল্ কাটলেটগুলো মোম-কাগজে জড়িয়ে দিতে।'

বুটের ফিতে পরাতে পরাতে স্লাভা জবাব দিল, 'বেশ।'

'বেশ নয়, গিয়ে ওঁকে বল্ এখ্‌খুনি।'

স্লাভা চুপ করে রইল।

আবার শোনা গেল আল্লা সের্গেয়েভনার গলার আওয়াজ, 'ও কে রে তোর সঙ্গে?'

'মিশা।'

'মিশা? এই যে মিশা!'

'নমস্কার।' উঁচু গলায় মিশা সাড়া দিল।

বিছানা থেকেই স্লাভার মা বললেন, 'মিশা, বাছা, স্লাভাটাকে সাঁতার কাটতে মানা করো। ডাক্তাররা পই পই করে বারণ করেছেন।'

স্লাভা লাল হয়ে বেপরোয়া একটা টান মারল জুতোর ফিতেয়।

মিশা মৃদু হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

আল্লা সের্গেয়েভনা বলেই চললেন, 'আর শোনো মিশা! ওর ওপর একটু নজর রেখো। তুমি না গেলে অবিশ্যি ওকে আমি যেতেই দিতুম না। তোমার বেশ বোধশোধ আছে আর ও তোমার কথাও শোনে।'

স্লাভার দিকে মুখ ভেংচে মিশা জবাব দিল, 'ঠিক আছে। আমি ওর ওপর নজর রাখব।'

কেতলি আর তারের স্ট্যাণ্ড নিয়ে ঘরে ঢুকলেন কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ।

টেবিলে কেতলিটা রেখে বললেন, 'এই যে ক্যাম্পওয়ালারা, একটু চা চলবে?'

মিশা জবাব দিল, 'আজ্ঞে, আমি খাব না। আমি খেয়েই বেরিয়েছি।'

শোবার ঘর থেকে আল্লা সের্গেয়েভনা ফের ডাকলেন, 'কোস্তিয়া, ওখানে কি করছ তুমি? গিয়ে দাশাকে জাগিয়ে দাও না!'

রুটি কাটতে কাটতে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ বললেন, 'ঘাবড়িও না, সব ঠিক আছে।'

আল্লা সের্গেয়েভনা বলেই চললেন, 'দাশাকে বোলো গয়লানী বৌ এলে যেন কেবল এক বোতল মাত্র নেয়।'

'ঠিক আছে, বলব। তুমি আরেকটু ঘুমিয়ে নাও।'

'ঘুমোই কী করে বলো দেখি?' আল্লা সের্গেয়েভনা বিরক্তভাবে জবাব দিলেন, 'কেন তুমি ওকে যেতে দিতে রাজি হলে বলো তো? এখন পুরো দুটো দিন দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হবে। আজকে আবার একটা গানের জলসাও রয়েছে আমার।'

ছেলেদের দিকে দুষ্টুমি করে চেয়ে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ বললেন, 'কিচ্ছু ভাবতে হবে না, যেতে দাও। এখন তো আর ঠেকাবারও জো নেই ওকে। বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে।'

'না, না ... সেটা পাগলামি, নেহাৎই পাগলামি! এইভাবে কোথাও পুরো দুটো দিনের জন্য ছেলেটাকে যেতে দেওয়া, অ্যাঁ। তাও আবার কোনো তেমন জরুরি কারণে নয় ... স্লাভা! খালি পায়ে ঘুরে বেড়াবি না কিন্তু খবদ্দার।'

চা শেষ করতে করতে স্লাভা বিড়বিড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ মিশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, তোমাদের সেই চিমটেখানা দিয়েছিলাম, ওটা দিয়ে কী করেছ?' মুখে ওঁর তখনো হাসিটা লেগে আছে।

মিশা বলল, 'খুব কাজ দিয়েছে জিনিসটা। ইয়ং পাইওনিয়র ভবনে রয়েছে। ফিটার মিস্তিরির ঘরে।'

'সে কি? গোটা ভবনই কি ওটা ব্যবহার করছে?'

'না, না!' মিশা হাসল, 'সমস্ত পাড়াটা থেকেই আমরা যন্ত্রপাতি জোগাড় করেছিলাম যে!'

'আমায় বিশ্বাস করতে বলো সে কথা?'

'নিশ্চয়। ফিটার মিস্তিরির ঘর ছাড়াও আমাদের আছে ছুতোর মিস্তিরির ঘর, সেলাই ঘর, জুতো বানানো, বই বাঁধানোর ঘর।'

'সত্যিই? এ যে গোটা একখানা কারখানা হে!'

কাঁধের ওপর ঝুলিখানা ফেলে স্লাভা বলল, 'শুধু কিপ্‌টেমি করলে তুমিই। 'নাপিল্‌নিক' কারখানার পরিচালক আমাদের পুরোদস্তুর একটা লেদ্‌ মেশিন দিয়ে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি! কিন্তু আমার যে লেদ নেই।' হতাশার ভাণ করে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ হাতদুটো তুললেন, 'যদি চাও একখানা তাঁত কল দিতে পারি। এই ঘরটার মতো প্রকাণ্ড হবে। চাও না নাকি? তাহলে তো আমি নাচার। আমার যা কিছু আছে সব তোমরা নিতে পারো।'

স্লাভা বলল, 'তোমার খালি ঠাট্টা। চল রে মিশা।'

দরজা অবধি ওদের এগিয়ে দিলেন কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ। বিদায় নেবার সময় হেসে বললেন, 'যাহোক, তোমরা তো স্বাধীন লোক, তবু কিন্তু চেষ্টা কোরো যাতে হাত পা না ভেঙে বাড়ি ফেরা যায়, আর যদি মাথাগুলো না ফাটে তো আরো ভালো।'

৪৮

ক্যাম্পে

মিশার উপদলটা মস্তো একখানা কাঠের ভেলা বানানো শেষ করে সাঁতার কেটে ডাঙায় ফিরে এসে বিশ্রাম করছিল।

ওদের সামনে প্রকাণ্ড একটা হ্রদ। দূরে আবছা হ্রদের কিনারায় তুষার-ঘেরা পাহাড়ের মতো থরে থরে মেঘ জমেছে। নীল জলের ওপর তীর বেগে ডানার ঝাপ্টা মেরে উড়ে যাচ্ছে গাংচিল। পার ঘেঁষে হাঁটুজলে হাজার হাজার খুদে মাছ ছুটোছুটি করছে। ছোট ছোট ঢেউয়ের আল্তো দুলুনিতে দুলছে সাদা শাপলার ফুল। ডাঙার ধারে নলখাগড়ার সঙ্গে শাপলার সবুজ লম্বা নালগুলো জড়িয়ে আছে। ব্যাঙ ডাকছে সেখানে, আর মাঝেমাঝে শোনা যাচ্ছে বড়ো বড়ো মাছ লেজের ঘাই মারছে ঝপাস্ ঝপাস্ করে।

খুব ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে গেঙ্কা কাঁধে বুকে মলম মাখছিল আর বলছিল, 'আসল জিনিস হল চামড়াটাকে রোদে পুড়িয়ে বেশ করে পাকাপোক্ত করা।

ভালো স্বাস্থ্যের প্রথম লক্ষণই পোড় খাওয়া চামড়া। এই যে মিশা, আমার পিঠে এটা একটু মালিশ করে দে তো, আমিও তোরটা দেব'খন।'

টিনটা হাতে নিয়ে মিশা শুঁকল, নাক সিঁটকে বলে উঠল:

'এটা আবার কী বদখত চীজ রে? এঃ!'

'ভারি তো জানিস তুই! এটা হল বাদাম তেল। সবচেয়ে সেরা জাতের। গন্ধটা টিনের। পুরোনো জুতোর কালির কৌটো তো!'

মিশা তবু নাক সিঁটকে সিঁটকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'আর ডিমের ভাঙা খোলা, রুটির গুঁড়োও আছে দেখছি।'

'ও কিছু নয়,' মাথা নেড়ে বলল গেঙ্কা, 'থলির ভেতর সব উলটে-পালটে গিয়েছিল তো, তাই। ভাবনা নেই, তুই মালিশ কর্!'

গেঙ্কাকে কৌটোটা ফিরিয়ে দিল মিশা, 'না! তুই নিজেই কর্! ও আমার ছোঁবারই ইচ্ছে নেই মোটে।'

'তাহলে করিসনি। তবে দেখবি, বিকেলের আগেই আমার চামড়া কেমন পেতলের মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে।'

স্লাভা বলল, 'সবাই আয়। আমাদের কোলিয়া এসেছে।'

ছেলেরা চলল ক্যাম্পে। বনের ধারে চুড়োওয়ালা ছোট ছোট ধূসর তাঁবু খাটানো হয়েছে।

ক্যাম্পের মাঝখানে আগেই একটা পতাকার খুঁটি পোঁতা হয়েছিল, পতাকা উত্তোলনের উৎসব হবে আগামীকাল। খুঁটির পাশে নতুন-তোলা মাটি ছেলেমেয়েরা পা দিয়ে দুরমুশ করে দিয়েছিল। এখন সেটা হয়েছে একটা ছোট্ট ধূসর ঢিবির মতো। আর চারপাশের মাটি বাদামি, পাইনের ছাল, পাইনের হলদে কাঁটা আর শুকনো মুচ্‌মুচে ডাল ছড়ানো।

ক্যাম্পের শেষপ্রান্তে একটা তাঁবু থেকে মেয়েদের হৈ-হল্লার আওয়াজ ভেসে আসছে। আগুন ঘিরে ভিড় জমিয়েছে ওরা। দু-ফেঁকড়াওয়ালা দুটো ডালের মাঝখানে একটা দাণ্ডা বসানো। দাণ্ডায় বাঁধা হাঁড়িগুলো আগুনের ওপর ঝুলছে। পোড়া পরিজের গন্ধ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল গোটা ক্যাম্পের মধ্যে।

গেঙ্কা বলল, 'অতো চেঁচায় কেন ওরা? মেয়েগুলো কোনো কাজ যদি চুপচাপ করতে পারে। সব তাতেই ওদের হৈ-হল্লা! পরিজ রাঁধার মতো সোজা কাজ আবার আছে? অথচ এমন হট্টগোল তুলেছে যেন একটা আস্ত ষাঁড়ের রোস্ট্ বানাচ্ছে।'

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কোলিয়া—দশটি বাউণ্ডুলে ছেলে ওকে ঘিরে রয়েছে। এই ছেলেগুলোই নিয়মিত খেলার মাঠে হাজিরা দিত। সবার পরনে ছেঁড়া জামা, শুধু করোভিনেরই কোমর অবধি খোলা।

মিশা ভাবল, 'কোলিয়া ওদের কোথায় নিয়ে গিয়েছিল কে জানে। আমরা যখন এদিকে ক্যাম্প বানাচ্ছি ও তখন ওদের কোনো মতলবে নিয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। কোনো কাজ করার অভ্যেস তো নেই ওদের। আমরা যখন যোগাড়যন্ত্র করছি ওরা বোধহয় বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হয়তো বা সরেও পড়ত। কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওদের কে বলবে!'

মিশা করোভিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা কোথায় ছিলি রে?'

পাশের ছেলেদের দিকে আড়চোখে চেয়ে করোভিন আস্তে আস্তে জবাব দিল, 'গ্রামে।'

'কেন?'

নিঃশ্বাস ফেলে ও বলল, 'ফসল দেখলাম, গম মাড়াই করা দেখলাম। আমরাও একসময় তো ... আমাদেরও গরু ছিল কিনা ...'

মিশা তারিফ করে কোলিয়ার দিকে তাকাল। মেয়েরা ওকে ঘিরে আছে। ক্যাম্পের আগুনের কাছেই দাঁড়িয়ে পরিজ পরখ করতে গিয়ে ও চাম্‌চেতে ফুঁ দিচ্ছিল আর হাসছিল।

'কী চালাক লোক!' ভাবল মিশা, 'ছেলেগুলোকে নিয়ে চলে গেল গাঁয়ে! তাও আবার মতলব করে। ওরা সবাই গাঁয়েরই ছেলে ছিল তো, তাই নিজেদের বাড়িঘর পরিবারের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে!'

করোভিন বলে চলল, 'আমরা স্টেশনেও গিয়েছিলাম।'

'কেন রে?'

'সেখানে অনাথ ছেলেদের একটা বাড়ি আছে। দেখলাম বাচ্চাগুলো কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। ওরাও একসময় ...' একটু ইতস্তত করে বলল, 'মানে আমাদের মতোই ছিল একসময়।'

'তোদের ভালো লাগল?'

'মন্দ নয়। ওদের নিজেদের রসুইয়ের জন্য সবজি বাগান আছে।'

মিশা ভাবল, 'একটা মতলব করেই কোলিয়া ওদের নিয়ে গিয়েছিল।'

কোলিয়া তখনো ক্যাম্পের রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে। মিশা ওর সঙ্গে গিয়ে জুটল।

জিনা ক্রুগলোভা খুব কাতর হয়ে দুঃখের কথা জানাচ্ছিল, 'এখন যে ছাই কী করে এসব জিনিস ভাগ করি? একশো রকমের চীজ জুটিয়ে এনেছে। কারুর সঙ্গে কারুরটা মেলে না। এই দ্যাখো না!' আগুনের কাছে সাজানো খাবারগুলোর দিকে আঙুল দেখাল ও, 'পাঁচটা কাটলেট, আটখানা হেরিং মাছ, বারোটা ডিম, ন-টুকরো মাংস, চারটে শুক্নো মাছ, রকমারি দানা।' ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে তারপরেই হঠাৎ হি হি করে হেসে ফেলল ও, 'আর দু'নম্বর উপদল তো বিস্তর মাছ ধরেছে, ষোলটা খোল্‌সে।' জিনার ছোট ওপর-তোলা নাকওয়ালা আগুনের তাপে লাল মুখখানা গোল হয়ে গেল।

কোলিয়া হাসল, 'মাছগুলো বড্ড ছোট। তা হোক্, ভাবনা নেই, আমাদের খাওয়াটা আজ ভালোই জমবে মনে হচ্ছে।'

৪৯

কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল

সত্যিই খাসা হল ভোজনপর্ব।

পরিজে চমৎকার ধোঁয়ার গন্ধ, সেদ্ধ শুকনো মাছেও তাই, আর চায়ের ওপর ভাসছিল পাইনের কাঁটা, চর্বির দলা, ভাঙা ডিমের খোলা।

ছেলেরা সবাই আগুন ঘিরে বসেছে আর বার্চগাছের বাকলে-তৈরি চাম্‌চে দিয়ে খাচ্ছে। বাতাসে প্াইনের চূড়ো দুলতে দুলতে আওয়াজ তুলেছে, দাঁড়কাকগুলো ডাকছে উত্তেজিত ভাবে। কোলিয়া একটা তার সোজা করে তাতে মাংসের টুকরো সাজিয়ে আগুনে ঝল্‌সে নিল। প্রত্যেকেরই ভাগে পড়েছে ছোট ছোট একেক টুকরো। কিন্তু তবু ওদের মনে হল এমন চমৎকার জিনিস জীবনে কখনো খায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর পুরো দলটাকে কোলিয়া সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল:

'কাল অনাথ শিশুসদনের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের নকল যুদ্ধের মহড়া হবে। আজ তাই একটু তালিম দিয়ে নেব যাতে বদনাম না হয়ে যায়। ওইখানটায় থাকবে "শ্বেতরক্ষীদের" সদরঘাঁটি।' হ্রদের ডান পাড়ে বনটার দিকে আঙুল দেখাল কোলিয়া, 'উদ্দেশ্যটা হবে "শ্বেতরক্ষীদের" সদরঘাঁটিতে হামলা করে তাদের পতাকা কেড়ে নেওয়া। দু'নম্বর আর চার নম্বর উপদল হবে শ্বেতরক্ষী আর তাদের নেতা হবে শুরা অগুরেয়েভ, সে সাজবে ভ্‌রাঙ্গেল। গেঙ্কা পেত্রোভ তার প্রধান সেনাপতি হবে।'

গেঙ্কা প্রতিবাদ জানাল, 'আমরা শ্বেতরক্ষী হতে যাব কোন্‌ দুঃখে? আমাদের উপদল হল "লাল" উপদল, আমরাও লাল ফৌজ হব।'

শুরা বলল, 'ঠিক কথা। এটা কিন্তু ভাল হল না। তা ছাড়া শ্বেতরক্ষীদের তো কোনো প্রধান সেনাপতি ছিল না। তাকে বলা হত কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল।'

কোলিয়া হাসল, 'বেশ কথা। তাহলে গেঙ্কা কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলই হবে। এখন যাতে হুকুম ঠিক মতো মানা হয় সেইটে দ্যাখো। যেই বিউগলের আওয়াজ শুনবে অমনি খেলা বন্ধ করে ছুটে আসবে ক্যাম্পে।'

শুরা আর গেঙ্কা বেদম চটে গেল ওদের ওই ভূমিকায় নামতে হল বলে। যখন "শ্বেতরক্ষীদের" ঘাঁটি দখল করা হল, ভ্‌রাঙ্গেল আর তার কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলটি তখন উধাও।

অনেকক্ষণ ধরে ওদের খোঁজাখুঁজি করা হল, অনেকবার বিউগল বাজানো হল, কিন্তু তবু ওদের পাত্তা নেই।

কোলিয়া বলল, 'ওরা ঠিকই ফিরে আসবে। এবার চা খেয়ে নাও, তারপর বনের দিকে যাওয়া যাবে শুকনো ডাল জোগাড় করতে, মস্তো আগুন জ্বালানো হবে ক্যাম্পে।'

সত্যিসত্যিই সন্ধ্যের সময় শুরা আর গেঙ্কা ফিরে এল।

শুরা আগে আর ওর পেছনে গেঙ্কা মাথা নিচু করে ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে, এমনভাবে গোঙাচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে যেন এইমাত্র ওকে জবর মার দিয়েছে কেউ।

কোলিয়ার কাছ ঘেঁষে দু'জন চুপচাপ এসে দাঁড়াল।

শুকনো গলায় কোলিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তোমরা?'

শুরা গম্ভীর চালে বলল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করছি।'

'সঙ্কেত জানাবার পর কেন চলে আসোনি?'

শুরা বক্তৃতা শুরু করল। আগে থেকেই তৈরি ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

'আমরা ইতিহাসের সত্যি ঘটনাটাকেই মেনে চলব ঠিক করেছিলাম। যেমন যেমন ঘটেছিল হুবহু তেমনটিই তো হওয়া দরকার। ভ্‌রাঙ্গেল ক্রিমিয়া থেকে পালিয়েছিল যে। তাই আমরাও গা ঢাকা দিলাম।' তারপর একটু থেমে ফের বলল, 'আর তোমার যদি মনে হয় ও ভূমিকাটায় আমার অভিনয় ঠিক হয়নি তবে দয়া করে আর ভ্‌রাঙ্গেলের পার্টটা আমাকে দিও না।'

হাসি চাপবার জন্য মুখ ফেরাল কোলিয়া।

'বেশ তো, তা এখন ফিরে এলে কেন?'

গেঙ্কাকে দেখাল শুরা।

'আমার কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলের যে আবার ভয়ানক অসুখ করল।'

'কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল'কে সত্যিই বড়ো শোচনীয় দেখাচ্ছিল। থর থর করে কাঁপছে, মুখখানা যেন জ্বরের ঘোরে লাল। চোখের কোটর ঘিরে লাল। সারা শরীরটা ওর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, যেন কেউ ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

কোলিয়া বলল, 'কী ব্যাপার গেঙ্কা?'

গেঙ্কা কোনো জবাব দিল না।

তার বদলে শুরা বলল, 'ওর চামড়ার ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে।'

গেঙ্কার জামা তুলে কোলিয়া দেখল ওর সমস্ত পিঠখানা ফোস্কায় দগ্‌দগে হয়ে গেছে।

'কিছু ঘষেছিলে নাকি গায়ে?'

'অ্যাঁ-হ্যাঁ।' তোৎলাল গেঙ্কা।

'কী ঘষেছো?'

'বা-বাদাম তেল।'

'দেখি তো।'

পকেট থেকে কৌটোটা বের করতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকাল গেঙ্কা, কোলিয়ার হাতে তুলে দিল জিনিসটা।

অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে পরীক্ষা করে কোলিয়া বলল, 'কোত্থেকে পেয়েছ এ চীজ?'

'নিজেই বানিয়েছি ... অনুপান দেখে।'

'কিসের অনুপান?'

'বর্‌কা দিয়েছিল।'

'হোঃ! এটা তো দেখছি দস্তা আর জুতোর কালির মিক্‌স্‌চার। বেড়ে ওষুধওয়ালা হয়েছ!'

বেচারি ছেলেটিকে তখন ভেস্‌লিন মালিশ করে একটা তাঁবুর ভেতর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

৫০

ক্যাম্পের আগুন ঘিরে

সন্ধ্যের সময় গোটা দলটা হ্রদের ধারে ক্যাম্পের আগুন ঘিরে বসেছে।

হ্রদের ওপর চাঁদের আলো যেন একটা রুপোলি ঝিকমিকে রাস্তা এঁকে দিয়েছে। ঘুমন্ত বনের ঘন কালোর সামনে ওদের ছোট্ট সাদা সাদা তাঁবুকে দেখা যাচ্ছে। শুধু মিটমিটে তারার দলই যেন পরস্পরকে সংকেত জানিয়ে ঘুমন্ত পৃথিবীটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কোলিয়া ওদের গল্প শোনায় — দূর বিদেশের গল্প। বলে সিংহলের চা বাগানে যেসব ছোট ছেলেমেয়েরা কাজ করে তাদের কথা, খেটে খেটে হয়রান সাইলেশিয়ার খনি-মজুরদের কথা আর আমেরিকার সেইসব নিগ্রোর কথা যারা মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ছেলেমেয়েদের উত্তেজিত মুখ আর লাল টাইগুলোর ওপর নাচতে থাকে জ্বলন্ত আগুনের আভা। সে আভা কোলিয়ার পাতলা মুখ আর ফ্যাকাশে কপালের ওপর ঝুলে থাকা হাল্‌কা চুলের গোছার ওপরও পড়ে। সরু সরু ডালগুলো মট্‌মট্‌ করে ভেঙে ছোট ছোট জ্বলন্ত লাল কয়লায় পরিণত হচ্ছে, আর সামান্য বেগুনি শিখা তুলে জ্বলছে। মাঝে মাঝে আগুন থেকে ঠেলে বেরোয় গরম কাঠ-কয়লা। ছেলেদেরই কেউ তখন সাবধানে সেটা ফের ঢুকিয়ে দেয় গণ্‌গণে জ্বলন্ত কাঠগুলোর ভেতর।

পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্ট আর কমসমোলের সভ্যদের, এই বিশ্ব বিপ্লবের বীর যোদ্ধাদের কথাও শোনায় কোলিয়া।

হাতের তেলোয় থুতনিটা রেখে মিশা উপুড় হয়ে শুয়েছিল। আগুনের খুব কাছে শুয়েছে বলে ওর মুখখানা রাঙা, আর হ্রদের দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়া এসে ওর পিঠ জুড়িয়ে দিচ্ছে। কোলিয়ার কথা শুনতে শুনতে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই নির্ভীক মানুষগুলোর দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ,

আগুনের চারদিক ঘিরে যে অন্ধকার তারই মধ্যে যেন জেগে রয়েছে তারা। ও মনে মনে কল্পনা করে, তারা যেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিংবা জেলখানা আর নির্যাতনকক্ষের যন্ত্রণা সহ্য করছে বীরের মতো। ওর মনে মনে ইচ্ছে হয় খুব বীরত্বের কাজ কিছু করবে, কোলিয়া যেসব মানুষের কথা বলছিল তাদের মতোই হোক ওর জীবন, মৃত্যুর শেষ দিনটি অবধি বিপ্লবের সেবা করে যাবে। এই স্বপ্নই দেখে ও।

কোলিয়া কথা শেষ করে ঘুমবার সঙ্কেত দেবার হুকুম দিল। বিউগলের একটানা সুরে বাতাস কেঁপে উঠল। গাছের মাথার ওপর দিয়ে বহুদূর থেকে ভেসে এল তার প্রতিধ্বনি। ছেলেমেয়েরা সবাই আসর ভেঙে যে যার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল। ক্যাম্পে ঘুম নেমে আসে।

কিন্তু ঘুম নেই মিশার চোখে। তাঁবুর এক পাশে শুয়ে খোলা পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখছে আকাশের তারা। লম্বা-ঠেঙো ধেড়ে শুরা পাশেই লম্বা হয়ে শুয়ে, কম্বলটা টেনে নিয়েছে মাথার ওপর। শুরার ওধারে হাঁটু মুড়ে শুয়ে আছে স্লাভা, অল্প অল্প নাক ডাকছে ওর। তারপর গেঙ্কা, ঘুমের ঘোরে উশখুশ করছে আর গোঙাচ্ছে। নরম ফারগাছের ডাল বিছিয়ে শুয়ে ওরা, মুখগুলো গুঁজে রেখেছে ঘাসের বালিশে।

মিশা ভাবছিল কোলিয়ার কথা। 'কী করে ও সব রকম খবর রাখে? নিশ্চয় খুব পড়াশোনা করে। কিন্তু এত কিছু করার সময় পায় কোথায়? কাজ করে এক কারখানায়, পড়ে শ্রমিক ফ্যাকালটিতে, ইয়ং পাইওনিয়রদের নেতা ও, আবার কারখানার কমসমোল পরিষদেরও সদস্য। হ্যাঁ, ওই হচ্ছে খাঁটি কমসমোলের সভ্য!'

মট্ করে একটা গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ হল। কান পেতে রইল মিশা। পাহারাদার। আর কিছু নয়। মেয়েদের তাঁবু থেকে নিচু গলায় চাপা হাসির আওয়াজ আসছে। নিশ্চয় জিনা ক্রুগলোভাটা। ওর তো সব তাতেই মজা কিনা ...

কি জানি কেন মিশার মনে পড়ে যায় ইয়েলেনা আর ইগরের কথা।

অনেকদিন ওদের দেখেনি মিশা, প্রায় সারা গরমকালটা। এখন যে কোথায় রয়েছে সেই ভবঘুরে খেলোয়াড় দুটি! ওদের সেই গাধা আর পোস্টার গাড়িটাই বা কোথায়? পোস্টার গাড়িটার কথা গেঙ্কা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারে না, ও রকম একটা গাড়ি পেলে ও শহরে টহল দিতে পারত বিজ্ঞাপন নিয়ে আর বিনিপয়সায় সিনেমার একটা পাশও পেয়ে যেত ... মজার ছেলে যা হোক!

মস্কো শহরে গেঙ্কা পোস্টার গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেই কথাটাই একবার কল্পনা করল মিশা। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়।

বিজ্ঞাপন-আঁটা গাড়ি ... পোস্টার গাড়ি ... আচ্ছা, একথাটা ওর আগে কেন মনে হয়নি? উত্তেজনায় উঠে বসল মিশা, তারপরই আবার শুয়ে পড়ল। জবর বুদ্ধিটা খেলেছে তো মাথায়! একেবারে কামাল করে দেওয়া যাবে! পুরো ছবিটা ওর চোখের ওপর ভাসতে থাকে এবার। উঃ, দারুণ হবে কিন্তু!

ইচ্ছে হল এখুনি গেঙ্কা আর স্লাভাকে জাগিয়ে তুলে ওর নতুন ফন্দিটার কথা বলে দেয়। কিন্তু ফের মন বদলায়। কাল সকাল অবধি সবুর করা যাক্। এখন আসল কাজটা হল বুশ্‌দের খুঁজে বের করা, তারপর ... অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না মিশার চোখে, চমৎকার ফন্দিটার কথাই কেবল ঘুরতে লাগল মাথায় ...

অবশেষে চোখ বুজল ও। পাহারাদারদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে। মেয়েদের তাঁবুতে হাসাহাসি থেমেছে, সবকিছু চুপচাপ।

হ্রদের জোছনা-ঢালা উঁচু পাড়ে আগুনের পুড়ে-শেষ-হয়ে-আসা কাঠকয়লার কালো দাগ রয়ে গেছে। কালো ছাইয়ের ভেতর ছোট ছোট আগুনের ফুল্‌কিগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত একেকবার জ্বলছিল আর নিভু-নিভু হয়ে আসছিল, পোড়া কালো কাঠের ভেতর ওরা যেন লুকোচুরি খেলছে।

৫১

গোপন প্রস্তুতি

অগস্ট মাস শেষ হয়ে এল। শহরের বুলভারে শীত-শীত ভাব, ক্রমেই তারা ঢাকা পড়ছে ঝরা-পাতার উজ্জ্বল পুরু গালিচায়। বিদায়ী গ্রীষ্মের হাল্কা সুবাসে বাতাস ভরপুর।

একদিন পাইওনিয়রদের একটা সভা হয়ে যাবার পর মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা ক্লাব থেকে বেরিয়ে চলে গেল নভোদেভিচি মঠে।

মঠের উঁচু দেয়ালের ফাটলগুলোতে পাতিকাকের বাসা। নির্জন কবরখানা ভরে উঠেছে ওদের হাঁকডাকে। কবরের ওপরের বিমর্ষ ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে, দমকা হাওয়া এলেই লোহার রেলিংগুলো একেকবার কেঁপে উঠছে।

মিশা বলল, 'সবুর করতে হবে এবার।'

একটা নিচু বেঞ্চির ওপর বসল তিন বন্ধু। দুটো নড়বড়ে পায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বেঞ্চিটা, মাঝখানটা ঝুলে গিয়ে প্রায় মাটি ছোঁয় আর কি।

কবরগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে গেঙ্কা জানিয়ে দিল, 'এখানকার আর্ধেক লোকেরই জ্যান্ত কবর হয়েছিল।'

স্লাভা জিজ্ঞেস করল, 'ও কথা বলছিস কেন?'

'মানে, অনেক সময় হয় কি, যাকে মরা বলে মনে করা হচ্ছে সে হয়তো আসলে একটা গাঢ় ঘুমের মধ্যে রয়েছে। তারপর যখন ঘুম ভাঙল দেখল কবরের মধ্যে শুয়ে আছে। বেঁচে যে আছে সেটা তখন বেরিয়ে এসে প্রমাণ করবে কেমন করে?'

মিশা বলল, 'এ রকম হয় বটে, তবে কালেভদ্রে।'

গেঙ্কা আপত্তি তুলল, 'ঠিক তার উল্টো। এরকম হরদমই ঘটে। শরীরের

ভেতর দিয়ে একবার বিজলির কারেণ্ট চালিয়েই দ্যাখ্ না, তখন আর বলবি না যে হয় না।'

মিশা শুনিয়ে দিল, 'অধ্যাপক গেন্নাদি পেত্রোভ মহাশয়ের আবিষ্কৃত একটি নতুন তত্ত্ব!'

'দুই ঘটিকা হইতে চার ঘটিকা পর্যন্ত শ্রোতাদের আপ্যায়িত করা হয়।' জুড়ে দিল স্লাভা।

গেঙ্কা বলল, 'নে, হেসে নে যতো খুশি। যখন জ্যান্ত কবর হবে তখন ঠেলাখানা টের পাবি। এখন হাসছিস, তখন মুখ বেঁকিয়ে কাঁদবি!' ভীষণ চটে গিয়ে বাকি কথাটুকু ও আর বলতে পারল না। তারপর অন্য কথা তুলল। অধীরভাবে প্রশ্ন করল, 'কখন আসবে ওরা?'

মিশা শুনিয়ে দিল, 'অধ্যাপক গেন্নাদি পেত্রোভ মহাশয়ের আবিষ্কৃত একটি না নিশ্চয়ই।'

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে স্লাভা বলল, 'হয়তো কাজটা আদপেই শুরু না করলে হত, তাই নারে?'

'কেন?'

'আমরা তো গিয়ে মিলিশিয়াকেই সব খবর দিতে পারি।'

গেঙ্কা রেগে বলল, 'খেপেছিস নাকি? তারপর মিলিশিয়া এসে সব গুপ্তধন নিজেরা নিয়ে নিক আর আমাদের সিধে রাস্তা দেখিয়ে দিক, আর কি?'

মিশা বলল, 'মিলিশিয়াকে তো আমরা যখন খুশি খবর দিতেই পারি। কিন্তু আগে যে আমাদের সব ব্যাপারটা জানা দরকার, নাহলে সবাই হাসবে আমাদের দেখে। আমার মতে, যা ঠিক করলাম তা করা হোক।'

মিশার কথা সবে শেষ হয়েছে এমন সময় মঠের পাঁচিলের ওধার থেকে এসে হাজির হল ইয়েলেনা আর ইগর। ছেলেদের সম্ভাষণ জানিয়ে ওরাও এসে পাশাপাশি বসল বেঞ্চিতে।

ইয়েলেনা পরেছে একটা শরৎকালের কোট আর মাথায় বেঁধেছে উজ্জ্বল রঙের একটা রুমাল। ইগরের পরনে স্যুট, টাই, মাথায় দুরস্ত টুপি, মুখের গম্ভীরভাবখানা ঠিক বজায় আছে।

আরাম করে গুছিয়ে বসে একখানা পকেটঘড়ি বের করে ও গম্ভীরভাবে বলল, 'ঠিক সময়ই এসেছি বোধহয়।'

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ইয়েলেনা।

'বেশ, তা খবর কি তোমাদের?'

মিশা জবাব দিল, 'ভালোই। তোমরা কেমন?'

'আমরাও ভালোই আছি। এই তো এক দফা বেড়িয়ে এলাম।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'কতো জায়গায়! কুর্স্ক, তারপর ওরিয়ল, তারপর ককেসাস ...'

গেঙ্কা বলল, 'ককেসাস তো খাসা জায়গা! সেখানে খুবানি হয়।'

'মনে হচ্ছে সেখানে খুবানি হয়নি।' বলল স্লাভা।

ইগরের দিকে ফিরে মিশা প্রশ্ন করল, 'তারপর, ও ব্যাপারটার কী হল?'

ইগর জবাব দিল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

ইয়েলেনাও সায় দিল, 'হ্যাঁ, সব ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা নিতে পারো জিনিসটা। কিন্তু কী জন্য চাই বলো তো। একেবারে তো ভাঙাচোরা।'

ইগর বলল, 'তা ছাড়া টায়ারগুলোও রদ্দি।'

মিশা জবাব দিল, 'তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা মেরামত করে নেব'খন।'

ইয়েলেনা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু গাড়িটা দিয়ে কী করবে তোমরা?'

মিশা এড়িয়ে যাবার মতো জবাব দিল, 'এই, একটা কাজ করব ঠিক করেছি।'

ইয়েলেনা হঠাৎ বলল, 'তোমরা নিশ্চয় গুপ্তধনের খোঁজ করছ। আমি জানি, বুঝলে?'

চোখ গোল করে ইয়েলেনার দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা।

মিশা একেবারে লাল হয়ে উঠল, বলল, 'তোমার ও কথা মনে হল কেন?'

মেয়েটা হাসল।

'সে তোমাদের দেখেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।'

'কেমন করে?'

'জানতে চাও কেমন করে?'

'হ্যাঁ।'

'যে সব লোক গুপ্তধন খোঁজে তাদের ভয়ানক বোকা বোকা দেখায় কিনা।'

গেঙ্কা জবাব দিল, 'তোমার আন্দাজ ঠিক হয়নি। আমরা কোনো গুপ্তধনের খোঁজ করছি না। অন্তত আমি তো কখনো এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না সে তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

মিশা বলল, 'কিন্তু ... ঠাট্টা নয়, সত্যি করে বলো তো কবে আমরা গাড়িটা পাব, আর কতো দাম দিতে হবে?'

ইয়েলেনা বলল, 'তোমাদের যখন খুশি নিতে পারো, কিছু দিতেও হবে না। ও জিনিস দিয়ে আমাদের সার্কাসের কোনো কাজ হবে না।'

ইগর গম্ভীর হয়ে আরো জুড়ে দিল, 'হিসাব-রক্ষক বিভাগ থেকে ওটার নাম খারিজ হয়ে গেছে।' উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়িটা দেখল ইগর, 'ইয়েলেনা, চলো এবার যাবার সময় হল।'

ট্রাম পর্যন্ত ওদের পেণছে দিয়ে এল ছেলেরা। ট্রামস্টপের কাছে একজন ফেরিওয়ালা পা দাপাচ্ছিল আর নিজের ঠাণ্ডা হাতগুলো ঘষছিল। যে সরকারী খাদ্যবিভাগে লোকটা কাজ করে তার নাম ওর টুপিতে সোনালি অক্ষরে লেখা। টুপিটা কান অবধি টেনে দিয়েছে। ছেলেরা ওর কাছ থেকে মিষ্টি কিনল, ইয়েলেনা আর ইগরকেও ডাকল ভাগ নিতে। শেষে একটা ট্রামে চেপে ওরা দু'জন রওনা দিল নিজের রাস্তায়, ছেলেরাও হেংটে বাড়ি ফিরে চলল 'দেভিচিয়ে পলে' পেরিয়ে বলশায়া জারিৎসিনস্কায়া স্ট্রীট ধরে।

৫২

পোস্টার গাড়ি

শরতের বাতাস নির্জন স্কোয়ারের ওপর শুকনো পাতা নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। পাতাগুলোকে জড়ো করছে নেড়া গাছের চারপাশে, পাক খাইয়ে গির্জার পাথুরে সিঁড়ির ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে। কখনো শূন্য বেঞ্চিগুলোর ওপর বিছিয়ে রাখছে, আবার পথিকদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে ফের এলোমেলো দলা পাকিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অস্তোজেঙ্কা স্ট্রীটের ওপর দিয়ে — পাতাগুলোকে নিয়ে ফেলছে মোড়ের মাথায় ঝলমলে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাজানো যে ঠেলাগাড়িখানা দাঁড়িয়ে, তার চাকার নীচে।

গাড়িটার ওপর দুটো পাতলা তক্তা জুড়ে একটা ত্রিভুজ গড়া হয়েছে, তার ওপর নতুন একটা ফিল্‌মের পোস্টার বিজ্ঞাপন — ছবিটার নাম 'ব্রিগেড সেনাপতি ইভানোভ'। পাতলা কাঠে 'আর্ট সিনেমাগৃহ' এই অক্ষর কটা কেটে বের করে কোনোরকমে কায়ক্লেশে বসানো হয়েছে তক্তাদুটোর জোড়ের মাথায়।

এই পথে যারা রোজ চলাফেরা করে গাড়িখানা তাদের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে, কয়েকদিন ধরে দেখছে গাড়িটা ওই কোণটাতে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ যে ছেলেটা এসে টাকপড়া বুড়ো ডাকটিকিটওয়ালার দোকানের সামনে গাড়িখানা রেখে যায় বুড়ো তাকে গালিগালাজ করে, কিন্তু মুখে

একটি জবাবও দেয় না সে। শুধু চাকার সামনে একটা পাথর বসিয়ে রেখে চুপচাপ চলে যায়।

একদিন সন্ধ্যায় ছেলেটা এসে চাকার তলা থেকে লাথি মেরে পাথরটা সরিয়ে দিল, গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে ঢোকাল এক খিড়কির উঠোনে। তারপর গেল দরোয়ানের ঘরে।

গিয়ে দেখল লাল-চুলো রোগা তাতার দরোয়ান মেঝের ওপর খালি পা দুটো রেখে বসে আছে একটা ডবল বিছানায়।

ছেলেটা বলল, 'খুড়ো, আমার গাড়িটা ভেঙে গেছে। উঠোনে রেখে যাব?'

জানলা দিয়ে অলসভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে দরোয়ান বলল, 'কী? আবার?' তারপর মুখের ওপর হাতের তেলো রেখে হাই তুলে বলল, 'আচ্ছা, রেখে যাও ... লোকসান নেই কিছু।'

ছেলেটা ফের উঠোনের দিকে গিয়ে সাবধানে গাড়ির ওপর একবার নজর বুলিয়ে ওপরের কব্জাটা ছুঁয়ে তক্তার ওপর আল্‌তো টোকা মেরে সরে পড়ল।

আঙিনাটা খালি হয়ে গেল। জানলার আলোগুলোও নিভল। বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর বুড়ো ডাকটিকিটওয়ালা আর ফিলিন বেরিয়ে এল খিড়কির দরজা দিয়ে। গাড়িটার বেশ কাছ ঘেঁষেই দাঁড়াল দু'জন।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বুড়ো বলল, 'তাহলে সব ঠিকঠাক?'

ফিলিন বিরক্তভাবে জবাব দিল, 'হ্যাঁ। আর কতোকাল অপেক্ষা করবে ও? পুরো একটা বছর ধরে ওকে তুমি ঘোরাচ্ছ।'

বুড়ো বিড়বিড় করে বলল, ‘সংকেতের কথাগুলো বড়ো প্যাঁচালো, দেখলে মনে হয় গুপ্ত-ভাষায় লেখা। সূত্র না জেনে একবার পড়ার চেষ্টা করেই দেখ।’

বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিলিন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ‘কী লেখা আছে একবার শুধু যদি জানতে তাহলে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারতে।’

‘সে তো জানি। কিন্তু কী করব?’ হাতদুটো ছুঁড়ে বুড়ো বলল, ‘যা সম্ভব নয় তা কেমন করে করব? হয়তো ভালেরি সিগিজ্‌মুন্দভিচ্‌ আরো কিছুদিন সবুর করবে। একটু সবুর করাই ভালো।’

‘কিন্তু আর যে বসে থাকতে চাইছে না। সেটা মাথায় ঢুকেছে? আর বসে থাকার ইচ্ছে নেই ওর। দেখ রোববারের ভেতর যাতে সব তৈরি থাকে। আমি নিজে কিন্তু আসব না, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেব।’

ফিলিন চলে গেল। পেছন থেকে বুড়ো লোকটা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আর ফোকলা মুখে কী যেন চিবুতে লাগল। অবশেষে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। আলো-জ্বলা জানলার ভেতর দেখা যাচ্ছিল বুড়োর ঝুঁকে-পড়া দেহটা। রান্নাঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘোরাফেরা করছে। একটা প্রাইমাসের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কেতলির ঢালু গা বেয়ে লম্বা আগুনের শিখা উঠল।

এবার বুড়ো আলুর খোসা ছাড়াতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বেশ গুছিয়ে কাজ করে লোকটা, খোসাগুলো লম্বা হতে হতে অবশেষে বালতির মধ্যে খসে পড়ে। লোকটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোবার ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়ল যেন মন দিয়ে কিছু দেখছে। কিছুক্ষণ এইভাবেই থেকে বুড়ো মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঐ জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। লোকটা পর্দা টেনে দিল। এক হাতে পর্দা টানে, অন্য হাতে সেই ছোরার খাপটা। বেশ পরিষ্কার দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে। চামড়ার তৈরি কালো খাপ, মাথায় ধাতুর পাড় বসানো, একেবারে ডগায় একটা ছোট বল ...

দরোয়ান বেরিয়ে এল। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে হাই তুলল। তারপর হেঁটে চলে গেল ফটকের দিকে। ফটক বন্ধ করতে গিয়েছে এমন সময় এল গেঙ্কা আর স্লাভা।

দরোয়ান বলল, 'তোমাদের গাড়িটা নিয়ে যাও। খারাপ হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। যাও, বের করে নিয়ে যাও।'

চাকার তলা থেকে পাথর সরিয়ে ওরা গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল রাস্তায়। দরোয়ান ফটকে তালা মেরে দিল ...

নির্জন রাস্তার মোড়ে গাড়িটাকে টেনে আনল গেঙ্কা আর স্লাভা। ওপরের খিল খুলে দুটো পাল্লাই আলাদা করে ফেলল। ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মিশা ... ·

সে রাতে মিশা খুব দেরি করে বাড়ি ফিরল। মায়ের কাজের পালা পড়েছে রাতে।

জামা খুলে বিছানায় ঢুকল ও। প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল, মাথায় ঘুরপাক খায় ভাবনা।

গাড়ির ফন্দিটা কিন্তু বেড়ে হয়েছিল! পুরো এক হপ্তা ধরে প্রত্যেকটি দিন ওরা নজর রেখেছে ডাকটিকিটের দোকানটার ওপর। বুড়ো লোকটা কোনো মক্কেলকে এগিয়ে দেবার জন্য দরজার কাছে এলেই গাড়ির কাছে একবার করে দাঁড়াত আলাপ করবার জন্য, এক মুহূর্তও সন্দেহ করেনি যে ভেতরে কেউ আছে। রাতে গাড়িটাকে ওরা উঠোনের ভেতর রাখত, এইভাবে বুড়োর চলাফেরা নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়েছে ওরা। ছোরার খাপটাও দেখেছে অনেকবার। বলের ইস্ক্রু আলগা করে ধাতুর পাড়টা খুলে নিলেই জিনিসটা হাত-পাখার মতো খুলে যায়। পাখার ওপর কী যেন লেখাও আছে। শুধু যে জিনিসটা মিশা বুঝতে

পারেনি সেটা হল — সূত্র না জানলে সাঙ্কেতিক লিপি পড়তে পারবে না সে কথাটা বুড়ো কেন বলল ফিলিনকে? খাপের মধ্যেই তো সূত্র রয়েছে! তাহলে কোন্ জিনিসটা পড়বার চেষ্টা করছে সে ?

এখন কাজ হল সেই খাপটাকে জোগাড় করে সব পরিষ্কার করে ফেলা। অজানা লোকটার নাম ভালেরি সিগিজ্মুন্দভিচ্। লোকটা যে নিকিৎস্কিই তাতে সন্দেহ নেই। ওকে আর দ্বিতীয়বার দেখতে পায়নি ওরা সত্যি কথা, কিন্তু এখন দরকার হল খাপটা উদ্ধার করা। মিশা ভালো করেই জানে নিকিৎস্কি পরে ধরা পড়বেই। এখনই বরং সেটা আরো সহজ হয়ে গেল। বর্কাকে ঠকানো কিছুই কঠিন নয়। গাড়িটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ওটার ওপর বর্কার অনেকদিনের লোভ।

গাড়িটা অবিশ্যি হাতছাড়া হবে। বিজ্ঞাপন নিয়ে ঘোরার জন্য সিনেমার পাশ পাচ্ছে ওরা, কিন্তু ইস্কুল তো ফের সোমবার থেকে খুলবে, তখন এমনিতেও সিনেমা দেখার সময় পাবে না। আর পাইওনিয়র হয়ে ওসব কাজ ওদের করাও ঠিক নয়।

মিশার মনটা এবার চলে গেল পাইওনিয়র দলের ব্যাপারে। 'শিশু কমিউনিস্ট সপ্তাহ' এগিয়ে আসছে, ওদের দলকে একটা চিঠি লিখতে হবে জার্মানিতে, খেম্নিৎসের পাইওনিয়রদের কাছে। ভণ্ড সোশালিস্ট বিশ্বাসঘাতক শিদেমান আর নস্কের মতো লোকগুলোকে আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। তারপর জিনা ফ্রুগ্লোভার সঙ্গেও একটু ঝগড়া আছে। শিশুসদনের সেলাইয়ের ব্যাপারে মেয়েরা পেছিয়ে পড়েছে। দলের সভায় অবিশ্যি ঠিক করা হয়েছিল ছেলে মেয়ে সবাই সেলাই করবে, পুরুষ ও মেয়েদের খাটুনির মধ্যে কোনো তফাত ধরা হবে না, কিন্তু — সেলাই জিনিসটা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

৫৩

ছোরার খাপ

নিকোলস্কি গলিটার মোড়ে খোশমেজাজে শিস্ দিতে দিতে আসছে বর্কা। ওর হাতে চমৎকার করে বাঁধা একটা পুঁটলি। রাস্তায় একটুও দেরি করেনি বর্কা। ওর বাপ বলে দিয়েছিল যেন কোথাও না থেমে সাবধানে পুঁটলিটা নিয়ে বাড়ি চলে আসে।

হুকুমটা হয়তো ও অক্ষরে অক্ষরে মানত যদি না অবিশ্যি 'আর্ট' সিনেমার পোস্টার আঁটা ঠেলাগাড়িখানা ওর নজরে পড়ত। গির্জার আঙিনায় রয়েছে গাড়িটা। মিশা, গেঙ্কা, স্লাভা আর করোভিন ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওরা গাড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর জোর কথা কাটাকাটি করছে।

বর্কা এগিয়ে গেল। ছেলেগুলো কী করছে জানা দরকার।

মিশা বলছিল, 'শুধু টায়ারগুলোই ধর্ না।' বর্কাকে আসতে দেখে চাকার ওপর পা দিয়ে গুঁতো মেরে বলল, 'যে কোনো সময় ওগুলোর ভালো দাম পাবি।'

করোভিন নাক সিঁটকে বলল, 'দাম তো আমি বলেই দিয়েছি!'

গেঙ্কা বলল, 'হ্যাঁঃ, রেখে দে! এই গাড়ির জন্য কেবল পাঁচ রুবল?'

ছেলেদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল বর্কা, 'গাড়িটা বেচবি নাকি রে?'

মিশা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তোর তাতে কী?'

'না, এই জানতে ইচ্ছে হল। এমনি জিজ্ঞেস করতেও কী দোষ?'

'ভাগ্ এখান থেকে! আমাদের সময় নষ্ট করিসনি।'

'কিনতেও তো পারি!'

'বেশ তো! কেন্ না!'

'কতো দাম চাইছিস?'

'দশ রুবল।'

বর্‌কা হাঁটু মুড়ে বসে গাড়িটা পরীক্ষা করতে লাগল। মাটির ওপর পুঁটলিটা রেখে টায়ারগুলো টিপতে লাগল।

গাড়ির হাতল দুটো ধরে মিশা বলল, 'এই, টিপে কোন লাভ নেই। চাকায় বল-বেয়ারিং দেওয়া রয়েছে। দ্যাখ্‌ না কেমন চমৎকার চলে।' গাড়িটাকে ঠেলে বলল, 'শুনতে পাচ্ছিস?'

গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বর্‌কা হাঁটতে থাকে, ওস্তাদের মতো কান পেতে চাকার আওয়াজ শোনে।

মিশা বলল, 'আপনা আপনিই চলে। দ্যাখ্‌ না একবার চালিয়ে।'

বর্‌কা হাতল ধরে গাড়ি ঠেলল। সত্যিই বেশ গড়গড়িয়ে চলে।

গেঙ্কা আর স্লাভাও গাড়ির পেছন পেছন চলল, সাবধানে করোভিনকে ওরা আড়াল করে রাখে। পুঁটলিটার কাছেই বসেছে করোভিন।

ওপরের কব্জা খুলে পাতলা কাঠের পাল্লাদুটো পাশে সরিয়ে রেখে মিশা বলল, 'এইবার দ্যাখ্‌ আসল মজাটা। দেখেছিস? ইচ্ছে করলে ভেতরে ঘুমোতেও পারবি।'

বর্‌কা বলল, 'মিছেই দর বাড়াচ্ছিস। রবারগুলো তো সব ক্ষয়ে গেছে।'

'কী? চোখদুটো চেয়ে ভালো করে পড়ে দ্যাখ্‌: "ত্রিউগল্‌নিক কারখানা। পয়লা নম্বরের জিনিস"।'

'কী লেখা আছে তা দিয়ে আমার দরকার? রঙ তো এদিকে উঠে যাচ্ছে। আরো সস্তায় দে।'

করোভিন হঠাৎ বলল, 'ঠিক আছে রে মিশা।' তখনো বর্‌কার পুঁটলিটার কাছে বসে ছিল। 'আমিই গাড়ি নেব।'

বর্‌কাকে বেচবার আগ্রহ মিশার নিমেষে উপে গেল।

'সাবাস্‌। নিয়ে নে ... তুই আর পেলি না রে হাড়কিপ্‌টে।'

'আমি হয়তো আরো বেশি দাম দিতাম।'

'এখন আর নয়। সে তুই দিবিনে।'

'কেন?' এগিয়ে পুঁটলিটা তুলে নিল ও।

মিশা দাঁত বের করে বলল, ‘কেন তা জানতে চাস?’

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে ছেলেদের দিকে তাকাল বর্‌কা। সবাই ওকে ঠাট্টা করছে। শুধু করোভিনই গম্ভীর, যেমন ও বরাবর থাকে।

বর্‌কা বলল, ‘বেশ তো, যদি বেচতে না চাস ভালো কথা। তবে যেন আবার সাধতে আসিস না। তখন কুড়ি কোপেকও দেব না।’

শিস্‌ দিতে দিতে চলে গেল বর্‌কা।

ও বাঁক ঘুরে যেতেই ছেলেরা গির্জার পেছনে গিয়ে হাজির হল। পকেট থেকে করোভিন ছোরার খাপটা বের করল।

উত্তেজিতভাবে মিশা ছিনিয়ে নিল ওটা। হাতের ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সাবধানে পাড়টা সরিয়ে প্যাঁচ খুলে বল টেনে বের করল।

ভাঁজ খুলতেই হাত-পাখার মতো হয়ে গেল খাপটা। এক মিনিট ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে রইল জিনিসটার দিকে তারপর অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল...

খাপের ভেতর দিকটায় তালিকার আকারে কতগুলো ফুটকি, ড্যাশ আর গোল দাগ সাজানো। ঠিক ছোরার ভেতরের সেই পেঁচিয়ে রাখা ধাতুর পাতেরই মতো।

ব্যস্‌, আর কিছু নেই।
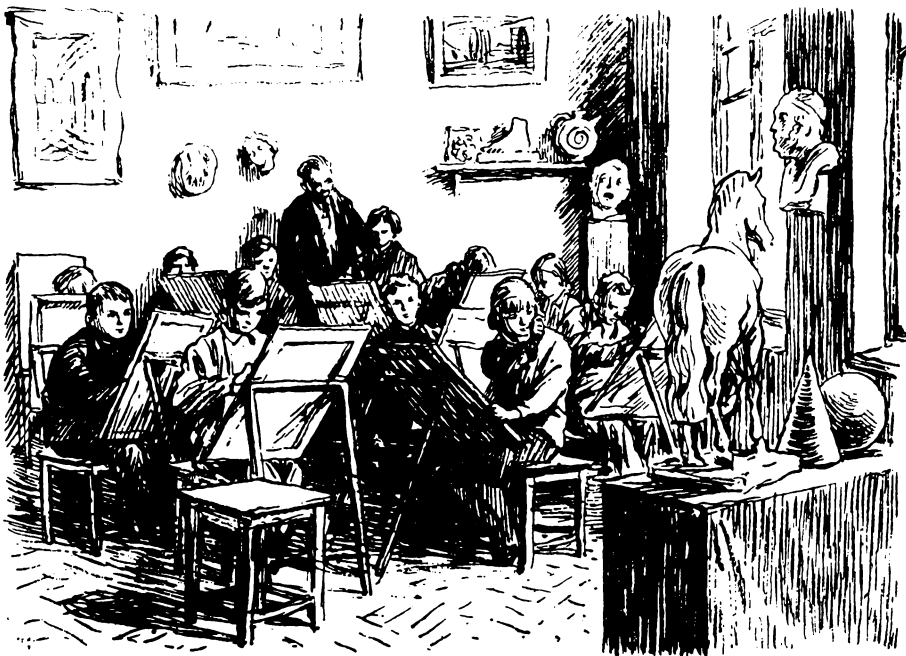
পঞ্চম পর্ব

সপ্তম শ্রেণী

৫৪

ব্রশা মাসি

অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী অ্যালেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভ্না ক্লাসে ঢুকে পড়া শুরু করতে গিয়ে দেখেন চক্ নেই।

কড়া দৃষ্টিতে মিশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মনিটর, চক নেই কেন?'

'নেই নাকি?' ডেস্ক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল মিশা। বিস্ময়ের ভান করে চোখদুটো বড়ো বড়ো করে রইল। 'ক্লাস শুরু হবার আগেও তো ছিল খানিকটা।'

'এ কী আপদ! জিনিসটা উড়ে গেল তাহলে? যাও নিয়ে এসো ফের।'

ক্লাসরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে মিশা দৌড়ে গেল পোষাক-ঘরে চকের খোঁজে; সেখানে গিয়ে দেখে ইস্কুলের ঝি-মা ব্রশা মাসি কাঁদছে।

মিশা তাকে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? কাঁদছো কেন ব্রশা মাসি? কেউ তোমায় দুঃখ দিয়েছে?'

ইস্কুলের কেউই ঠিক জানত না ব্রশা মাসির 'ব্রশা' নামটা কী করে হল। হয়তো ওইটেই ওর আসল নাম, কিংবা হয়তো বড়ো হলদে একখানা 'ব্রোচ্' সবসময় ওর থুতনির নিচে ডোরাকাটা ব্লাউজে আঁটা থাকে বলেই 'ব্রশা' নাম। আবার এও হতে পারে ওর চেহারাটা সত্যিই ব্রোচের মতো দেখতে — তেমনি বেঁটেখাটো গোলগাল বুড়ি মানুষ। পোষাক-ঘরে ব্রশা মাসিকে সব সময়ই পাওয়া যাবে, সেখানে বসে হরদমই মোজা বুনে চলেছে। সবাই বলে ও নাকি মন্তর পড়ে চোখের আঞ্জুনি সারিয়ে দিতে পারে। শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বিড়বিড় করে কী বলবে, ব্যস্ দু'দিনে আঞ্জুনি উধাও।

সেই ব্রশা মাসি এখন পোশাক-ঘরে বসে কাঁদছে।

মিশা সাধতে লাগল, 'বলো না কে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?'

ব্রশা মাসি রুমালে চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তিরিশ বছর এখানে খাটলুম, কোনোদিন কারুর গালমন্দ শুনিনি আর আজ আমি নাকি বোকা-হাঁদা বুড়ি হয়ে গেছি। এতদিনে এই পুরস্কার মিলল আমার।'

'কে? কে বলেছে ও কথা?'

উদাসীনভাবে ব্রশা মাসি বলল, 'যাহোক ভগবান ওকে ক্ষমা করবেন।'

মিশা রেগে গিয়ে বলল, 'এর সঙ্গে ভগবানের কী সম্পর্ক? তোমায় অপমান করে এমন ক্ষমতা কার? কে অপমান করেছে?'

'য়ুরা স্তোৎস্কি। দেরি করে ইস্কুলে এসেছিল। আমার ওপর হুকুম আছে দেরি করে এলে ঢুকতে দেবে না। বললুম, যাও হেডমাস্টার মশাইকে বলো, উনি তোমায় খেয়ে ফেলবেন না। তার উত্তরে আমায় বলল কিনা "হাঁদা বুড়ী কোথাকার"। ওর বাপ মা লোক ভালো। বিপ্লবের আগে এ ইস্কুল যখন জিমনাসিয়া ছিল তখন ওর মা এখানে পড়তে আসতেন। কিন্তু, মিশা, শোন্ বাছা, কাউকে যেন বলিসনি এসব কথা!' উদ্বেগের সঙ্গে ফিসফিস করে বলল ব্রশা মাসি।

মিশার কানে তখন আর কথা যাচ্ছিল না। চকটা তুলে নিয়েই ও একেক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমে অস্থির হচ্ছিল ফিলিয়া কিতভ্। ডাকনাম ওর 'কিৎ'*। আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভ্না যেভাবে মুখ বুজে আছেন, তাতে মনে হচ্ছে লক্ষণ খারাপ। 'সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের কোণগুলিও সমান' প্রমাণ করতে গিয়ে 'কিৎ' ত্রিভুজের কর্ণের বর্গকে বাহুগুলোর বর্গের যোগফল দিয়ে গুণ করে এখন হাঁ করে চেয়ে রয়েছে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে, ফলাফল দেখে স্তম্ভিত। সপ্তম শ্রেণীতে ওর এই নিয়ে দু'বছর হল, খুব সম্ভব তৃতীয় বছরটাও এখানেই থাকবে। ক্লাসে বসে কেবল ঝিমোয়, আর নাহলে পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে ডেস্কে দাগ কাটে। আর এমন পেটুক যে টিফিনের সময় বন্ধুদের কাছে খালি হাত পাতে, একটা কিছু হলেই হল! খিদে যে পায় তা কিন্তু মোটেই নয়।

'কই, বলে যাও!' আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভনার গলার স্বরে ও পরিষ্কার টের পেল সামনে বিপদ।

করুণ আবেদনভরা চোখে 'কিৎ' ক্লাসের দিকে তাকাল।

শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'বোর্ডের দিকে তাকাও।'

অসহায় মোটা পিঠখানা ফের ক্লাসের দিকে ঘুরিয়ে দাঁড়াল ও, কটা মাথার চাঁদিতে চুলের গোছাটাও যেন একেবারে ভড়কে গেছে।

---

* কিৎ — মানে তিমিমাছ।

আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভনা ডেস্কগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে কড়া নজরে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাচ্ছেন। ছোটখাটো পাতলা মানুষ, মাথার ওপর উঁচু করে চুল বাঁধা, লম্বা নাকের ওপর পাউডারের ছোপ। কোনো জিনিস ওঁর চোখ এড়ায় না, সামান্যতম অনাচারও উনি কখনো সহ্য করেন না। তিনি পেছন ফিরে দাঁড়াতেই জিনা ক্রুগ্‌লোভা হাত তুলে আঙুল মেলে ধরে ক্লাসের সবাইকে জানিয়ে দিল ঘণ্টা পড়তে আর ক'মিনিট বাকি।

দেয়ালের কাছেই য়ুরা স্তোৎস্কির ডেস্ক। জানলা দিয়ে সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

মিশা রাগভরা চোখে একবার য়ুরার দিকে তাকাল। 'হতচ্ছাড়া দেমাকী! ঠাণ্ডার তোয়াক্কা করে না দেখাবার জন্য হাঁটুর ওপর প্যাণ্ট টেনে ঘুরে বেড়ায়। ভাবে "পেচোরিন"* বনে গেছে! একটা প্রশ্নপত্রের ফরমে পর্যন্ত লিখেছিল: "আমি পেচোরিনের মতো হতে চাই।" দাঁড়াও না, পড়া শেষ হোক, দেখিয়ে দেব পেচোরিন কাকে বলে!'

নোট-বই থেকে সাবধানে একটা পাতা ছিঁড়ে হাতের আড়ালে রেখে মিশা লিখল:

'য়ুরা স্তোৎস্কি ব্রশাকে হাঁদা বুড়ী বলেছে। ব্রশা কাঁদছে। বিষয়টা আলোচনার জন্য একটা সভা ডাকা দরকার।' বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লিখতে হল বলে অক্ষরগুলো সব ট্যারা বাঁকা হয়ে গেল।

চিঠিটা ও ঠেলে দিল স্লাভার দিকে। স্লাভা পড়ে রাজি হবার ভঙ্গিতে মথা নাড়ল। মিশা কাগজটা ভাঁজ করে ওপরে লিখল, 'শুরা অগুরেয়েভ আর গেংকা পেত্রোভ্‌কে।' তারপর ছুঁড়ে দিল পাশের ডেস্কে।

শুরা পড়ল, এক সেকেণ্ড কী ভেবে নিয়ে লিখল: 'সবচেয়ে ভাল হয় ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করা। অভিযোগ পেশ করব আমি।' চিঠিটা ফের

---

* পেচোরিন — বিখ্যাত রুশ কবি মিখাইল লেরমন্তভের (১৮১৪-১৮৪১) লেখা 'আমাদের সময়কার নায়ক' উপন্যাসের নায়ক। তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সাধারণ লোকের প্রতি পেচোরিনের ঘৃণা, অহঙ্কার ও সংশয় লেখকের মনে ছিল।

ভাঁজ করে নেক্রাসভ বোনেদের দিকে ছংড়ে দিল। কিন্তু আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভ্না টের পেলেন পেছনে কিছু একটা ব্যাপার চলেছে, চট্ করে মাথাটা ফেরালেন উনি। জিনা ক্রুগলোভা ছাড়া আর সবাই স্থির হয়ে বসে ছিল, ও তখন সবে আঙুল মেলে ধরে হাতটা নিচু করেছে।

আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভনা বললেন, 'ক্রুগলোভা, বোর্ডে যাও তো।'

কিং ধীরে ধীরে নিজের ডেস্কে ফিরে এল।

নেক্রাসভ বোনেরা চিঠিটা চালান করে দিল লিওলিয়া পদ্‌ভলোৎস্কায়াকে, সে দিল গেঙকার হাতে। গেঙকা পড়ে জবাব লিখল, 'আচ্ছামতো শিক্ষা দিতে হবে যাতে ওর মনে থাকে।'

একই পথে চিঠিটা আবার ঘুরে এল মিশার কাছে। শুরা আর গেঙকার জবাব পড়ে স্লাভাকেও সে পড়তে দিল। স্লাভা অসম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। তারপর মিশা ফের চিঠিটা নিয়ে যেই আবার লিখতে গেছে অমনি স্লাভা ডেস্কের তলা দিয়ে ওকে গুঁতো দিল। মিশা খেয়ালই করল না। স্লাভা আবার পা দিয়ে গুঁতো মারল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভনা ততক্ষণে ওর মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। চিঠির জন্য হাতটা বাড়ালেন উনি।

'কী লিখছ?'

মিশা হাতের মধ্যে কাগজটা দলা পাকিয়ে নীরবে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'হাতে কী আছে দেখাও!'

মিশা জবাব দিল না, নকশা এঁটে রাখার জন্য যে বোর্ডখানা দেয়ালে টাঙানো আছে সেইটার দিকেই সে তাকিয়ে রইল।

মৃদু গলায় শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়ার সময় কী লেখা হচ্ছে?' মিশার একসারসাইজ খাতার নিচে একখানা বই ওঁর নজরে পড়ল। তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা দিয়ে তুমি কী করছ?' তারপর গোটা ক্লাসটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উনি বইয়ের নাম পড়লেন, ' "প্রাচীন কাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর

সূচনা পর্যন্ত তরবারি কৃপাণ ইত্যাদির ইতিহাস, বর্ণনা ও নকশা।” ক্লাসের পড়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন সব বই পড়ো কেন?’

‘পড়ছিলাম না। আমার ডেস্কের ওপর রেখেছিলাম শুধু।’ মিশা বোঝাতে চেষ্টা করল।

‘চিঠি লেখালেখিও করছিলে না বোধ হয়? নিজের ওপর তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তুমি হলে ক্লাসের মনিটর, ইয়ং পাইওনিয়র, তার ওপর ইস্কুল কমিটির সভ্য। হেডমাস্টারের কাছ থেকে এ বই ফেরত পাবে, আপাতত ক্লাস ছেড়ে চলে যাও।’

ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মিশা সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইল।

৫৫

ছাত্রদের সভা

বারান্দায় জানলার চৌকাঠের ওপর বসেছে মিশা। জানলার সামনেই ইস্কুলের বরফে ঢাকা খেলার মাঠ আর ক্রিভোআরবাৎস্কি গলি। সন্ধ্যে হতে দেরি আছে তবু গলির ওপাশে রাস্তার দুটো বাতি এখনই জ্বলে উঠেছে।

বারান্দাটার ভেতর সব চুপচাপ। ফোটানো জলের কড়ার নিচে একটা বালতি, তাতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে শুনতে পায় মিশা। ওপর তলার ব্যায়াম ঘরে পিয়ানো বাজছে—ট্রাম্ ট্রাম্, টারা টারা, ট্রাম টা টা, ট্রাম টা টা, আর সেই সঙ্গে পায়ের তাল, টা টা, ট্রাম টা টা ...

একটু বেকায়দায় পড়েছে মিশা সন্দেহ নেই তাতে। হেডমাস্টার আলেক্সেই ইভানভিচ্ মশাই তো দেখা করতে গেলেই বইটার কথা জিজ্ঞেস করবেন জানা কথা ... কেন, কোত্থেকে, কী জন্য সবই জানতে চাইবেন ... আর ওঁর কাছে কিছু চেপে রাখাও মুশকিল। আগাগোড়া আসল তথ্যটুকু উনি বার করে ছাড়বেনই। ওঁর চোখদুটো যেন একেবারে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেয়।

সব ওই দেমাকী স্কাউট য়ুরাটার জন্য। সবসময় দেমাক দেখায়, একেবারে বুর্জোয়ার মতন।

ঘণ্টা বাজল। দরজার আওয়াজ আর পায়ের শব্দ, চেঁচামেচি আর হাসাহাসিতে নিস্তব্ধতাটুকু ভেঙে গেল।

ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে এল য়ুরা স্তোৎস্কি।

মিশা ওকে আটকাল। বলল, 'ব্রশা মাসিকে কেন অপমান করেছিস?'

নাক সিঁটকোনো ভাব দেখিয়ে য়ুরা বলল, 'তোর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না!'

'তোর ওই গুমোর রাখ, নয়তো কেমন করে চলতে হয় শিখিয়ে দেব!'

ক্লাসের বন্ধুরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল।

মিশা বলেই চলেছে, 'ইস্কুলের কর্মচারীদের গালমন্দ করা তোর স্বভাব, আমরা ওসব পছন্দ করি না, বুঝলি? এটা তোর বাড়ি না আর ওরাও তোর চাকর-চাকরানি নয় যে তম্বি দেখাবি।'

ছেলেমেয়েদের ভিড় ঠেলে য়ুরার পাশে এগিয়ে এল গেঙ্কা। বলল, 'কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছিস মিশা! কেমন করে ওকে শিক্ষা দিতে হয় এই দ্যাখ্!'

য়ুরার দিকে তেড়ে গেল গেঙ্কা, কিন্তু মিশা ওকে আটকাল, 'থাম্, এই!' য়ুরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন্ স্তোৎস্কি। ব্রশা মাসির কাছে মাপ চাইতে হবে তোকে।'

'কী?' অবাক হয়ে সরু সরু ভুরুদুটো উঁচু করল য়ুরা, 'একটা ঝাড়ুদারণীর কাছে মাপ চাইতে যাব আমি?'

'আজ্ঞে।'

য়ুরা নাক কোঁচকাল, 'আজ্ঞে না, তা হবে না।'

কড়া গলায় মিশা বলল, 'তাহলে ঘাড় ধরে মাপ চাওয়াব। যদি না চাস ক্লাস সভায় তুলব কথাটা।'

'তোদের ক্লাস সভায় ওয়াক্ থু!'

'থ্তু ফেলে দেখ দিকি!'

'সে আমিই দেখে নেব!'

'আচ্ছা আমরাও দেখে নেব!'

সেদিনের শেষ ক্লাসে ছিল জার্মান পড়া, কিন্তু ক্লাস শুরু হবার আগেই গেঙ্কা ছুটে এল ক্লাসঘরে। চেঁচিয়ে বলল:

'কী মজা! আল্মা আজ আসেনি! বইপত্তর গোটাও!'

মিশা ওকে থামাল, 'সবুর।' ক্লাসের দিকে ফিরে উঁচু গলায় বলল, 'আস্তে। এখন আমাদের ক্লাস সভা হবে।'

গেঙ্কা গোমড়া হয়ে টেনে-টেনে বলল, 'এ কী আপদ! দু'ঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরতে পারতাম।'

লিওলিয়া পদ্ভলোৎস্কায়া বিড়বিড় করে বলল, 'সভা যেন আর অন্য সময় করা যেত না।' দীঘল চেহারার সুন্দরী মেয়েটি, মাথায় সোনালি চুল।

শুরা বলল, 'মিশাটার মাথায় কেবল একেকটা মতলব ঘুরছে।'

কিৎ জানিয়ে দিল, 'আমি বাবা মিটিঙ-ফিটিঙে থাকতে পারব না। খিদে পেয়েছে।'

'থাকতে হবে। খিদে তো তোর সব সময়ই লেগে আছে। মিটিঙ আমরা করব, ব্যস্, আর কোনো কথা নয়।' বলেই মিশা দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

সবাই যার যার ডেস্কে গিয়ে বসল।

মিশা ঘোষণা করল, 'য়ুরা স্তোৎস্কিকে নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা হবে। যা যা ঘটেছে সব তোমাদের সামনে হাজির করছে গেঙ্কা পেত্রোভ।'

গেঙ্কা উঠে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি সহযোগে একেকটা কথা বলতে থাকে:

'য়ুরা স্তোৎস্কি আমাদের ক্লাসের সুনামে কালি দিয়েছে। ব্রশা মাসিকে ও হাঁদা বুড়ী বলেছে। কেলেঙ্কারি ব্যাপার! এটা তো আর জারের আমল নয়। যদি হেডমাস্টার মশাই হতেন তাহলে অবিশ্যি ওকথা বলতে ওর সাহসই হত না, কিন্তু ব্রশা মাসি ইস্কুলের সামান্য ঝাড়ুদার, সুতরাং তাকে অপমান করা যেতে

পারে — এই নাকি? এসব বাবুর চাল এখন ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে। তাছাড়া স্কাউটরা তো বুর্জোয়াদেরই ধামা-ধরা। ইস্কুল থেকে স্তোৎস্কিকে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করছি আমি।'

এবার উঠল স্লাভা। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করল:

'স্তোৎস্কির উচিত নিজের চালচলনটা একটু যাচাই করে দেখা। নিজের খুশিমতো চলব, ক্লাসের আর কারুর ধারই ধারব না — এই হল ওর দস্তুর। পেচোরিনকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে ওর কোনো উপকারই হবে না। ঘুণ-ধরা অভিজাত সমাজের লোক হল পেচোরিন। সকলেরই জানা কথা। য়ুরাকে মাপ চাইতে হবে ব্রশা মাসির কাছে, ইস্কুল থেকে তাড়ানোটা একটু বেশি রকমের কড়া শাস্তি হবে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

লিওলিয়া পদ্‌ভলোৎস্কায়া হাত তুলল।

'পাইওনিয়ররা য়ুরাকে কেন আক্রমণ করছে তা আমি বুঝতে পারছি না।' গরম মেজাজে বলল ও, 'গেঙ্কা ওর চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুণ্ডা, অথচ সে কিনা পাইওনিয়র। এটা ঠিক নয়। প্রথমে আমাদের য়ুরার বক্তব্যটাই শোনা দরকার, হয়তো এমন কোনো ব্যাপার আদপেই ঘটেনি।'

ডেস্ক ছেড়ে উঠল না স্তোৎস্কি। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল:

'প্রথম কথা হল আমি এখন আর স্কাউট নই। গেঙ্কা যা জানে না তাই নিয়ে যেন চালাকি খাটাতে না আসে। আর তাছাড়া ও হেডমাস্টার নয় যে সবাইকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে বেড়াবে। বড়ো বেশি মাতব্বরি ফলায় ও। দু'নম্বর কথা, পোশাক-ঘর বন্ধ রাখা হবে এ আমি মেনে নিতে পারি না। ওতে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়। তৃতীয়ত, অন্যের কাছে আমার ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ক্ষমা আমি চাইব না। হেঁজিপেঁজি যার তার কাছে নিজেকে আমি ছোট করতে চাই না। তোমাদের যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারো।'

শুরা অগুরেয়েভ এবার বলতে উঠল। একেবারে মাস্টারদের ডেস্কের সামনে গিয়ে ক্লাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে ও বলতে লাগল:

'কমরেডগণ, ব্রশার এই ঘটনাকে আমাদের আরো গভীরভাবে বিচার করে দেখতে হবে। অবস্থাটা কী, কমরেডগণ? দুটো তথ্য আমাদের সামনে রয়েছে। প্রথম: অপমান করা হয়েছে একজন স্ত্রীলোককে, যেটা নাকি অসহ্য। দ্বিতীয়ত "হাঁদা" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের যত শব্দ আমাদের ভাষাকে, আমাদের মহান্, প্রাণবান্, অপূর্ব সুন্দর ভাষাকে কলঙ্কিত করছে — বলেছেন নেক্রাসভ ...'

মিশা সংশোধন করে দিল, 'নেক্রাসভ নয়, তুর্গেনেভ।'

বিজ্ঞের মতো শুরা বলল, 'না। নেক্রাসভ প্রথমে বলেছিলেন, তারপর তুর্গেনেভ কথাটা ফের আউড়েছিলেন। মৌলিক রচনা পড়্, তাহলে জানতে পারবি ... আমি প্রস্তাব করি এই শব্দটা এবং এই ধরনের অন্য শব্দগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক্।'

নিজের বক্তৃতাতে শুরা নিজেই বেশ খুশি হল। ডেস্কে ফিরে এসে ভারিক্কি চালে বসল।

'আর কেউ বলতে চাও?' প্রশ্নটা করেই মিশা দেখল জিনা ক্লুগ্‌লোভা যেন উশখুশ করছে বলবে কি বলবে না। বলল, 'জিনা, বলেই ফেল না। ভয় কিসের?'

উঠল জিনা।

তড়বড় করে বলতে শুরু করল, 'মেয়েরা, এ বড়ো সাংঘাতিক কথা! ব্রশা মাসিকে আমি কাঁদতে দেখেছি। য়ুরার পক্ষ হয়ে বলবার মতো কিছুই নেই। আর লিওলিয়ার যদি ওকে পছন্দ হয়ে থাকে সে কথা বললেই পারে! তারপর ধরো শুরার কথা। মেয়েদের সম্বন্ধে তো কতো ভালো ভালো কথাই ও বলল, কিন্তু ক্লাসের পড়ার সময় ও মেয়েদের কাছে চিঠিপত্র লেখে। সেটাও তো ঠিক কাজ নয় ... তারপর গেঙ্কা পেত্রোভের কথা একটু বলতে চাই। পড়ার সময় ও কেবলই আমাকে হাসায়,' বলতে বলতে হি হি করে হেসে ফেলল জিনা। বসে পড়ল।

শেষ বলার পালা মিশার। ও বলল, 'ব্রশা মাসিকে স্তোৎস্কি অপমান করেছে, কারণ ওর ধারণা ব্রশা মাসির চেয়ে ও অনেক উ'চুদরের লোক। কিন্তু ওর নিজেরই বা এমন কোন গুণটা আছে? কিছু না। ব্রশা মাসি ইস্কুলে তিরিশ বছর কাজ করেছে, সমাজের জন্য ও সত্যিকারের কর্তব্য করে চলেছে। অথচ যুরা এখনো ওর বাবার ওপর খাচ্ছে, জীবনে কুটোটি অবধি নাড়েনি কোনোদিন। তবু যারা খেটে খায় তাদের অপমান করে ও। আমার প্রস্তাব, যুরা স্তোৎস্কিকে ব্রশা মাসির কাছে মাপ চাইতে হবে, তা যদি না চায় তাহলে ইস্কুল কমিটির কাছে ব্যাপারটা তোলা হবে। সারা ইস্কুল তখন ওর স্বভাবের বিচার করুক।'

সভায় সিদ্ধান্ত হল স্তোৎস্কিকে ব্রশা মাসির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

৫৬

সংকেত-ভাষা

সভার পর মিশা গেল হেডমাস্টারের কামরায়।

আলেক্সেই ইভানভিচ টেবিলে বসে একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। মিশার কাছ থেকে এই বইটাই তখন নিয়েছিলেন আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভনা। মিশা ঢুকতেই হেডমাস্টারমশাই একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো।'

মিশা বসল।

হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'সভায় তোমরা কী আলোচনা করছিলে?'

মিশা সব বলল।

'সিদ্ধান্ত নেওয়া তো হল একেবারে শুরুর কাজ। তোমাদের দেখতে হবে যাতে স্তোৎস্কি সত্যিই ক্ষমা চায় আর ওকে বোঝাতে হবে ওর আচরণ কি নিকৃষ্ট ধরনের।'

আলেক্সেই ইভানভিচ থামলেন।

ফের বলতে লাগলেন, 'সভায় তোমার নিজের স্বভাব নিয়ে আলোচনা হয়েছিল?'

মিশা লাল হয়ে উঠল, ‘আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।’

‘পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সব বই পড়া আর চিঠি লেখার কথা বলছি।’

‘আমি তো পড়ছিলাম না বইটা। আমার ডেস্কের ওপর পড়েছিল এই মাত্র। লেখার কাজ তো আমি ঠিকই করেছি।’

মিশার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখে আলেক্সেই ইভানভিচ্ বললেন, ‘আমায় বলো তো পলিয়াকোভ, তলোয়ার ছোরা এসব ব্যাপারে তোমার উৎসাহ কেন?’

মেঝের দিকে চোখ রেখে মিশা জবাব দিল, ‘এমনি, ভালো লাগে তাই।’

যেন মিশার কথা শুনতেই পাননি এমনিভাবে বলে চললেন আলেক্সেই ইভানভিচ্, ‘তাছাড়া তোমার আর তোমার বন্ধুদের তো সঙ্কেত-ভাষার ব্যাপারে খুব উৎসাহ। জিনিসটা খুব ভালোই, কিন্তু ও দিয়ে তোমাদের কী হবে বলতে পারো?’

মিশা জবাব দিল না। আলেক্সেই ইভানভিচ্ ভান করলেন যেন ওর নীরবতাটুকু লক্ষ্যই করেননি। বলে চললেন:

‘তোমাদের বাতিকটা তো খুবই মজার, কিন্তু যা চাও তেমন কোনো ফল পাও তোমরা? যদি ঠিক মতো ফল পেয়ে থাক তাহলে অবিশ্যি চালিয়ে যাও. কিছু না হলে আমাকে জানিও। হয়তো আমি সাহায্য করতে পারব।’

মিশা চট্ করে ভেবে নিল। সেই পাতখানা ওঁকে দেখানো কি ঠিক হবে? আজ দু’মাস ধরে তো ওরা চেষ্টা করছে. এক চুলও এগোতে পারেনি। ছোরা আর ছোরার খাপে একই রকম চিহ্ন আঁকা — সমাধানটা যে কোথায় মিশা আর ওর বন্ধুরা তার কোনো কিনারাই করতে পারেনি। তার মানে পলেভোয় ভেবেছিল সঙ্কেত-লিপির সূত্র রয়েছে খাপের মধ্যে আর নিকিৎস্কি ভেবেছিল সেটা আছে ছোরায়। আসলে ছোরা বা খাপ, কোনোটার মধ্যেই চাবিকাঠি নেই ... হেডমাস্টার-মশাইকে দেখাতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয় বোধ হয়... আলেক্সেই ইভানভিচ্ না পড়তে পারলে আর কেউই পারবে না।

নিঃশ্বাস ফেলে পকেট থেকে ছোরার হাতলের সেই জড়ানো ধাতুর পাতখানা বের করল মিশা, দিল আলেক্সেই ইভানভিচের হাতে।

'এই হল জিনিসটা। আমরা লেখাগুলোর অর্থই খুঁজে পেলাম না। মনে হচ্ছে এটা সংকেত-ভাষায় লেখা। তবে এর মানে কী তা তো জানিনে।'

পাতখানা ভালো করে দেখে আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'হ্যাঁ, সংকেত-ভাষার মতোই তো দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। আগেকার দিনে রুশ ইতিহাসপঞ্জী লেখা হত এক রকম সংকেত-ভাষা দিয়ে এ হচ্ছে তাই। দু'রকমের হত জিনিসটা: সহজ আর জটিল। সহজটাকে আবার "আবোলতাবোল" বর্ণমালাও বলা হত, যার থেকে আমরা "আবোলতাবোল" কথাটা পেয়েছি। সাধারণত বেশ সহজ সংকেত-ভাষা থাকত। বর্ণমালার অক্ষরগুলো দুটো সারিতে লেখা হত: উপরের অক্ষরগুলোকে নিচের অক্ষরগুলোর বদলে ব্যবহার করা হত আর নিচের অক্ষরগুলো বসত উপরের হরফের জায়গায়। আর জটিল সংকেত-ভাষা ছিল এর চেয়েও হেঁয়ালিভরা। গোটা বর্ণমালাকেই তিন পংক্তিতে ভাগ করা হত। প্রথম পংক্তিটার জায়গায় বসত "ফুট্কি" চিহ্ন। যেমন ধরো "এ" বলতে একটা ফুট্কি, "বি" — দুটো ফুট্কি, এমনি ধারা। দ্বিতীয় পংক্তিটা বোঝানো হত "ড্যাশ্" চিহ্ন দিয়ে। যেমন "এল্" — একটা ড্যাশ্, "এম" — দুটো ড্যাশ্, এইরকম। তারপর তৃতীয় পংক্তিটার জায়গায় বসত "গোল দাগ"। একটা গোল দাগ দিয়ে পংক্তির প্রথম অক্ষর, দুটো দিয়ে দ্বিতীয়, এমনি করে। চিহ্নগুলো স্তম্ভাকারে সাজানো হত। এখন বুঝতে পেরেছ?'

'এতো খুব সোজা!' মিশা বলল, 'এখন বুঝলাম পাতটার লেখা কীভাবে পড়তে হবে।'

'না।' আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'সোজা হত যদি এই লেখাটার প্রত্যেকটা স্তম্ভে দশটা করে চিহ্ন থাকত, কিন্তু এখানে একেকটা স্তম্ভে খুব বেশি করে হলেও পাঁচটার বেশি তো নেই ...'

আলেক্সেই ইভানভিচ আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন:

'এটা যদি সংকেত-ভাষাই হয় তাহলে লেখার মাত্র অর্ধেকটা এখানে রয়েছে। বাকি অর্ধেক নিশ্চয় অন্য কোথাও আছে।'

৫৭

অদ্ভুত লেখা

তাহলে আসল গোলমালটা হল এইখানে! মিশা পকেটের ভেতর ছোরার খাপখানা একবার হাতড়ে দেখে নিল। এখন ও বুঝতে পারছে সেই বুড়ো স্ট্যাম্পওয়ালা কেন চিহ্নগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি।

মিশার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলেক্সেই ইভানভিচ আবার বললেন, 'লেখাটার বাকি অর্ধেক নিশ্চয় অন্য কোথাও রয়েছে।'

যাক্, যা থাকে কপালে! মিশা ছোরার খাপটা বের করে ফেলল। কিনারার পাড়টা খুলে হাত-পাখার মতো মেলে ধরল সেটাকে, তারপর নীরবে টেবিলের ওপর রাখল।

আলেক্সেই ইভানভিচ হেসে ফেলে বললেন, 'সাবধানী লোক দেখছি!'

দুটো পাত এবার একজায়গায় জুড়লেন উনি। এখন মিশার নজরে পড়ল একটা পাতের একদিকটা বেশি বেড়ে গেছে, আরেকটার একটা দিক যেন ভেতরে ঢুকে গেছে, কোন্ জায়গাটায় ওদের জোড়া লাগাতে হবে সেটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আগে কেন এটা লক্ষ্য করেনি ও?

দুটো পাত একসঙ্গে জুড়ে আলেক্সেই ইভানভিচ এবার সেটাকে টেবিলের ওপর পেতে একটা কাগজ-চাপা রাখলেন ওপরে।

মিশাকে বললেন, 'এবার দেখছ, দশ-চিহ্নওয়ালা একটা সংকেত-লিপি। এবার পড়ে দেখার চেষ্টা করা যাক।'

উঠে বইয়ের তাকের কাছে গেলেন উনি। একখানা বই নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন, তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

'এই যে পেয়েছি।' বলেই আলেক্সেই ইভানভিচ বইটা দু'আঙুলের ওপর বন্ধ করে রেখে বললেন, 'একটা পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে লেখো তো আমি যা বলি।'

মিশা সামনে কাগজ রেখে পেন্সিল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'লেখো, "চ"। হয়েছে? "চ" য়ে আকার, "ব" এ হ্রস্ব ইকার, "দা", "ও"। কী দাঁড়াল জিনিসটা?'

'চাবি দাও,' মিশা পড়ল।

'বেশ,' আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, "ঘ", "ড়" এ হ্রস্ব ইকার, "ত" একারে "তে"। লিখলে?'

'ঘড়িতে,' জবাব দিল মিশা।

অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে মিশা নিচের কথা ক'টি লিখে ফেলল:

'চাবি দাও ঘড়িতে এই সাপটা দিয়ে। বারোটা বাজতেই গম্বুজটা আপনা থেকে ঘুরে যাবে।'

'অদ্ভুত লেখা তো!' কী ভাবতে ভাবতে আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'অদ্ভুত।' নীরবে ছোরার খাপটা একবার খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর আবার তাকালেন মিশার দিকে।

'এবার কী বলবে বলো?'

মিশা কাঁধ ঝাঁকাল।

আলেক্সেই ইভানভিচ বলে চললেন, 'আর যাই হোক্, তুমি নিশ্চয় আমার চেয়ে বেশি খবর রাখো। যেমন ধরো: ছোরাটা কোথায়?'

মিশা মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

আলেক্সেই ইভানভিচ হেসে বললেন; 'কাঁটা না থাকলে গোলাপফুলও থাকে না। ছোরার খাপ যখন রয়েছে তখন নিশ্চয়ই ছোরাও একটা আছে।'

মিশা ছোরাখানা বের করে সঙ্কেত-লিপির ধাতুর পাতটা কীভাবে ওটার ভেতরে জড়িয়ে পুরে রাখা যায় সেটা দেখাল।

'বেশ কায়দা তো। দেখতে ঠিক নাবিকদের ছোরার মতো।'

'নাবিকদের ছোরাই তো এটা।' মিশা বলল।

আলেক্সেই ইভানভিচ ভুরু তুললেন।

'তুমি সঠিক জানো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

'শুনে খুশি হলাম।' ছোরাটা লক্ষ্য করে আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'হাতলের ভেতর গুপ্তরহস্য, মধ্যযুগে এ জিনিসের খুবই চল ছিল। তা, এই ব্রোঞ্জের সাপটার কথাই তো বলেছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু ঘড়িটাই এখন পাওয়া যাচ্ছে না। এবার, পলিয়াকোভ, এই ছোরাটা সম্পর্কে যা কিছু জানো সব বলো তো।'

মিশা পুরো কাহিনীটা বলার পর আলেক্সেই ইভানভিচ কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর আঙুল বাজালেন। তারপর বললেন:

'ব্যাপারটা তো খুব কৌতূহলজনক। "সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজ ডুবির কথা আমার খুব ভালো মনে আছে। সে সময় কাগজগুলো খুব হৈ চৈ তুলেছিল ব্যাপারটা নিয়ে। ব্যস্, ওই পর্যন্তই। কিন্তু এ ঘটনাটা তো সত্যিই খুব মজার। নিকিৎস্কি জানত অফিসারকে খুন করে ও সহজে নিস্তার পাবে না। জাহাজের বিস্ফোরণের ফলে সব কিছু চাপা পড়ে যাবে এই ছিল ওর ভরসা। জাহাজটা যে উড়িয়ে দেওয়া হবে সে খবর ও নিশ্চয়ই রাখত সন্দেহ নেই ...'

মিশা অবাক হয়ে আলেক্সেই ইভানভিচের দিকে তাকাল। উনি তো ঠিকই বলেছেন — একথা সে আগে ভাবেনি কেন? তার মানে বিস্ফোরণটার সঙ্গে নিকিৎস্কির কিছু সম্পর্ক ছিল।

আলেক্সেই ইভানভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করবে ঠিক করেছ?'

মিশা জবাব দিল, 'আমি নিজেই তা ঠিক জানিনে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম লেখার মানেটা উদ্ধার করতে পারলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি হিসেবে গলদ ছিল।' আলেক্সেই ইভানভিচের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল ও, 'যে অফিসার খুন হয়েছিলেন তাঁর পরিচয়টা জানতে হবে আমাদের।'

'ঠিক কথা। পলেভোয় নিশ্চয় সেই অফিসারের নাম বলেছেন তোমাকে?'

'হাঁ, তবে নামের প্রথমটুকু শুধু: ভ্লাদিমির। পদবীটা উনি জানতেন না। সত্যি বলতে কি ...' মিশার মুখে কথা আট্‌কে গেল।

'কী বলতে যাচ্ছিলে?'

'আমি আর আমার বন্ধুরা ছোরাটার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জোগাড় করেছি!'

'খোঁজখবর করেছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ তো।' আলেক্সেই ইভানভিচ উঠে দাঁড়ালেন, 'দিন কতক বাদে তোমাদের ডেকে পাঠাব। তোমাদের তদন্তের খবর কিছু শোনাবে।'

৫৮

দেয়াল-পত্রিকা

কোলিয়া সেভস্তিয়ানভ্‌কে য়ুরা স্তোৎস্কির কথা বলল ছেলেরা।

ওদের কাজের সে তারিফই করল। বলল প্রত্যেক ইস্কুলেই একটা করে ইয়ং পাইওনিয়র দল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে সব ইয়ং পাইওনিয়রকে একজোট করা যায়। নিজেদের গ্রুপ থেকে একটা দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ করার উপদেশও দিল সে এইসঙ্গে।

কয়েকদিন বাদে ওদের দেয়াল-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ক্লাসঘরের কাছেই

বারান্দার দেয়ালে টাঙানো হল। কাগজটার নাম দিয়েছে ওরা 'সংগ্রামী পত্র'। কাগজের শুরু হল মিশার একটা লেখা দিয়ে, 'অবাঞ্ছিত আকর্ষণ' নামে।

অবাঞ্ছিত আকর্ষণ

'আমাদের সপ্তম শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রের একটা অস্বাস্থ্যকর ঝোঁক আছে পেচোরিন আর অভিনেত্রী মেরী পিক্‌ফোর্ডের মতো মানুষদের দিকে।

'মেরী পিক্‌ফোর্ডকে দিয়েই শুরু করা যাক্। যতোগুলো ছায়াছবিতে সে অভিনয় করে প্রত্যেকটিরই শেষে একজন করে কোটিপতির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। আমাদের দেশে যখন কোনো লক্ষপতি কোটিপতি নেই তখন শুধু শুধু কেন তাকে নকল করার চেষ্টা?

'এবার পেচোরিনের কথা।

'প্রথম কথা হল, পেচোরিন অভিজাতশ্রেণীর লোক।

'দ্বিতীয়ত সে ছিল বড় অহঙ্কারী। নিজের অহঙ্কারের বশে প্রত্যেকটি লোককে কষ্ট দিয়েছে সে — বেলার সর্বনাশ করেছে, মেরীকে প্রতারিত করেছে (মেরী রাজপরিবারের মেয়ে সত্যি কথা, কিন্তু পেচোরিনও তো অভিজাতঘরেরই লোক), আর মাক্সিম মাক্সিমভিচ্‌কে সে মানুষ বলেই গণ্য করেনি।

'পেচোরিন তার অহঙ্কার লুকোবার পর্যন্ত চেষ্টা করেনি। সে বলেছে: "মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।" তার মানে সমাজের প্রতি ওর শ্রদ্ধা নেই, শুধু নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি — সমাজ যার দ্বারা উপকৃত হয় না এমন মানুষ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ অন্য লোককে সে হেয়জ্ঞান করে। (সম্প্রতি আমাদের ক্লাসে যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে সেও এর এক উদাহরণ।) সুতরাং, এটা পরিষ্কার যে প্রত্যেকেই যদি পেচোরিনের নকল করতে শুরু করে আর কেবল নিজেদের কথাই ভাবে তাহলে সকলেই সকলের টুঁটি চেপে ধরবে, আর তখন পুরোদস্তুর পুঁজিবাদ এসে পড়বে।

— পলিয়াকোভ।'

এর পরে অন্য সব বক্তব্য:

আসবাবপত্রের ক্ষতি

'অনেক ছাত্র ডেস্কের ওপর ছুরি দিয়ে নকশা কাটতে ভালোবাসে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ কিতভের। ও নিশ্চয় ভাবে ওর সামনে একটা কিছু লোভনীয় খাবার জিনিস রয়েছে। ইস্কুলের আসবাবের ক্ষতি বন্ধ করার সময় বোধহয় এখন হয়েছে। যে সব লোক ডেস্কের ওপর ছুরি চালায় তারা আশেপাশের ক্ষয়ক্ষতিকেই আরো বাড়িয়ে তুলছে।

— তুরপুন'

ন্যায়বিচার কোথায় ?

'থিয়েটার আর সিনেমা সম্পর্কে জানবার শিখবার জন্য আমাদের ইস্কুলের নিজস্ব একটা চক্র আছে। সে চক্রের সভাপতি হল শুরা অগুরেয়েভ, আমাদের

এ যুগের সবচেয়ে সেরা অভিনেতা। চক্র তৈরি হয়েছে আজ ছ'মাস হল, অথচ এখনো তার প্রথম সভাই হয়নি। তা সত্ত্বেও সিনেমা আর থিয়েটারের একটা ফ্রী পাশ রয়েছে শুরার। সে নিজে নিয়মিত যায় কিন্তু আর কাউকে পাশটা ব্যবহারও করতে দেয় না। এর মধ্যে ন্যায়বিচারটা কোথায়?

— দর্শক'

টিফিনের ঘণ্টায়

'কিছু কিছু ছাত্র টিফিনের ছুটির ঘণ্টায় ক্লাসরুমে বসে থাকতে চেষ্টা করে (আমরা তাদের নাম বলছি না, কিন্তু সবাই জানে সেটা গ. পেত্রোভের অভ্যাস)। এইভাবে তারা ক্লাসরুমের হাওয়া চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে আর অন্যায়ভাবে অক্সিজেন নষ্ট করে — এমনিতেই তো অক্সিজেন-এর সরবরাহ কম। এ জিনিস বন্ধ করার সময় হয়েছে। যদি কারুর টুকলি করার ইচ্ছে থাকে তো সে বারান্দায় সে কাজটা করুক।

— বিচ্ছু'

ঠাট্টা করে নাম দেওয়া

'আমাদের ক্লাসের ছেলেরা ঠাট্টা করে একজন আরেকজনকে কিংবা শিক্ষকমশাইদের একেকটা নাম দেয়। সাবেকী ইস্কুলের এই প্রথাগুলো এখন তুলে দেবার সময় হয়েছে। এরকম নাম দিলে লোকের মর্যাদাহানি করা হয় এবং পশুদের স্তরে নামানো হয়।

— এলদারভ্'

গোটা ইস্কুলের ছাত্র 'সংগ্রামী পত্র' পড়ল। হেসে বলল, পেচোরিন আর মেরী পিক্‌ফোর্ডের কথা বলে আসলে বোঝানো হয়েছে য়ুরা স্তোৎস্কি আর লিওলিয়া পদ্‌ভলোৎস্কায়াকে।

লেখাটা পড়বার সময় য়ুরা বিদ্রূপভরে নাক সিঁটকোল। কয়েকদিন বাদে দেওয়াল-পত্রিকার পাশেই দেখা গেল আরেকটা লেখা। তাতে বলা হয়েছে:

অহংকারী কে?

(কবরের তলা থেকে একখানা চিঠি)

'মহোদয়গণ,

'আমি গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ পেচোরিন। সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র শ্রীমান মিখাইল পলিয়াকোভ আমার নির্ঝঞ্ঝাট নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। কবর থেকে উঠে দু'সপ্তাহ ধরে আমার অদৃশ্য আত্মা ক্লাসঘরে উপস্থিত ছিল। এই আমার জবাব দিচ্ছি।

'পলিয়াকোভ ঘোষণা করেছে যে আমি নাকি আত্মসর্বস্ব। ধরে নেওয়া যাক্ ওর কথাটাই সত্যি। কিন্তু পলিয়াকোভের নিজের বেলা? রোজ অনেক রাত অবধি ও বই মুখে বসে থাকে যাতে ক্লাসে প্রথম হতে পারে। কেন? দেখাবার জন্য যে ক্লাসের অন্য সকলের চেয়ে সে ভালো আর বেশি বুদ্ধিমান। আর ঠিক এইজন্যই সে ইস্কুলে নানারকম কাজের ভার নিয়েছে। সে উপদলের নেতা, মনিটর, স্কুল কমিটির সদস্য, আর সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য।

'এখন প্রশ্ন: আমাদের মধ্যে কে আসলে অহংকারী?

— পেচোরিন।'

লেখাটা পড়ে খেপে গেল মিশা। এক বিন্দুও সত্য নেই এর মধ্যে! ও বই মুখে রাত জেগে পড়ে না, আর ও যদি খেটে পড়াশুনো করে আর ভালো ছাত্র হয়েই থাকে তো সেটা কি অহংকারের পরিচয় হল? প্রত্যেকেই জানে পড়াশুনো ভালো করে করতে হয়। য়ুরাও তো মন্দ ছাত্র নয়। তফাত শুধু এই যে যখনই ও ভালো নম্বর পায়, ওর বাবা ওকে উৎসাহ দেবার জন্য এটা ওটা কিনে দেন। তা ছাড়া, মিশা সকলের ভোটে যদি মনিটর আর ইস্কুল কমিটির সদস্য হয়ে থাকে সেটা কি ওর দোষ?

গেংকা ওকে বলল, 'দেখলি তো স্তোৎস্কির কাণ্ডখানা? আমি তোকে অনেক আগেই বলেছিলাম ওকে আচ্ছামতো শিক্ষা দিয়ে দিতে যাতে কোনোদিন না ভোলে।'

স্লাভা আপত্তি করল, 'ঘুষি মেরে তো কিছু প্রমাণ করা যায় না। "সংগ্রামী পত্রের" আগামী সংখ্যায় এই কবরের চিঠির একখানা জবাব দিতে হবে।'

মিশা বলল, 'ও যে আমার সম্পর্কেই লিখেছে তেমন কথা নয়, প্রশ্নটা হল নীতির: অহঙ্কার বলতে কী বোঝায়? য়ুরা মূল প্রশ্নটাকেই গুলিয়ে ফেলতে চাইছে। আমাদের কাজ হল সেটাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরা।'

ছেলেরা ওদের খবরের কাগজের আগামী সংখ্যাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'অহঙ্কার কাকে বলে?' এই প্রশ্নের আলোচনাই চলবে এই সংখ্যায়।

৫৯

ফৌজের বন্দুক-মিস্ত্রি

কয়েকদিন বাদে মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভার ডাক পড়ল হেডমাস্টারের কামরায়।

ওভারকোট আর ফৌজী টুপি-পরা একটি লোক আলেক্সেই ইভানভিচের পাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ছেলেরা ভেতরে ঢুকতেই তিনি ওদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'বোসো তোমরা।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'কী, কেমন লাগল পেচোরিনের জবাব?'

'কিন্তু ওর সব কথা তো সত্যি নয়।' মিশা বলল।

'কোন্‌টা সত্যি নয়?'

'আমি রাত জেগে বই পড়ি না, তাছাড়া অহঙ্কার বলতে ও জিনিস বোঝায়ও না।'

'কী বোঝায় তাহলে?'

'ও জিনিস নয়।'

‘হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।’ আলেক্সেই ইভানভিচ সায় দিয়ে বললেন, ‘লোকে তখনই আত্মসর্বস্ব হয় যখন সমাজের স্বার্থের ওপরেও নিজের স্বার্থকে স্থান দেয়। স্বভাবতই, ভালো ছাত্র হলেই কাউকে অহঙ্কারী বলা যায় না। ভালো ছাত্র হয়েই সে সমাজের সেবা করছে। কিন্তু সমাজের বোঝা হল ওই অলস ছাত্ররা। ওরাই তো আসলে অহঙ্কারী। এই কথাই তুমি বলতে চেয়েছিলে তো?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘উত্তম।’ আলেক্সেই ইভানভিচ একটু চুপ করে ফের জিজ্ঞেস করলেন, ‘ছোরাটা সঙ্গে এনেছ নাকি?’

ঠিক কী বলবে বুঝতে না পেরে মিশা উর্দি-পরা ভদ্রলোকটির দিকে তাকাল।

আলেক্সেই ইভানভিচ আবার বললেন, ‘এই কমরেডটির সামনে তুমি সব কথাই বলতে পারো।’

উর্দি-পরা ভদ্রলোক খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে সঙ্কেত-লিপির পাতগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর ছোরাখানা টেবিলের ওপর রাখলেন। আলেক্সেই ইভানভিচ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে উৎসাহ দেবার মতো করে হেসে বললেন:

‘বলো না, আমরা শোনবার জন্য তৈরি হয়ে আছি।’

মিশা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে একটু কেশে বলল:

‘আমরা জানতে পেরেছি, এই ছোরাটা ছিল সম্রাজ্ঞী আন্না ইওআন্নভ্‌নার আমলের এক ফৌজী বন্দুক-মিস্ত্রির। তার মানে আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকের।’

বিস্ময়ে ভুরু কপালে তুললেন আলেক্সেই ইভানভিচ। উর্দি-পরা ভদ্রলোকটিও মনোযোগ দিয়ে মিশাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আলেক্সেই ইভানভিচ জিজ্ঞেস করলেন, ‘আন্না ইওআন্নভ্‌না?’

মিশা জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, আন্না ইওআন্নভ্‌না।’

'কী করে সিদ্ধান্তটা করলে?'

'বেশি বেগ পেতে হয়নি।' ছোরাটা তুলে নিয়ে মিশা খাপ থেকে ফলা টেনে বের করল। 'প্রথম কথা হল, চিহ্নগুলো। তিনটে চিহ্ন আছে: নেকড়েবাঘ, কাঁকড়াবিছা আর পদ্মফুল। এই দেখুন।'

আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে যাও।'

মিশা ফের বলতে লাগল, 'জার্মানির সলিংগেন ইস্পাত মিস্ত্রিদের মার্কা ছিল "নেকড়েবাঘ"। এই ছোরার ফলাগুলোকেও তাই বলা হত "নেকড়ের বাচ্ছা"। ষোল শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তৈরি হত এগুলো।'

'ঠিক কথা।' আলেক্সেই ইভানভিচ মৃদু হেসে বললেন, 'অস্ত্রশস্ত্রের এরকম একটা মার্কা আছে বটে। খুব বিখ্যাত মার্কা সে কথা বলতেই হবে।'

মিশা এবার আরো সাহস করে বলতে লাগল, 'জুলিয়ান দেল্‌রেই নামে টোলেডোর একজন তলোয়ার-মিস্ত্রিও তার ছোরা-তলোয়ারের ফলায় নেকড়ে কিংবা কুকুরের ছবি খোদাই করত।'

'মুর থেকে খৃস্টান হয়েছিল লোকটা,' গেংকা ফোঁড়ন দিল।

'পনের শতাব্দীর শেষ দিকের লোক এই জুলিয়ান দেল্‌রেই।' মিশা বলে চলল, 'এবার "কাঁকড়াবিছা"। মিলানের তলোয়ার-কারিগররা এই মার্কা ব্যবহার করত। তারপর "পদ্মফুল"। ফ্লোরেন্সের এক তলোয়ার-মিস্ত্রির চিহ্ন ছিল এটা।'

'তার নাম পারার্জিনি,' গেংকা বলল।

'হ্যাঁ। পারার্জিনি। ষোল শতাব্দীর শুরুর দিকের লোক ছিল সে। এই হল চিহ্নগুলোর মানে।' আলেক্সেই ইভানভিচ আর উর্দি-পরা ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে সগর্বে জানিয়ে দিল মিশা।

আলেক্সেই ইভানভিচ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এ ছোরাটা এদের ভেতর কে তৈরি করেছিল?'

'এদের কেউ নয়।' দৃঢ়স্বরে বলল মিশা।

'কেন এ কথা মনে হল?'

'কারণ যতোগুলো বই পড়লাম প্রত্যেকটাতেই বলা আছে নাবিক ছোরার

আবির্ভাব হয় ষোলো শতাব্দীর শেষ দিকে, অথচ এই মার্কাগুলো সবই ষোল শতাব্দীর শুরুর দিকের।'

আলেক্সেই ইভানভিচের সঙ্গে উর্দি-পরা ভদ্রলোকের দৃষ্টি বিনিময় হল, দু'জনেই হাসলেন।

'এটা অবশ্য বেশ যুক্তিসংগত কথাই।' আলেক্সেই ইভানভিচ মন্তব্য করলেন। 'তা যদি হয় তাহলে এই মার্কাগুলোর কী মানে দাঁড়াল?'

'সে আমরা জানি না।' মিশা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি হঠাৎ ওদের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'ছেলেরা ঠিক কথাই বলেছে।' তারপর মিশার কাছ থেকে ছোরাটা নিয়ে আলোর দিকে উঁচু করে ধরলেন। ফলাটার আগাগোড়া একটা অস্পষ্ট নকশা আছে — লতানো গোলাপফুল দিয়ে ঢেউ খেলানো নকশা। মিশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ জিনিসটা কী জানো?'

'না।'

'এটা হল দামাস্কাস্ ইস্পাতের ছোরা। কেবল প্রাচ্যদেশেই এ জিনিস তৈরী হত। তার মানে ফলাটার সঙ্গে ইওরোপীয় তলোয়ার-কারিগরদের মার্কাগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই। বোঝাই যাচ্ছে, এ ছোরাটা যার হাতের তৈরি তার ইচ্ছে ছিল সবচেয়ে সেরা জাতের ইস্পাতের চেয়েও তার ইস্পাত যে ভালো সেইটি দেখানো। সম্ভবত সেইজন্যই সে তিনটে চিহ্ন ব্যবহার করেছিল। এবার বলে যাও।'

মিশা ইতস্তত করল। ও একটু বোকা বনে গিয়েছিল, কারণ ওরা এতদিন ধরে যে জিনিসটা খুঁজে পেতে বের করেছে উর্দি-পরা এই মানুষটি তা একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই ঠিক ধরে ফেলেছেন।

মিশাকে উৎসাহ দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বলো না, বলে যাও।'

মিশা বলে চলল, 'তারপর আমরা ঠিক করলাম রুশদেশে কী ধরনের ছোরা আগে ব্যবহার করা হত সেইটে বের করব। তিন রকমের ছোরা ছিল, তিন ধরনের। প্রথমটা হল জাহাজী ছোরা, কিন্তু তার ছিল চারটে দিকে ধার, আর

এটার হল তিন দিকে। তাই মিলল না। পদাতিক বাহিনীর ছোরা ছিল পৌনে তেইশ ইঞ্চি লম্বা, অথচ আমাদেরটা মোটে চোদ্দ ইঞ্চি। আর তৃতীয় ধরনের ছোরাগুলো তৈরী হত সম্রাজ্ঞী আন্না ইওআন্নভ্নার আমলে, ফৌজী বন্দুক-মিস্ত্রিরা বানাত। চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা হত, যেমন আমাদের এই ছোরাটা। সেগুলোরও তিন দিকে ধার থাকত, আমাদেরটাও তাই। আর অন্যসব চিহ্নও মিলে যাচ্ছে। আমরা তাই ধরে নিলাম এ ছোরাটা একসময় আন্না ইওআন্নভ্নার আমলের এক বন্দুক-মিস্ত্রিরই সম্পত্তি ছিল।'

মিশা কথা শেষ করে একটু চুপ করল, তারপর সোফায় গেঙ্কা আর স্লাভার পাশে গিয়ে বসল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল আলেক্সেই ইভানভিচ আর উর্দি-পরা ভদ্রলোক কী বলেন।

উর্দি-পরা ভদ্রলোককে আলেক্সেই ইভানভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের এই ধারণা সম্পর্কে তোমার মত কী?'

উনি জবাব দিলেন, 'কথাটা তো কাজের কথাই। খুবই বুদ্ধিমানের মতো কথা। ঠিক আছে, ছোরার মালিককে আমরা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব।'

টেবিল থেকে একটা চারকোণা বড়ো বই তুলে নিলেন আলেক্সেই ইভানভিচ। মিশা পড়ল, ওপরের মোটা মলাটে লেখা রয়েছে: '১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নৌপঞ্জী'।

আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, '"সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজে যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে "ভ্লাদিমির" নামের তিনজন অফিসার মারা যান। ইভানভ — একজন জুনিয়র অফিসার, তেরেন্তিয়েভ — দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাপ্টেন, নেউস্ত্রয়েভ — লেফ্‌টেন্যান্ট। প্রশ্ন হল: ছোরার মালিক এদের ভেতর কে? এবার দেখা যাক্।' আলেক্সেই ইভানভিচ চোখ বুলিয়ে পাতাগুলো উল্টে যেতে লাগলেন, 'ইভানভ, যুবক, অমুক-তমুক... নেউস্ত্রয়েভ, ভালো অফিসার...' আলেক্সেই ইভানভিচ চুপ করে গেলেন, নিজেই মনে মনে পড়ে নিচ্ছেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, এই একটা দরকারী খবর। তোমরা সবাই শোনো: "রুশ নৌবহরের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়র ভ. ভ. তেরেন্তিয়েভের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। স্মরণীয় প. ন. পদ্‌ভলোৎস্কির শিক্ষায় তিনি যে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন

তাহার ও নিজের অসাধারণ দক্ষতার ফলে তাঁহারই বংশের আরেকজন প্রথিতযশা পূর্বপুরুষ ফৌজী অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ প. ই. তেরেন্তিয়েভের ন্যায় তিনিও নৌবহরের অস্ত্র সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভের সর্বপ্রকার সুযোগ পাইয়াছিলেন”।’

উর্দি-পরা ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, ‘মনে হচ্ছে এবার যেন পাওয়া গেছে। আপনার সামরিক এন্‌সাইক্লোপেডিয়া আছে আলেক্সেই ইভানভিচ?’

আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, ‘পেত্রোভ, যাও তো, সোফিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে আমার কথা বলো, সামরিক এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার “ত” খণ্ডটা আমার চাই।’

গেঙ্কা বইখানা নিয়ে এল। আলেক্সেই ইভানভিচ পাতা উল্টে বললেন:

‘এই যে রয়েছে। সবাই শোনো। “তেরেন্তিয়েভ, পলিকার্প্‌ ইভানভিচ। ১৭০১ — ১৭৮৪। আন্না ইওআন্নভ্‌না ও এলিজাভেতা পেত্রোভনার আমলের বিখ্যাত বন্দুক-মিস্ত্রি। ফিল্‌ড্‌মার্শাল মিনিখের অধীনে চাকরি করিতেন। অচাকভ্‌, স্তাভুচানি ও খতিনের যুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ডুবুরি সরঞ্জামের নকশা তৈয়ারি করেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে “ত্রাপেজুন্দ্‌” জাহাজটিকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তাঁহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। পরিকল্পনাটিকে সে যুগে নিতান্ত আষাঢ়ে কল্পনা মনে করা হইত”।’

উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে খুশিভরা গলায় বললেন, ‘দেখলে তো তোমাদের বন্দুক-মিস্ত্রি কতো কাজে লাগল।’ তারপর কী চিন্তা করতে করতে বললেন, ‘এইমাত্র আরেকটা কথাও আমার মনে পড়ছে। আরেকজন তেরেন্তিয়েভ ছিল, সেও অমনি একটা জাহাজ উদ্ধারের মতলব এঁটেছিল, “ত্রাপেজুন্দ্‌” নয়, সেটা ছিল “প্রিন্স্‌”। “ত্রাপেজুন্দ্‌” ডুবি হবার আশি বছর পরে “প্রিন্স” ডোবে।’

আলেক্সেই ইভানভিচ মন্তব্য করলেন, ‘এখানে একটা মজার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। নৌ-আকাদামীর অধ্যাপক পদ্‌ভলোৎস্কি, যাঁর নাম এই নৌপঞ্জীতে রয়েছে, তিনি হলেন আমাদেরই এক ছাত্রীর দাদামশাই!’

ছেলেরা এ ওর দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। লিওলিয়া? এ যে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনোদিন।

উর্দি-পরা ভদ্রলোক বললেন, 'তোমরা তো ভাই যথেষ্টই খাটছ।' উঠে দাঁড়িয়ে ফের বললেন, 'আপাতত নাহয় আমার কাছেই ছোরাটা থাক্, মিশা। ঘাবড়িও না, আমাদের কাজ শেষ হলেই তোমাকে ওটা ফেরত দেব। দেখছি, তুমিও কিছু লুকিয়ে রাখতে চাইছ। আমাকে বলবে তো তোমার গোপন কথাটা?'

মিশা জবাব দিল, 'আমার তো গোপন কিছু নেই। আমরা শুধু ছোরাটার রহস্য উদ্ধার করতে চাই।'

'ঠিক কথা.' মিশার কাঁধে হাত রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাদের আমি সাহায্য করব।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'শুধু তোমাদের কাজকর্মটা যেন লাইব্রেরিঘরের বাইরে না যায় দেখো। অন্য সব কাজ নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোমাদের যা করার ছিল করেছ। আমার নাম স্ভিরিদভ্।' মিশার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এবার আমরা হাত মেলাতে পারি?' পলেভোয়্-এর মতোই চওড়া প্রকাণ্ড হাতখানা ওঁর। মিশা করমর্দন করল।

৬০

ড্রয়িং ক্লাসে

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গেংকা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'এই এলেন আরেকজন। ছোরাটা পেলাম আমরা, খেটেখুটে খোঁজখবর করলাম আমরা, রুমিয়ান্ত্সেভ্স্কায়া লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সব কিছু খুঁজে বের করলাম, তারপর এখন, যখন গুপ্তধনে হাত দেওয়াটা শুধু বাকি, উনি এসে নিয়ে গেলেন ছোরাখানা।'

স্লাভা বলল, 'ঠিক কাজই করেছেন। সব হয়তো ভণ্ডুল করে ফেলতাম আমরা।'

গেঙ্কা বিড়বিড়িয়ে বলল, 'এতদিন পর্যন্ত তো কিছুই ভণ্ডুল করিনি।'

মিশা বলল, 'ভদ্রলোককে বাধা দেওয়া উচিত নয় সত্যি কথাই। তবে আমরা নিজেরাই বা তেরেন্তিয়েভ সম্পর্কে খোঁজ করি না কেন? তাতে তো কারুর কোনো বাধা হবার কথা নয়।'

যে ক্লাসঘরে ওরা এল সেখানে তখন ড্রয়িং-এর প্রথম পাঠ শুরু হয়ে গেছে। ডেস্কের বদলে রয়েছে টুল আর ইজেল। স্কুলের ছেলেদের আঁকা সেরা ছবিগুলো দেয়ালে টাঙানো। বেশির ভাগই স্কুলের নাটকের জন্য আঁকা সাজসজ্জা। ছবির নিচের তাকগুলোয় নানা রকমের স্থির-চিত্র আঁকার সরঞ্জাম: গ্রীক দেবতাদের আর জন্তুজানোয়ারের ছোট ছোট মূর্তি, কাগজে তৈরি ফলপাকড় ইত্যাদি। আজকের ক্লাসে একটা 'ক্ল্যাসিক্যাল ঘোড়ার' মূর্তি দেখে দেখে ছবি আঁকা হচ্ছিল।

ড্রয়িং-এর ক্লাসটা বরাবরই বেশ মজার। যেমন খুশি বসতে পারো, চলেফিরে বেড়াতে পারো, কথা বলতে পারো। ড্রয়িং মাস্টার বরিস ফিওদরভিচ্ রমানেঙ্কো। ছাত্ররা তাঁকে 'বরফিওদ্' বলে ডাকে। গাঁট্টাগোট্টা দিলদরাজ লোক, মাঝারি বয়েস ও মাঝারি দৈর্ঘ্যের উক্রেনীয়, কসাকদের মতো ঝোলা গোঁপ। ইজেলগুলোর মাঝখান দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ছাত্রদের আঁকার ভুলগুলো শুধরে দিচ্ছেন।

মিশা একটা আসন নিয়ে বসল লিওলিয়া পদ্ভলোৎস্কায়ার পাশে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, লিওলিয়া?'

মডেলের সঙ্গে নিজের ড্রয়িংটা মিলিয়ে নিতে নিতে মেয়েটি বলল, 'কি?'

'বলো তো, নৌ-আকাদামীর অধ্যাপক অ্যাডমিরাল পদ্ভলোৎস্কি কি তোমারই দাদামশাই?'

'হ্যাঁ। কেন?' মিশার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে লিওলিয়া বলে উঠল।

মিশা থতমত খেয়ে বলল, 'মানে, এই আর কি ... নৌ-আকাদামীতে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাঁরই কাছে পড়ত কিনা, তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর উনি রাখেন কিনা তাই জানতে চাই।'

‘কিন্তু দাদামশাই তো মারা গেছেন অনেককাল আগে।’ লিওলিয়া জবাব দিল।

মিশা সামলে নিল, ‘ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর পরিবারের কেউ কেউ তো বেঁচে আছে, না?’

‘হ্যাঁ। দিদিমা আর সোনিয়া মাসি আছেন।’

‘ওঁরা কেউ তোমার দাদামশাইয়ের ছাত্রদের কোনোরকম খবর রাখতেন কিনা জানো?’

‘বোধহয় না। ক্লাসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে দিদিমাকে তাঁর দরকার হত না নিশ্চয়ই।’

‘সে তো জানি।’ হতাশ হয়ে মিশা বলল, ‘কিন্তু ওঁর ছাত্রদের কাউকে কাউকে চিনতেন এমনও তো হতে পারে।’

‘আমার তা মনে হয় না।’

পেছন থেকে য়ুরা স্তোৎস্কি ঠাট্টা করে বলল, ‘কিসের এত গোপন কথা?’

লিওলিয়া লাল হয়ে উঠল।

বোকার মতো মিন্‌মিন্‌ করে বলল, ‘বুঝলে য়ুরা, মিশা দাদামশাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিল।’

‘ও, তাই বুঝি।’ মুখ বেঁকিয়ে হেসে য়ুরা চট্‌ করে ঘুরে ইজেলের কাছে ফিরে গেল।

মিশা এল স্লাভার কাছে।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, ‘দাদামশাই বেঁচে নেই, তবে এক দিদিমা আর সোনিয়া মাসি আছে। ওরা হয়তো তেরেন্তিয়েভের কথা জানে, কি বল্‌?’

‘লিওলিয়াকে বল্‌ না। ওর দিদিমার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবে।’

মিশা হতাশ ভঙ্গি করে বলল, ‘তাই নিয়েই তো কথা হল। মেয়েদের দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়! য়ুরা স্তোৎস্কি এল কি সব ফাঁস করে দিল।’

মিশা ভাবল গেঙ্কাকে একবার বলবে, কিন্তু দেখল ও তখন খুব জরুরি কাজে ব্যস্ত: কিৎ-এর পেছনে লেগেছে।

'কিৎ, এই কিৎ, শুনছিস?'

'কি চাই?'

'কোন্ সমুদ্দুর থেকে এসেছিস রে?'

এ সব ঠাট্টা মস্করা কিৎ ভালো করেই জানে, তাই চুপ করে রইল। গেংকা এবার কাগজের পুঁটলি চিবিয়ে একটা কাঁচের নলের ভেতর পুরে ফুঁ দিয়ে তাই ছুঁড়তে লাগল। কিৎ-এর ঘাড়ের ঠিক পেছনটায় গিয়ে পড়ল একটা। কিৎ কিছু বুঝতে না পেরে মাছি তাড়াবার মতো হাত নাড়ল। জিনা ফ্লুগ্‌লোভার তো তা দেখে দারুণ ফুর্তি। মিশা বুঝতে পারছিল মনিটর হিসাবে ওর উচিত গেংকাকে থামানো, কিন্তু মাছি নেই অথচ যেভাবে কিৎ হাত নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে তা দেখে হাসিতে ওরও দম ফেটে যাবার জোগাড়।

কিৎ ইতিমধ্যে এক হাতে গর্দান সামলাচ্ছে, অন্য হাতে বৃথাই চেষ্টা করছে একটা ঘোড়া আঁকতে।

বরিস ফিওদরভিচ ওর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন উনি। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে অনুপাতের তারতম্য বোঝাতে শুরু করলেন।

একটুকরো চক দিয়ে একটা ঘোড়া এ'কে উনি বললেন, 'কিতভ্, ছবি আঁকার দিকে আরো মন দাও, আর্ট সম্পর্কে তোমার একটু ঝোঁক আসা দরকার। আমি যা দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে তোমার কোনো কিছুতেই ভক্তি নেই। আচ্ছা, এবার তোমার জানা কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম বলো তো।'

কোনো শিল্পীর নামই জানত না কিতভ। ঘোঁৎ করে নাক টেনে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল বরিস ফিওদরভিচের দিকে।

'চুপ করে বসে আছ কেন?' বরিস ফিওদরভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, তুমি না আমাদের সঙ্গে ত্রেতিয়াকোভ চিত্রশালায় গিয়েছিলে? সেখানে যে সব ছবি দেখেছ আর শিল্পীর নাম শুনেছ মনে করতে চেষ্টা করো। চেষ্টাই করো না।'

কিতভের পেছন থেকে গেংকা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'রেপিন।'

কিতভ জোর গলায় বলে উঠল, 'রেপিন।'

বরিস ফিওদরভিচ বললেন, 'ঠিক। রেপিন কী ছবি এ'কেছেন?'

'"ভয়ানক" ইভান তাঁর ছেলেকে হত্যা করছেন।' গেঙ্কা পেছন থেকে বলল।

'"ভয়ানক" ইভান তাঁর ছেলেকে হত্যা করছেন।' কিতভ করুণভাবে আওড়াল।

ঘোড়ার ছবিটা কয়েকটা চতুষ্কোণে ভাগ করতে করতে বরিস ফিওদরভিচ বললেন, 'বাঃ বেশ। এবার আরেকজন শিল্পীর নাম বলো তো।'

'রমানেঙ্কো একটা ঘোড়া এ'কেছিলেন।' ফিস্‌ফিস্ করে বলল গেঙ্কা। হাসি আর চাপতে পারছে না সে।

'রমানেঙ্কো একটা ঘোড়া এ'কেছিলেন।' কিতভ যেই কথাটা বলেছে অমনি সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল।

'কী? কী বললে তুমি?' বরিস ফিওদরভিচের হাতখানা শূন্যেই রয়ে গেল।

'উনি একটা ঘোড়া এ'কেছিলেন।' ফের আওড়াল হতচ্ছাড়া কিতভ।

আরেকবার হাসির রোল উঠল।

'কে?'

'এই... মানে... এই, কি যেন নামটা? রমানেঙ্কো।' কিতভ জবাব দিল।

এবার কেউ হাসল না। বরিস ফিওদরভিচের মুখটা কালো হয়ে গেল, গোঁপজোড়া অদ্ভুতভাবে খাড়া হয়ে উঠল। ডেস্কের ওপর চকটা ছুঁড়ে দিয়ে উনি জোরে জোরে পা ফেলে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

৬১

বরিস ফিওদরভিচ

কিতভ অনুযোগ করল, 'আমি জানতাম না ওঁর নাম রমানেঙ্কো। আমি ভেবেছিলাম "বর্‌ফিওদ"।'

গেঙ্কা ভ্যাংচাল, 'তুই ভেবেছিলি! আমি নিজের মনে কথা বলছি তুই

এদিকে তোতাপাখির মতো সব আউড়ে চলেছিলি! অন্যে বলে দেবে সেই ভরসায় থাকা তোর অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দয়া করে আমায় ফাঁসাস না। নিজে ঝামেলায় পড়েছিস, যেমন করে পারিস বেরিয়ে আয় এবার।'

জোরে জোরে মিশা বলল, 'বুঝলি গেঙ্কা, এ তোর নীচ কাজ হয়েছে।' ওর কথা সারা ক্লাসই শুনতে পেল।

গেঙ্কা লাল হয়ে উঠল, 'তোর কি হল মিশা? এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

কিন্তু মিশা জবাব দেবার আগেই দরজাটা খুলে গেল। সবাই ছুটল যে যার আসনে। আলেক্সেই ইভানভিচ এসেছেন। লম্বা, রোগা দেখাচ্ছে তাঁকে, পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো।

শিক্ষকের ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে উনি গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধ ক্লাসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমরা আজ যে কুৎসিত ব্যবহার করেছ তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না।' প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন উনি, 'বরিস ফিওদরভিচ তোমাদের মতো কিশোরদের জন্য তাঁর জীবনের অনেকখানিই সঁপে দিয়েছেন। তবু তোমরা তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ সে কথা আমি তুলতে চাই না।'

আলেক্সেই ইভানভিচ থামলেন। গোটা ক্লাস দম বন্ধ করে ওঁকে লক্ষ্য করতে লাগল।

তারপর একটু আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের আজ সম্পূর্ণ অন্য এক কথা শোনাব। একেবারে অন্য কথা।' আবার একটু থেমে ক্লাসের চারদিকটা একবার দেখে নিলেন। ভুরুজোড়া উঁচু করে বললেন, 'আমি অবশ্য মানতে বাধ্য যে কিতভের এত রসজ্ঞান আছে সে খবর আমার কোনোদিন জানা ছিল না। আমি বরাবরই ভাবতাম, ওর উৎসাহ আর প্রতিভা যেন অন্য দিকেই একটু বেশি খেলে...'

ছাত্রদের ভেতর সামান্য চাঞ্চল্য দেখা গেল। সবাই জানে আলেক্সেই

ইভানভিচ কোন্ প্রতিভার কথা বলছেন, তাই সবাই বিদ্রূপভরা চোখে কিতভের দিকে তাকাল।

আলেক্সেই ইভানভিচ বলেই চললেন, 'মনে হচ্ছে যেন একেক ক্লাসে দু'বছর করে কাটাবার ফলে কিতভের মধ্যে একটা রসবোধের সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আমি বলব এ রসিকতা অতি নিচু দরের। কিতভ বোধহয় ভাবে একজন বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে সাদাসিধে একজন ড্রয়িং-শিক্ষকের তুলনা করে খুব মজা করা হল, কিন্তু আমি এর মধ্যে কোনো মজাই দেখি না। কেন, সে কথা আমি তোমাদের বলছি।'

আলেক্সেই ইভানভিচ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বলেই চললেন:

'আমার যা মনে হয়, কিতভ ভেবেছে বুঝি বরিস ফিওদরভিচের প্রতিভা ছিল না বলেই উনি বিখ্যাত শিল্পী হতে পারেননি। আমি তোমাদের বলতে পারি, ব্যাপারটা আসলে মোটেই তা নয়। বরিস ফিওদরভিচ অতি গুণী মানুষ। শিল্প-আকাদামী থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরুবার পর ওঁর সামনে নামকরার প্রশস্ত সুযোগ ছিল, খ্যাতি, যশ, — কিতভের মতে যা কিছু সম্মানজনক, সব কিছুই। কিন্তু উনি বেছে নিলেন সাধারণ একজন ড্রয়িং-শিক্ষকের পদ, — অর্থাৎ এমন কিছু, যা কিতভের মতে শ্রদ্ধার উপযুক্ত তো নয়ই, ওর নির্বোধ উপহাসেরই বিষয় হবার যোগ্য।'

কিতভ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল, চোখ দুটো ওর ডেস্কে নিবদ্ধ।

আলেক্সেই ইভানভিচ বলে চললেন, 'আকাদামী থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরুবার পর বরিস ফিওদরভিচ এবং ওঁর আরো কয়েকজন বন্ধু, যারা ওঁরই মতো গরিবঘরের ছেলে, সবাই মিলে একটা অবৈতনিক শিল্পকলা বিদ্যালয় গড়ে তুললেন মজুরদের ছেলেদের জন্য। এইরকম একটি নয়, অনেকগুলো বিদ্যালয় তৈরি করলেন তাঁরা। মেধাবী ছাত্রদের বেছে বেছে এনে স্কুলে ঢোকালেন, শিল্পের দিকে তাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুললেন। কেন তিনি এ পথ বেছে নিয়েছিলেন সে কথাই তোমাদের আজ বলব। সমাজের সাধারণ মানুষেরই

একজন বলে তাঁকে শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করার অধিকার পেতে যথেষ্ট দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল। সেইজন্যই তিনি এ পথ বেছে নেন। সে যুগে আর্ট জিনিসটা ছিল খালি ধনী লোকদের জন্য, যাদের অবস্থা স্বচ্ছল একমাত্র তাদেরই অধিকার ছিল এতে। বরিস ফিওদরভিচের সিদ্ধান্তও তাই মহৎ সিদ্ধান্ত। চির জীবন তিনি শুধু একটি উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করেছেন। অজস্র বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। পেটে ভাত ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না। সবরকম আরাম বিসর্জন দিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত আপন লক্ষ্যে পেঁছিলেন তখনও যে সুযোগসুবিধা তিনি অনায়াসেই পেতে পারতেন তা প্রত্যাখ্যান করলেন — আরো কঠিন অথচ মহৎ একটি কাজে নিজেকে নিয়োগ করবেন বলে... বরিস ফিওদরভিচ ঠিক করলেন শিক্ষক হবেন। যেসব অসংখ্য তরুণ প্রতিভা পুঁজিবাদী সমাজের ঘৃণ্য কাঠামোর মধ্যে চাপা পড়ে অকালে নষ্ট হয়ে যায় সেই প্রতিভাগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য উনি নিজের সম্পূর্ণ জীবনটাকেই সঁপে দিলেন। বরিস ফিওদরভিচের জীবন উৎসর্গ হল এই কাজেই! অবশ্য অনেক ভুলত্রুটি তাঁর হয়ে থাকে, সে তো আমরা সকলেই জানি। এক সময় গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই বদলানোর দরকার হয়েছিল, প্রয়োজন ছিল এমন একটা সমাজ গড়ে তোলার যা প্রত্যেকটি মানুষেরই প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে। রুশদেশের অক্টোবর বিপ্লব ঠিক এই কাজটিই করেছিল। যাই হোক, ওঁর কথা বিচার করতে হলে বলা যায় যে ওঁর জীবনটাই গর্ব করার মতো। নিজের জীবনটা ওঁর পক্ষে গর্বের বিষয় এই জন্য যে একটা অকৃত্রিম উঁচু আদর্শ ওঁকে পরিচালিত করেছে।’

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে যেতে ভেতরে ঢুকলেন বরিস ফিওদরভিচ।

আলেক্সেই ইভানভিচ বলে চললেন, 'সেই জন্যই তোমাদের আমি বলছি এ সব কথা। বড়ো শিল্পী, নামজাদা বিজ্ঞানী কিংবা মস্তো লেখক হওয়া—এসবই খুব জবরদস্ত ব্যাপার বটে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসল কাজটুকুই ঘটে অলক্ষিতে, দৈনন্দিনভাবে, আর তার বেশির ভাগটাই হয় শিক্ষকের সহায়তায়। মানুষের একেবারে অন্তরের কাছে শিল্পকে পেঁছে দেন তিনি। প্রতিভার জমিতে শিক্ষকই প্রথম বীজ বোনেন যাতে এই জমিতে চমৎকার, সুন্দর ফুল ফুটে উঠে। তাই তোমাদের কেউ কখনো ভবিষ্যতে মস্তো আর বিখ্যাত হলে যেন গ্রাম্য ইস্কুলের একজন সাদাসিধে মাস্টারমশাইকে দেখে সম্মান জানাতে ভুলো না, মনে রেখো এই সামান্য মানুষটিই সবার দৃষ্টির আড়ালে পরিশ্রম করে প্রকৃতির সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি যে মানুষ, তাকেই শিক্ষিত করে তোলেন, গড়ে পিটে তৈরি করেন।'

আলেক্সেই ইভানভিচ থামলেন। সবাই চুপ, সারা ক্লাসে একটা থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে।

আলেক্সেই ইভানভিচ বললেন, 'এই কথাটাই আমি তোমাদের শোনাতে চেয়েছিলাম। এবার,' বরিস ফিওদরভিচের দিকে ফিরে বললেন, 'এবার আপনি পড়ানো আবার শুরু করুন।'

ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি।

গেঙ্কা ইজেলের পাশে দাঁড়িয়ে বরিস ফিওদরভিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাথা তুলে বরিস ফিওদরভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বরিস ফিওদরভিচ, আমায় মাফ করুন।'

'মাফ করার কী হল?'

'আমিই কিতভকে পেছন থেকে বলে দিয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা করুন আপনি।'

বরিস ফিওদরভিচ গেঙ্কার কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

খুব সাদাসিধেভাবে বললেন, 'ঠিক আছে। এবার যেমন ড্রয়িং করছিলে, করো।' তারপর কিতভের দিকে একবার ধূর্ত চাউনি দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'তিমিরাও তাহলে দেখছি বঁড়শির টোপ গেলে!'

গোঁফের নিচে একটু মুচ্‌কি হেসে উনি ক্লাসের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ইজেলের গায়ে আঁটা সেই 'ক্লাসিক্যাল ঘোড়া'র মূর্তির ড্রয়িংগুলো।

৬২

পদ্‌ভলোৎস্কায়া দিদিমা আর সোনিয়া মাসি

লিওলিয়া শেষ অবধি ওর দিদিমার ঠিকানাটা মিশাকে দিল, পরের দিন সন্ধ্যায় তাই মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা চলল লিওলিয়ার দিদিমার বাড়ি। পথে যেতে যেতে রাস্তার প্রত্যেকটা বরফে পেছল জায়গায় স্লিপ কেটে চলল।

দূরে দূরে একেকটা বাতি, তারই ম্লান আলোয় তুষারের একটা নিথর আস্তরণ ধীরে ধীরে নামছে। সরকারী খাদ্যবিভাগের সাদা নীল ডোরাওয়ালা বাড়িটার ওপর একটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের চারধারে সাজানো বিজলি বাতি-গুলো পিট্‌পিট্‌ করে জ্বলছে নিবছে, আর অক্ষরগুলো দেখা যাচ্ছে: 'আপনার রুচি অনুযায়ীই আমরা মিষ্টান্ন তৈয়ারি করিয়া থাকি।'

ইদানীং গেঙ্কার এক অভ্যেস হয়েছে স্কেট করা — পায়ের ফেল্টজুতোয় একজোড়া স্কেট দড়ি দিয়ে বেঁধে তাতে আবার কাঠি গুঁজে আঁট করে রাখে। ওর পুরনো ওভারকোটটার বোতাম খোলা, ফৌজী টুপির কানদুটো দু'কাঁধের ওপর ঝল্‌ঝল্‌ করছে।

গেঙ্কা রেগেমেগে বলছিল, 'এর চেয়ে ছোটোলোকী আর কী হতে পারে! আগে ওরা শুধু বড়ো বড়ো রাস্তাগুলোর ওপরই বালি ছড়িয়ে রাখত, এখন পাশের ছোট গলিগুলোতে অবধি রেখেছে। একটা লোক যদি একটু স্কেটিং করে তো ওদের কোন্‌ ক্ষতি হয় শুনি? মনে হচ্ছে স্কেটিং-ফেটিং যা করবার

সব ওই রিন্‌ক্‌-এ করতে হবে। এক জোড়া নরওয়েজীয়ান স্কেট নেই আমার এই যা দুঃখ! নয়তো যুরা স্তোৎস্কিটাকে দেখিয়ে দিতাম কতো বড়ো চ্যাম্পিয়ন সে!'

একটা ছোট কাঠের বাড়ির সামনে এল ওরা।

মিশা বলল, 'মনে হচ্ছে সকলে এক সঙ্গে ভেতরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি একাই যাব। তোরা এখানে অপেক্ষা কর তো একটু।'

অন্ধকারে নড়বড়ে কাঠের রেলিং ধরে ধরে ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় এসে দাঁড়াল মিশা। একটা দেশলাই জ্বালল।

অনেক জিনিসে ঠাসা সিঁড়িমুখটার শেষে একটা দরজা নজরে পড়ল — ছেঁড়া অয়েলক্লথ আর ফিতে দিয়ে ঢাকা। সাবধানে টোকা দিল মিশা।

অন্ধকারের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, 'লাথি মারো দরজায়! ও বাড়ির বুড়ি-গুলো কানে শুনতে পায় না। মারো লাথি!' যে বলল সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরেই উঠছিল।

উপদেশ মতো কাজ করতেই মিশার কানে এল পায়ের আওয়াজ। একজন মেয়েমানুষের গলার স্বর:

'কে ওখানে?'

'পদ্‌ভলোৎস্কিদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' চিৎকার করে মিশা জবাব দিল।

'কে তুমি?'

লিওলিয়া পদ্‌ভলোৎস্কায়ার কাছ থেকে আসছি।'

'সবুর। চাবিটা খুঁজে আনি।'

পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। তারপর পাঁচমিনিট বাদে মিশা ফের শুনতে পেল শব্দ। একটা চাবি যেন তালার ওপর অনন্তকাল খুট্‌মুট্‌ করে শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে গেল।

ভদ্রমহিলাটির পেছন পেছন ভিতরে ঢুকতেই মিশা কিসে ঠেকে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার জোগাড়। মহিলাকে দেখতে পাচ্ছিল না মিশা, শুধু

শুনছিল পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ আর বিড়বিড় করে কথা, 'দেখো যেন পড়ে যেও না, হ্যাঁ, দেখে শুনে!' যেন গলির ভেতরের এই গাঢ় অন্ধকারে ওর কিছু দেখার জো আছে!

মহিলাটি দরজা খুলে মিশাকে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন। তাস ছড়িয়ে রাখা একটা ছোট খেলার টেবিলে বাতির ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। পদ্‌ভলোৎস্কায়া দিদিমা বসেছিলেন টেবিলের ধারে। মিশা বুঝল ওকে যিনি ভেতরে নিয়ে এলেন তিনিই সোনিয়া মাসি।

মিশা আশেপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এলোমেলো সাজানো আলমারি, টেবিল, টুল, আরামকেদারা, ট্রাংক — সব মিলিয়ে ঘরটা যেন একটা আসবাবের দোকান। এক কোণায় একটা ছোট গ্র্যান্ডপিয়ানোর মসৃণ কিনারা দেখা যাচ্ছে। লোহার চুল্লি থেকে একটা নল বেরিয়ে ঘরের ভেতর দিয়ে সোজা চলে গেছে জানলার দিকে — ছাদের সঙ্গে তার দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা। মেঝের ওপর আলুর খোসা ছড়ানো। আরেক কোণায় একটা মুড়ো ঝাঁটা পড়ে আছে বহুদিনের ঝাঁট দিয়ে জমিয়ে রাখা জঞ্জালের গাদার ওপর। দরজার কাছে জলের কল। তার নিচে কানায় কানায় ভর্তি একটা বাল্‌তি।

'এসো হে খোকা।' বলে দিদিমা তাসের দিকে ফিরে বসলেন। তাঁর পুরনো গাউনের কিনারা মেঝের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। 'এসো, ঘরদোর অগোছাল দেখে কিছু মনে কোরো না বাছা, বড্ডো জায়গার অভাব এখানে।' তাসগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছি।' একটু থেমে তাস-

গ্লো সরাতে লাগলেন। 'সেইজন্যই এক-ঘরের ভেতর সবাই এসে জ্টেছি: জ্বালা-নির খরচা বড্ডো বেশি তো আজকাল।'

বাল্তির হাতল ধরে সেটাকে বোধহয় টেনে নিয়ে যাবারই ইচ্ছে করছিলেন সোনিয়া মাসি, মাঝপথে বাগড়া দিয়ে বললেন, 'মা, অতিথিটিকে বসতে পর্যন্ত বললে না আর ইদিকে জ্বালানির গল্প শ্রুর্ করে দিয়েছ?'

'তুই থাম্ সোনিয়া!' তাসের দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাব দিলেন দিদিমা, 'চাবিটা আবার ঠিক জায়গায় রেখেছিস তো?'

'হ্যাঁ, তবে দয়া করে যেন ওটাতে আর হাত দিও না।' সোনিয়া মাসি বাল্তিটা ফের মেঝেতে রাখলেন, নিশ্চয় আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলেন আরো জল ওতে ধরবে কিনা।

'কোথায় রেখেছিস?'

'আলমারিতে।' চটে গিয়ে জবাব দিলেন সোনিয়া মাসি। পিঠ সোজা করে বললেন, 'উঃ, একটু শান্তিতেও থাকতে দেবে না তুমি!'

ব্ড়ি মহিলাটি বললেন, 'তোকে দেখছি কিছ্ জিজ্ঞেস করাও যাবে না।' তাসগ্লো বে'টে নিয়ে আবার টেবিলে সাজাতে সাজাতে বললেন, 'নিজের ওপর তোর লজ্জা হওয়া উচিত, বাইরের লোকের সামনে!'

ব্ড়ি এবার মিশাকে বলতে লাগলেন:

'বোসো। তবে একটু সাবধানে। নিকুচি করেছে ওই চেয়ারগ্লোর! মিস্ত্রিটা পয়সা নিল বটে, কিন্তু স্রেফ কাজে ফাঁকি দিয়ে। আজকাল সবাই জোচ্চোর। যেমন ধরো কালকের কথা। ভালো জামাকাপড় পরা একটা লোক এল ড্রেসিং টেবিল কিনবে বলে। দাম চাইলাম এক লাখ, সে দিতে চাইল পনেরো র্ব্ল্। লোকটা আবার হাসে, ব্ঝলে তো! বলে কিনা ওসব লাখটাখের দিন ফুরিয়ে

গেছে।' বুড়ি আবার তাস খেলতে লাগলেন, 'আমি তাকে বললুম: "কী বললে? জানো হে ভদ্রলোক মশাই, যখন দশ-হাজারী নোট চালু হল আমি তো এক বছর বিশ্বাসই করতে পারিনি। সব জিনিসপত্র বেচে দিলুম খাঁটি রুবলের জন্য, আর এখন, মাপ করবেন মশাই, লাখ বলেছি, লাখই আমার চাই"।'

'মা!' সোনিয়া মাসি আবার বাধা দিলেন। 'বাল্‌তির পাশে উনি এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তোমার গল্প কে শুনতে চায়? ও কেন এসেছে তাই জিজ্ঞেস করো না।'

বুড়ি অধৈর্য হয়ে জবাব দিলেন, 'সোনিয়া, তুই আমাকে শেখাতে আসিসনি।' মিশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্রোসিমভ্‌দের ওখানে থেকে আসছো তো তুমি?'

'না, আমি...'

'তাহলে পভ্‌জ্‌দোরভদের ওখান থেকে?'

'না, আমি...'

'জাখ্‌লোপভ্‌দের ওখান থেকে তো?'

'আমি এসেছি আপনার নাতনি লিওলিয়ার কাছ থেকে। আপনি কি ভ্লাদিমিরকে চিনতেন... ভ্লাদিমির তেরেন্তিয়েভ?' একদমে বলে ফেলল মিশা।

৬৩

চিঠিপত্র

বুড়ি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বললে তুমি?'

ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল মিশা:

'ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভকে আপনি চিনতেন? নাবিক অফিসার ছিলেন, আপনার স্বামী অ্যাডমিরাল পদ্‌ভলোৎস্কির কাছে আকাদামীতে পড়তেন।'

কী ভাবতে ভাবতে বুড়ি বললেন, 'ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভ? না, আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।'

সোনিয়া মাসি বললেন, 'কেন, মা, তোমার তো নিশ্চয় মনে থাকার কথা!' আরেকবার বাল্‌তিটা উনি তুলেছিলেন কিন্তু কথাবার্তা শুরু হতেই ফের নামিয়ে রাখলেন, 'নিশ্চয় মনে আছে তোমার! আরে, ও আমাদের সেই বেচারা ভল্‌দেমার-এর কথা বলছে, সেই যে ক্সেনিয়ার স্বামী।'

'ওহো!' বুড়ি হাততালির ভঙ্গি করতেই টেবিল থেকে তাসগুলো পড়ে গেল। তুলবার জন্য মিশা চট্‌ করে নিচু হল। 'ও ভল্‌দেমার! হা ভগবান্‌! ক্সেনিয়া!' ছাদের দিকে চোখদুটো তুলে সুর করে বলতে লাগলেন বুড়ী, 'ভল্‌দেমার! ক্সেনিয়া! হা ভগবান, সে এক করুণ ব্যাপার! বেচারা ভলদেমার...' মিশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু সে তো খুন হয়েছিল।'

'আমি তা জানি। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজনের কথা বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, ভল্‌দেমারকে তো আমি চিনতাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুড়ী, 'ওর বউ ক্সেনিয়া সিগিজ্‌মুন্দভ্‌নাকেও চিনতাম। তবে সে অনেকদিন আগের কথা।'

মিশা উঠে দাঁড়াল, 'মাপ করবেন। ওঁর স্ত্রীর নাম আর পদবীটা কি বললেন?'

'ক্সেনিয়া সিগিজ্‌মুন্দভ্‌না।'

'সিগিজ্‌মুন্দভনা?'

'হ্যাঁ। ক্সেনিয়া সিগিজ্‌মুন্দভ্‌না। ভারি সুন্দরী ছিল।' দিদিমা বক্‌বক্‌ করে চললেন, 'পটের বিবির মতো।'

'আপনি কি তাঁর ভাইকেও চিনতেন?' সাবধানে প্রশ্ন করল মিশা।

'নিশ্চয়।' আবেগের ভাব দেখিয়ে বললেন দিদিমা, 'ভালেরি নিকিৎস্কি — চমৎকার অফিসার ছিল। আর দেখতে শুনতেও চমৎকার। যুদ্ধে সেও মারা পড়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'ওদের সবাইকেই আমি চিনতাম। কিন্তু সে তো অনেককাল আগের কথা। ভল্‌দেমারের মা তেরেন্তিয়েভা ... ও হ্যাঁ, মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না তেরেন্তিয়েভা, সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আমার কোনোদিনই পছন্দ হয়নি। বদমেজাজী মেয়েমানুষ, নেহাৎই সাধারণ পরিবারের লোক। কিন্তু,' ঠোঁটদুটো আত্মমর্যাদার সঙ্গে চেপে রেখে বললেন, 'কিন্তু, তোমার কি

মতামত তা তো জানিনে। আজকাল তো সাধারণ পরিবারের লোক হওয়াটাই ফ্যাশন কিনা।'

মিশা জিজ্ঞেস করল, 'ওঁরা এখন কোথায় আছেন আপনি জানেন?'

মাথা নেড়ে দিদিমা বললেন, 'আমি জানি না, ভাই। যা জানি না, তা জানি না। ওদের গোটা পরিবারটাই কেমন যেন অদ্ভুত গোছের ছিল, রহস্যময়। সব সময় খালি গুপ্ততথ্য, পুরনো কাহিনী, আর সব ভয়ানক জিনিস নিয়ে আলোচনা করত ...'

'আপনার কাছে কি ওঁদের আগের ঠিকানাটা থাকা সম্ভব?'

'সেও তো বলতে পারছি না। পিতার্স্‌বুর্গে ওরা থাকত, কিন্তু ঠিকানা ভুলে গেছি।'

হঠাৎ সোনিয়া মাসি বললেন, 'ঠিকানাটা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।'

দরজার কাছে বাল্‌তি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি। মিশা ওঁর দিকে ফিরল।

সোনিয়া মাসি বললেন, 'বাবার কাছে সে যেসব চিঠি লিখত তাতে ঠিকানা আছে। কিন্তু এই জঞ্জালের মধ্যে সে খুঁজে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

'দেখুন না একবার দয়া করে খুঁজে।' অনুনয়ভরা চোখে একবার সোনিয়া মাসির দিকে তাকাল মিশা, তারপর আবার চোখ ঘুরিয়ে দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন না একটু, বড়ো জরুরি দরকার। আমার একজন আত্মীয় নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিশা, 'আপনাকে আমি সাহায্য করব, আপনাকে একা কষ্ট করতে হবে না। শুধু বলুন আমায় কী করতে হবে! বলুন!'

'সোনিয়া, খুঁজে দে না একটু।' পরহিতৈষীভাবে বললেন দিদিমা, তারপর আবার মন দিলেন তাসে।

সোনিয়া মাসি ইতস্তত করছিলেন। এখন খুঁজতে বসলে জলের বাল্‌তিটা বাইরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হবে সুদূরপরাহত। তাই জমে থাকা জলের ওপর বাল্‌তিটা ফের বসিয়ে রেখে কি করতে হবে মিশাকে দেখিয়ে দিলেন।

মিশা আলমারি সরাল, দেরাজ ঘাঁটল, পিয়ানোর উপর উঠল, বাক্স টেনে বের করল, তারপর অবশেষে বের করল একটা ঝুড়ি। মেহনত হয়েছে অনেক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশা পেয়েছে।

ঝুড়ির উপর ঝুঁকে পড়ে সোনিয়া মাসি একটা মস্তো কাগজের পুলিন্দা টেনে বের করলেন। আবছা অক্ষরে ওপরে লেখা: 'ভ. ভ. তেরেন্তিয়েভ প্রেরিত।'

ঝুড়িটা যথাস্থানে রেখে টুপি মাথায় দিয়ে মিশা বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ!'

তাস থেকে মাথা না তুলেই দিদিমা বললেন, 'তোমার যখন খুশি এখানে এসো ভাই, যখন খুশি। আচ্ছা, নমস্কার।'

পকেটে চিঠিগুলোর পুলিন্দা চেপে ধরে মিশা ছুটে গেল ওর বন্ধুদের কাছে। ওরা মিশার জন্য তখন অপেক্ষা করছিল। সবাই হন্‌হন্ করে বাড়ির দিকে চলল।
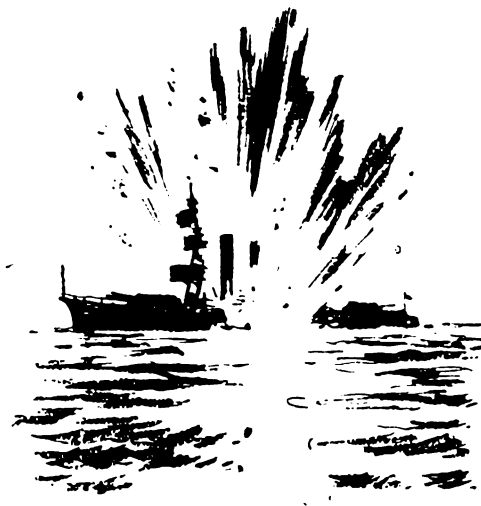
ষষ্ঠ পর্ব

পুশকিনোর কুটীর

৬৪

স্লাভা

চিঠিগ্নলো সব এক ধরনের খামে। ওপরে পরিষ্কার হাতে ঠিকানা লেখা: 'পিওতর নিকলায়েভিচ পদ্‌ভলোৎস্কি মান্যবরেষ্ন। নিবাস: র্নজেইনি লেন, মস্কো। প্রেরক — ভ. ভ. তেরেন্তিয়েভ, স. স. ভাসিলিয়েভার নিবাস, ময়কা, সেণ্ট-পিতার্স্‌ব্নর্গ।'

চিঠিগুলোর বক্তব্যও মোটামুটি এক। সন্ত-দিবসের অভিনন্দন, নববর্ষ আর বড়দিনের শুভেচ্ছা। শুধু একটা পোস্টকার্ড, ১৯১৫ সালের ১২ ই ডিসেম্বরে লেখা, একটু যা লম্বা।

তেরেন্তিয়েভ লিখেছে: 'প্রিয় পিওতর নিকলায়েভিচ্। রেলওয়ে স্টেশন থেকে লিখছি। আর আধঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে, তাই নিজে গিয়ে আপনাকে নমস্কার জানিয়ে আসতে পারলাম না বলে দুঃখিত। পুশ্‌কিনোতে আটক পড়ে গিয়েছিলাম। অথচ এদিকে ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিটে যোগ না দিলেই নয়। কপালে যা আছে ঘটুক

— আপনার বিশ্বস্ত ভ. তেরেন্তিয়েভ।'

গেঙ্কা স্থির করে ফেলল. 'পেত্রোগ্রাদে আমাদের যেতেই হবে।'

'পুশকিনোর কথাও তো পোস্টকার্ডে লেখা আছে।' মিশা বলল।

গেঙ্কা আপত্তি তুলল, 'যখন আসল ঠিকানাটা পাওয়াই যাচ্ছে তখন শুধু শুধু কেন মাথা ঘামানো? আমাদের যেতেই হবে।'

স্লাভা বলল, 'এ চিঠিগুলো আট বছরের পুরনো। হয়তো তেরেন্তিয়েভ পরিবারের একজনও ওখানে এখন থাকেই না।'

মিশা ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলল, 'আগে ঠিকানা বিভাগকেই জিজ্ঞেস করে দেখব।'

ছেলেরা একটা চিঠি মুসাবিদা করল। খামে চিঠিটা পুরে খেয়াল হল স্ট্যাম্প তো নেই। অগত্যা ঠিক হল পরদিন সকালে চিঠিখানা ফেলা হবে।

স্লাভাদের বাড়িতে বসেছিল ওরা একা। আল্লা সের্গেয়েভনা রোজকার মতো থিয়েটারে কাজে গেছেন। কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ কারখানা থেকে এখনো ফেরেননি।

টেবিলের ওপর সবুজ খামখানার দিকে তাকিয়ে গেঙ্কা যেন স্বপ্ন দেখছে এমনি সুরে বলল, 'হুম্‌ম্‌। এবার আমাদের শেষ তুরুপের মার। এখন তো গুপ্তধন হাতেই এসে গেল।'

স্লাভা হাসল, 'এখনো তুই গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখছিস?'

'দেখব না কেন?' একগুঁয়ের মতো মাথা দুলিয়ে গেঙ্কা বলল, 'আমি সব বের করে ফেলেছি। সেকালে সবাই বিরন্‌কে* ভয়ানক ভয় করত, তাই তার ভয়ে ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখত। এ একেবারে নির্ঘাৎ।'

মিশা ওকে খোঁচাল, 'আর কী কী বের করে ফেলেছিস শুনি?'

একটুও না দমে গেঙ্কা বলে চলল, 'আর জানতে পেরেছি, গুপ্তধন যে পায় তার প্রাপ্য সম্পত্তির সিকিভাগ। তার মানে, আমাদের ভাগ এখনই বুঝে নিতে হবে, নয়তো গোটা বছর পেছিয়ে যাবে।' ব্যবসাদারী ঢঙে সে কথাগুলো শেষ করল।

বন্ধুরা হেসে উঠল।

স্লাভা বলল, 'আমি অবিশ্যি গুপ্তধন-টনে বিশ্বাস করি না। তবে, ধরই যদি সত্যি তেমন কোনো সন্ধান পেয়ে যাই আমরা, সম্পত্তির একটা অংশ আমাদের প্রাপ্য হবে। তখন আমরা কী করব তা দিয়ে?'

'কী?' গেঙ্কা বলে উঠল, 'সে তো কোন্ যুগে ঠিক করে ফেলেছি। একটা অনাথ শিশুসদন বানাবার জন্য দেব টাকাটা। টাকাতে একটা গোটা অনাথ শিশুসদন বানানো হবে। খবরের কাগজগুলো তখন আমাদের কথা লিখবে।'

'শুধু খবরের কাগজ কেন?' মিশা আরো জুড়ে দিল, 'দরজার ঠিক ওপরেই লেখা থাকবে: "গেন্নাদি পেত্রোভ অনাথ শিশুসদন"।'

স্লাভা ভাবতে ভাবতে বলল, 'যদি সত্যিই গুপ্তধন পাই তাহলে ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যাবাস বানাবার জন্য আমি টাকা দেব। কৃষ্ণসাগরের ধারেই কোনো এক জায়গায় চমৎকার একটা বড়ো স্বাস্থ্যাবাস...'

'আজ্ঞে না, ধন্যবাদ।' গেঙ্কা মাথা ঝাঁকাল, 'তোর নিজের ভাগ নিয়ে যা খুশি করতে পারিস, কিন্তু আমি আমার মতে খরচ করব। স্বাস্থ্যাবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র! ও সব মেয়েলি ব্যাপার! কিন্তু সত্যি বলছি, আমাদের উচিত মস্কোর ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড স্টেডিয়াম বানানো, তাতে স্কেটিং-এর ঘেরা মাঠ থাকবে, ফুটবলের

---

* রাণী আন্না ইওআন্নভ্‌নার আমলে দরবারের প্রিয়পাত্র ও শাসক।

ময়দান, টেনিসকোর্ট থাকবে। ব্যস্। আর ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য টিকিট লাগবে না।'

মিশা ঠাট্টা করে বলল, 'সব ভাগ বাঁটরা করে দিয়েছিস তো? কিছু ভুলে বাদ দিসনি?'

হেসে স্লাভা বলল, 'দ্যাখ্ মিশা, এ সবই তামাশা করে বলা হল। কিন্তু সত্যিসত্যি ধর যদি গুপ্তধন পেয়েই যাস, তাহলে তা কি কাজে লাগাবি বলতো?'

মিশা জবাব দিল, 'তা তো জানি না। আগে কখনো ভাবিনি। তবে আমার বিশ্বাস হয় না কোনো গুপ্তধন আছে।'

গেঙ্কা বলল, 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। আর এও বলে দিচ্ছি যে স্টেডিয়ামটা আমরা তৈরি করবই। তবে স্বাস্থ্যাবাস আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র... ও সব হল স্লাভার কল্পনা। হয়তো তুই একটা গান বাজনার ইস্কুল খোলার কথাও ভেবেছিস, নারে?'

স্লাভা মনে মনে আঘাত পেয়ে বলল, 'কেন, তাতে দোষটা হয়েছে কি? তুই কি ভাবিস গান বাজনার ইস্কুলের চেয়ে স্টেডিয়ামটাই বেশি দরকার?'

'হুঃ, কীসের সঙ্গে কী! গান বাজনার ইস্কুল! দ্যাখ্, ভাই ...' বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীরভাবে গেঙ্কা বলল, 'বুঝলি স্লাভা, তোর কিন্তু ভবিষ্যতের কথাটা আরো ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত।'

'কেন?'

'যেন তুই জানিসনে! তুই তো সংগীতজ্ঞ হবি ভেবে রেখেছিস। তাই না?'

'ভাবলামই না। তাতে কী হয়েছে?'

'আরে, দেখতে পাচ্ছিস না? মিটিং-এ তো গিয়েছিলি, কমসমোলদের কী কর্তব্য সবই শুনেছিস। কোলিয়া কী বলল? বলল যে কমসমোলদের কাজ কমিউনিজম গড়ে তোলা। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার সঙ্গে গানবাজনার কী সম্পর্ক?'

'তুই একটা আস্ত গাধা! সবাই সমাজ গড়ে তোলার কাজ করবে আর তুই বসে পিয়ানোর চাবি টিপবি! সেটি চলবে না।'

'তুই যে কী গড়বি সে তো দেখতেই পাচ্ছি! চমৎকার মিস্তিরি হবি বটে!' স্লাভা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' ফুর্তির সঙ্গে বলল গেঙ্কা, 'সাত-সালা ইস্কুলের পড়া শেষ করেই একটা কারখানা-ইস্কুলে ঢুকব। ধাতু মিস্ত্রি হব, একেবারে খাঁটি মজুর। শিক্ষানবিসীর আর দরকার হবে না, এমনিতেই কমসমোলে নিয়ে নেবে। মিশার সঙ্গে অনেক দিন আগেই আমাদের এসব কথাবার্তা হয়ে গেছে। তাই না রে মিশা?'

মিশা ইতস্তত করল।

ইয়ং পাইওনিয়রদের আগের সভায় কোলিয়া ওদের লেনিনের বক্তৃতা পড়ে শুনিয়েছিল — ১৯২০ সালের কমসমোলের তৃতীয় সম্মেলনে লেনিনের বক্তৃতা। বক্তৃতার একটা অংশ মিশার মনে খুব দাগ কাটে: '... এখন যাদের বয়েস পনের তারাই ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজ দেখতে পাবে, তারাই নিজের হাতে গড়ে তুলবে এই সমাজ। তাই তাদের জানা উচিত যে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হল এই সমাজ গড়ে তোলা।'

মিশা অনেকদিন এই কথাগুলো মনে মনে চিন্তা করে দেখেছে। গেঙ্কা স্লাভা আর ওর নিজের কথাই তো বলা হয়েছে এতে। ওদের সারা জীবনের উদ্দেশ্য কমিউনিজম গড়ে তোলা। পলেভোয় ঠিক এই কথাই একদিন বলেছিল: "যদি সব মানুষের জন্য বাঁচো, সে হবে প্রকাণ্ড জাহাজে পাল খাটিয়ে পাড়ি দেবার মতো।" শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য বাঁচাই হল কমিউনিজম গড়ে তোলার প্রকৃত অর্থ। তাহলে স্লাভার কী হবে? ও কি শুধু নিজের জন্যই গান রচনা করে কাটাবে? সাধারণ মানুষেরও কি গান বাজনার প্রয়োজন নেই? তাহলে 'আন্তর্জাতিক' গানটা কেন? স্লাভার দিকে তাকাল মিশা।

বলল, 'ঘাবড়াসনি রে স্লাভা। আমার মনে হয় তোকে ওরা কমসমোলে নিশ্চয় নেবে।'

৬৫

কন্‌স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ

হলঘরের দরজায় ক্যাঁচ্ করে আওয়াজ হল। ছেলেরা শুনল বারান্দার মধ্যে কে যেন কোট আর গালোশ খুলছে, তারপর নাক ঝাড়ছে। স্লাভা কান পেতে রইল।

'ওই বাবা এলেন।'

কন্‌স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ ভেতরে ঢুকলেন, বড়ো রুমালখানা দিয়ে তখনো নাক ঝাড়ছেন। এমনিতেই গালগুলো লাল্‌চে, এখন আবার বরফের ঠাণ্ডায় একেবারে সিঁদুরে রঙ ধরেছে। খুদে খুদে চোখদুটোয় ওঁর স্বাভাবিক সদয় হাসিটুকু তেমনি লেগে রয়েছে।

'ওহো, আমাদের পাইওনিয়ররা যে!' ছেলেদের সাদর অভিনন্দন জানালেন উনি, 'নমস্কার!' ওদের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে গিয়ে যখন স্লাভার পালা এল, বললেন, 'আজ সারাদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, বুঝলে না!'

বাড়ির ঝি দাশাও কন্‌স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচের পেছন পেছন এসেছিল। সে টেবিল সাজাতে লাগল।

কন্‌স্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ হাত ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে সেটাকে একটা চেয়ারের পিঠের ওপর ঝুলিয়ে টেবিলের ধারে বসে পড়লেন। স্লাভা তোয়ালেটা নিয়ে শোবার ঘরে রেখে ফিরে এল খাবার ঘরে।

'তারপর, পাইওনিয়ররা, কী নিয়ে আলাপ হচ্ছিল তোমাদের?' কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচের নজরে খামটা পড়তেই উনি সেটা তুলে নিয়ে ঠিকানা পড়লেন, 'ঠিকানা বিভাগ, পেত্রোগ্রাদ'। কার খোঁজ করছ হে তোমরা?'

'ওই একজন।' স্লাভা ওর বাপের হাত থেকে খামটা নিয়ে পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বলল।

একটুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরতে পুরতে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ হেসে বললেন, 'ও, গোপনীয় ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি! তারপর কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের?'

স্লাভা জবাব দিল, 'নানা ধরনের পেশা নিয়ে কথা হচ্ছিল বাবা — এই কে কী হবে তাই।'

'হুম্! আচ্ছা, তা কে কী হতে যাচ্ছ বলো দেখি?'

'এই মানে একটু ... ঠিক করে বলা যায় না ... এই কথা হচ্ছিল আর কি ...'

'সে যাই হোক্,' ঝোলে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে একটু চেখে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ বললেন, 'তোমরা শেষ অবধি কী ঠিক করলে?'

'আমি হব সংগীতজ্ঞ, আর ওরা ...' বন্ধুদের দেখিয়ে বলল স্লাভা, 'ওদের কথা ওরা নিজেরাই বলুক। গেঙ্কা বলে সংগীতজ্ঞরা নাকি কমসমোলের সভ্য হতে পারে না।'

'তা আমি মোটেই বলিনি,' গেঙ্কা প্রতিবাদ জানাল।

'নিশ্চয় বলেছিস। মিশা শুনেছে।'

'তাহলে তোরা বুঝতেই পারিসনি আমার কথা।' কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচের দিকে তাকাল গেঙ্কা, 'আমি বলতে চেয়েছি যে গানবাজনা শেখার সঙ্গে সঙ্গে তোর আরও কিছু পেশাও থাকা চাই যাতে কাজ হয়।' এড়িয়ে যাবার মতো কথা গেঙ্কা ভেবেচিন্তে বলল, কারণ সে ভালো করেই জানত যে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ আর স্লাভার মধ্যে এই নিয়ে একটা মন কষাকষির ব্যাপার রয়েছে।

কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ তারিফ করে বললেন, 'ঠিক বলেছ গেঙ্কা, সাবাস্ ছেলে! ঠিক এই কথাটা নিয়ে প্রায়ই স্লাভার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। পেশা একটা চাই-ই। জীবনে নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবেই। অবসর সময়ে তুমি বুলবুলের মতো গলা সাধতে পারো।'

স্লাভা বলল, 'তবু আমি সংগীতজ্ঞই হব।'

'হও না কেন, কে বারণ করছে? বরোদিন অতো বড়ো সংগীতবিশারদ,

অথচ তিনিও ছিলেন একজন রসায়নবিৎ। কেমন মনে হয়? রসায়নবিদের কাজ ...'

'সে তো ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার বাবা।'

'নিশ্চয়।' প্লেট সরিয়ে নেপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ বললেন, 'রসায়নবিৎ না হলেও তোমার চলবে। অন্য একটা পেশা নিতে পারো — যাতে সত্যিকারের কাজ হয়।'

স্লাভা তর্ক তুলল, 'সংগীত, অভিনয়, ছবি আঁকা, সাধারণভাবে যে-কোনো আর্টই কি পেশা নয়?'

'হ্যাঁ, পেশা তো বটে, তবে ওসব হল ... আকাশ বিহার ...' কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ শূন্যের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন।

স্লাভা তবু গোঁ ছাড়ল না, 'কেন আকাশ বিহার ভাবছ? রাশিয়ার খ্যাতির মূলে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকেরই পেশা ছিল আর্ট। সংগীত রচয়িতা চাইকোভস্কি আর গ্লিন্‌কা, চিত্রশিল্পী রেপিন, সাহিত্যিক তল্‌স্তয়।'

কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ টেনে টেনে বললেন, 'বুঝলে হে বন্ধু, তুমি তো সব বড়ো বড়ো লোকদের কথা বলছ। সবারই তো আর প্রতিভা থাকে না।' তারপর একটু চুপ করে মিশার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, 'আর তুমি কি করবে মিশা? এ সব ব্যাপারে তোমার মত কি?'

মিশা বলল, 'স্লাভার সঙ্গে আমি একমত। ও যদি সংগীতজ্ঞই হতে চায় তাহলে ওর সংগীতচর্চা করা উচিত, সংগীতজ্ঞই হওয়া উচিত। আপনি বলছেন ওর পেশাদারী কাজ কিছু শেখা দরকার। তা যদি ও করে তাহলে ওকে একটা ইন্‌স্টিটিউটে যেতে হবে। ধরুন ইঞ্জিনীয়রই হতে গেল। কিন্তু নিজের কাজে ওর মন বসবে না, যেই পাশ করে বের হবে সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছেড়ে গানবাজনা শুরু করে দেবে। তার মানে সময় নষ্ট, সরকারের টাকার অপব্যয়। শুধু তাই নয়, ও এমন একটা পদ দখল করে থাকবে যে জায়গায় থেকে অন্য লোক খুশি হয়ে কাজ করত। আমাদের দেশে এত ইনস্টিটিউট এখনো হয়নি যে লোকে একটা পেশা নেবে তারপর সেটা ছেড়ে আবার একটা ধরবে।'

কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ একচিল্‌তে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে কী যেন ভাবছিলেন, 'উম্‌-হুঁ-হুঁ, তোমার সঙ্গে দেখছি একমত হতে পারছি না। আমি আবার সেকেলে ধরনের মানুষ কিনা।'

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলেন উনি।

বলতে লাগলেন, 'আমি জিনিসটাকে দেখি এইভাবে। আমার যখন বয়েস অল্প তখন আমিও সখের থিয়েটারে অভিনয় করতাম, প্রায় একজন অভিনেতাও হয়ে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও একজন অভিনেত্রী। তরুণ বয়েসে একটু অস্থির অধৈর্য ভাব থাকেই জানি।' বলতে বলতে সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন, 'কিন্তু এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।'

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার ঠেলে দিলেন টেবিলের কাছে, তারপর টেবিলের কাপড়খানা সমান করে আবার পায়চারি করতে লাগলেন।

'এক সময় আমারও চোদ্দ বছর বয়েস ছিল। তখন আমারও ছেলেবেলার জগৎ ছিল, নিজের খেয়ালখুশি, নিজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, বই, স্বপ্ন নিয়ে মশগুল থাকতাম, এদিকে আশেপাশের জীবন আপন ধারায় বয়ে চলত।' আঙুল তুলে একটু জোর দিয়েই বললেন, 'জীবনটা ছিল একটা ঘন অরণ্যের মতো। আকর্ষণীয় অথচ একই সঙ্গে ভীতিজনকও: একেবারে একা পড়ে গেলে কী হয়, ভেবে দেখ। আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, বাড়িঘর নেই — একেবারে একা! আর মনে আছে, আমার মা আমায় নিয়ে কেবলই দুর্ভাবনার মধ্যে থাকতেন। ভাবতেন, যখন আমি একা পড়ে যাব তখন কিভাবে নিজের রাস্তা করে নেব। রাস্তা করে নেব! কথাগুলোও কী কঠিন!' সবল হাতের মুঠো শূন্যে দুলিয়ে আবার বললেন, 'রাস্তা কেটে নেব আমি!! আমায় লড়াই করতে হয়েছিল!!... আর ও,' মিশাকে দেখিয়ে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ বললেন, 'ও তো এখনই সরকারের টাকার হিসেব করছে। বলছে, সরকার কেন অযথা টাকা খরচ করবে।... আমার যখন বয়েস কম তখন ভাবতাম: "ওঃ, ওই কাজটা তো বেশ ভালো, বেশ পয়সাও আসে, কেমন করে বাগানো যায়!" আর এখন মিশা বলছে: "স্লাভা, ইনস্টিটিউটে গিয়ে শুধু শুধু একটা জায়গা দখল করে রেখো

না, আর কেউ হয়তো তোমার জায়গায় পড়তে পারত।"... আর কেউ! এই আর কেউ-টি কে? ইভানোভ? পেত্রোভ? সিদরভ? কে সে? ওর বন্ধু? আত্মীয়? ধারে কাছে কেউ না! তাকে ও কখনো দেখেনি, চেনে না, জানে না, জানার দরকারও নেই।... সরকার আরেকজন ইঞ্জিনীয়র পাবে সেইটেই ওর কাছে আসল প্রশ্ন। সেই নিয়েই ওর সবচেয়ে বেশি চিন্তা।'

স্লাভা হাসল, 'তোমার কি মনে হয় সেটা ঠিক নয়?'

'আমি বলছি না যে সেটা ভুল।' পায়চারি করতে করতেই বললেন কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ। তারপর গেঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখলে তো গেঙ্কা, আমাদের হারিয়ে দিল ওরা। অ্যাঁ?'

গেঙ্কা আপত্তি তুলল, ' "আমাদের" বলছেন কেন? আপনিই তো হারলেন, "আমরা" নয়।'

'সে কী কথা! সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ প্রশ্ন করলেন, 'মাত্র এক মিনিট আগেও না তুমি আমার মতে সায় দিচ্ছিলে?'

গেঙ্কা টেনে টেনে বলল, 'ও! সে তো অনেক কাল আগে!' ঘরের আরেকদিকে সরে গেল ও।

অসহায় ভঙ্গি করে কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ বললেন, 'আমার একজন মাত্র মিত্র, সেও এখন শত্রু পক্ষে যোগ দিয়েছে। তা বেশ, তুমি নিজে কী হবে শুনি?'

গেঙ্কা জানিয়ে দিল, 'আমি নৌবাহিনীতে কাজ করব।'

স্লাভা হাসল, 'ও মিনিটে মিনিটে মত বদলাচ্ছে। মাত্র একঘণ্টা আগেও ও বলছিল কারখানা-ইস্কুলে ঢুকবে, আর এখন বলছে জাহাজী হবে।'

গেঙ্কা নির্বিকারভাবে বলল, 'আগে কারখানা-ইস্কুলে, তারপর নৌবাহিনীতে।'

'বেশ, বেশ। তারপর তুমি, মিশা?'

'আমি জানি না। এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

গেঙ্কা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও-ও তো কারখানা-ইস্কুলে যেতে চায়। আমি জানি। তারপর ওর ইচ্ছে আছে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে!..'

'চুপ কর্‌তো গেঙ্কা!' মিশা ওকে থামাল।

কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নজরটা তোমাদের খুবই উঁচু। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি মিশা মাধ্যমিক ইস্কুলের পড়াটা শেষ করবে।'

মিশা অনিচ্ছাভরে জবাব দিল, 'আমি জানি না। মার বড়ো কষ্ট হয় কিনা...'

স্লাভা বাধা দিয়ে বলল, 'ওকে ইস্কুল ছেড়ে যেতেই দেবে না। ও যে ক্লাশে প্রথম হয়।'

মিশা বলল, 'সন্ধ্যের ক্লাশে আমি পড়তে পারি। অনেক কমসমোল সভ্য দিনে কাজ করে, রাতে পড়ে। দেখি কী করা যায়।'

বড়ো ঘড়ির দিকে তাকাল মিশা। মিনিটের কাঁটাটা একটু কেঁপে উঠে '৯' অঙ্কটার ওপর এসে দাঁড়াল। পৌনে বারোটা বেজেছে। বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হল ছেলেরা।

কনস্তান্তিন আলেক্সেয়েভিচ ওদের বিদায় দেবার সময় তারিফ করে বললেন, 'বেশ ভাই, বেশ। সামান্য একটু তর্কাতর্কি'র ফলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে না আশা করি। তোমরা যাই করো না কেন তাতেই আমার সত্যিকারের শুভ কামনা রইল।'

৬৬

চিঠি লেখালেখি

এক সপ্তাহ পরে ঠিকানা বিভাগ থেকে ওরা একটা জবাব পেল।

জবাবে লিখেছে: 'আপনাদের অনুরোধের উত্তরে আমরা জানাচ্ছি যে, কারোর সম্বন্ধে খোঁজ করতে হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্মসাল ও জন্মস্থানের নাম পাঠাতে হয়।'

গেঙ্কা বলল, 'এখন খুঁজে বের করো মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না কবে কোথায় জন্মেছিলেন। আমাদের পেত্রোগ্রাদেই যেতে হবে।'

মিশা জবাব দিল, 'তার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাবে। তবে এই যে উত্তরটা এসেছে এটা স্রেফ কর্মচারীদের গড়িমসির ব্যাপার। ওখানকার কমসমোল দলের সভাপতির কাছে আমরা লিখব এবার।'

বন্ধুরা মিলে নিচের চিঠিটা মুসাবিদা করল:

'কমসমোল সভাপতি সমীপেষু, ঠিকানা বিভাগ, পেত্রোগ্রাদ।

'প্রিয় কমরেড সভাপতি,

'আপনাকে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন, কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। যুদ্ধের আগে ১৯১৪ সালে ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভ তাঁহার স্ত্রী ক্সেনিয়া সিগিজ্‌মুন্দভনা ও মাতা মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার সহিত পেত্রোগ্রাদের ময়কা স্ট্রীটে স. স. ভাসিলিয়েভার নিবাসে থাকিতেন। আপনি কি দয়া করিয়া জানাইবেন তাঁহারা এখনও সেখানে আছেন কিনা। তাঁহাদের সকলেই অবশ্য নয়, কারণ ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ একটি যুদ্ধজাহাজ বিস্ফোরণের ফলে মারা যান, কিন্তু তাঁহার মা ও স্ত্রী সম্ভবত জীবিত আছেন। আমরা ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের কর্মচারীরা তেরেন্তিয়েভ পরিবারের জন্মসাল ও জন্মস্থানের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। ইহা নেহাৎই আমলাদের গড়িমসি। কমসমোল সভাপতি হিসাবে আপনার উচিত এই গড়িমসির প্রতি আরো নজর দেওয়া এবং ইহাকে লাল আগুনের মুখে পুড়াইয়া ফেলা।

'ইয়ং পাইওনিয়রগণের অভিনন্দনসহ
পলিয়াকোভ, পেত্রোভ, এল্‌দারভ।'

চিঠিটা বাক্সে দিয়ে ওরা অপেক্ষা করে রইল।

স্কুলের বছর প্রায় অর্ধেক ফুরিয়ে এসেছে।

ছেলেরা সব বিষয়ই ভালো রপ্ত করে এনেছে — এক গেঙ্কাই শুধু জার্মান ভাষায় সুবিধা করতে পারছে না।

'আমি বুঝি না কেন আমাদের এই "ডয়ট্শে ষ্প্রাখে" গেলানো হচ্ছে।'

'বুঝি না মানে? কী বলতে চাস্?' মিশা জবাব দিল, 'যদি জার্মানিতে যাই তাহলে?'

'কেমন করে যাব?'

'খুব সোজা। স্রেফ উঠে চলে যাব।'

ইদানীং ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে। তাছাড়া ইয়ং পাইওনিয়র দলের কাজও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সন্ধ্যের দিকটা তো প্রায়ই ফাঁকা থাকে না। নতুন যে শিশুসদন ওদের আওতায় এসেছে সেখানে কাজ করতে হয়, ইয়ং পাইওনিয়র ভবনের কারখানাঘরে ক্লাস আছে, ওদের উপদলের সভা আছে। স্কুল কমিটির সভা আছে। তারপর ছেলেরা আজকাল কমসমোলের প্রকাশ্য সভায় যেতে কখনো ছাড়ে না, সন্ধ্যের দিকে একেকদিন নিজের বাতিক অনুসারে বিভিন্ন চক্রেও যোগ দেয়। প্রত্যেক রবিবার সকালে ইয়ং পাইওনিয়রদের দলের সভা বসে। আর মিশার উপদলকে ওরেখভো-জুয়েভো জেলার পাইওনিয়র, জার্মানির খেমনিৎস সহরের পাইওনিয়র এবং লাল নৌবহরের নাবিকদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতে হয়।

তাছাড়াও আছে সপ্তাহে দু-তিনবার করে স্কেটিং করা।

স্কেটিং-এর ময়দানে বন্ধুরা আসে সন্ধ্যের সময়। তাড়াতাড়ি করে লোক জনের ভিড়ে বেঞ্চের ওপর পোশাক বদলে নিয়ে পায়ে স্কেট্ বাঁধে, সঙ্গের জিনিসপত্র রেখে দেয় পোশাক-ঘরে। পোশাক-ঘরের কাঠের পাটাতনে স্কেটের ধপ্ ধপ্ আওয়াজ ওঠে, হরদম খোলা হচ্ছে বলে দরজার ফাঁক দিয়ে স্কেটিং ময়দান থেকে সাদা কুয়াশার মেঘ উঠে ঘরের ভেতর ঢুকতে থাকে। বয়স্ক স্কেট-খেলোয়াড়রা অন্য একটা ঘরে কাপড়জামা বদলায়। কালো আঁটসাঁট পাৎলুন, জামা আর টুপি পরে ওরা বেরিয়ে আসে। ছেলেরা তারিফ করে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে: "ওই দ্যাখ্ মেল্‌নিকভ... ইপ্পলিতভ... কুশিন..." *

---

* এঁরা সবাই স্কেটিং চ্যাম্পিয়ান।

আর্ক্‌বাতি থেকে আলোর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, বরফের ওপর তুষার-রেখা ঝলমল করে ওঠে। স্কেটাররা গোল হয়ে কেবলই ঘুরতে থাকে আর এই উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে ওদের যেন কেমন একটু বেয়াড়া ধরনের দেখায়। যদিও ওরা দল বেঁধে ঘোরে, তবু, হয় একটু তফাৎ রেখে নয় জোড়ায় জোড়ায় এ ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। যারা একেবারে কাঁচা তারা সাবধানে চলে, পা একেবারে আকাশে তুলে আনাড়ির মতো গোত্তা দেয়, তারপর নিজেদেরই ধাক্কার গতিতে বিদঘুটেভাবে সামনে এগিয়ে চলে।

য়ুরা স্তোৎস্কি ছাড়া আর সব ছেলেরই প্রথম 'হাতেখড়ির' স্কেট্‌। য়ুরার একজোড়া নরওয়েজীয়ান স্কেট্‌ আছে।

কালো গেঞ্জি পাজামা পরে ও শুধু স্কেট-দৌড়ের বাঁধা রাস্তায় ছোটে, শরীরটা বেশ সামনে ঝুঁকিয়ে হাত দুটো পেছনে রেখে। ওর মুখ আর দেহের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটে ওঠে অন্য সব ছেলেদের সম্পর্কে একটা অসীম অবজ্ঞা।

মিশা আর স্লাভা ওর দিকে নজর দেয় না, কিন্তু গেঙ্কা সহ্য করতে পারে না য়ুরার দেমাকী চালচলন। একদিন তাই দৌড়ের রাস্তায় ঢুকে সেও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করল। গেঙ্কা খুব ভালো স্কেটার, ইস্কুলের সবচেয়ে সেরা, কিন্তু য়ুরার সঙ্গে ওর স্কেট্‌ জোড়ার যে তুলনাই হয় না। তাই য়ুরার প্রায় অর্ধেকটা রাস্তা পেছনে পড়ে থাকল। একেবারে বদনাম করে ফেলে নিজের।

ঐ 'দৌড় প্রতিযোগিতার' পর থেকে গেঙ্কার বন্ধুরা ওকে ঠাট্টা করতে শুরু করল, জিজ্ঞেস করত আবার করে সে য়ুরার সঙ্গে লড়বে। উপদেশ দেয়, স্কেটের সামনের উঁচু দিকটা কেটে ফেলে উকো ঘষে ধার করে নিতে। স্কেটিং ময়দানে এখন ওর পেছনে হরদমই একদল ছেলে লেগে থাকে। খালি ওকে ওস্‌কায়।

'এই ফেল্‌ট্‌জুতো! নতুন রেকর্ড করবি না?'

য়ুরা স্তোৎস্কির অহঙ্কারে আর মাটিতে পা পড়ে না।

গেঙ্কা মনমরা হয়ে ময়দানে যাওয়া বন্ধ করে দিল। রাস্তায়ও আর স্কেটিং

করে না। খুব বিমর্ষ হয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু একদিন বন্ধুদের একেবারে অবাক করে দিয়ে সবাইকে ওর জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে বসল। সামনের শনিবারে ওর জন্মদিন।

'সবাইকে নিজের নিজের খাবার আনতে হবে নাকি রে?'

'খাবার আমার, তোরা কিন্তু উপহার আনবি।'

'বেশ। আমরা আসব, দেখব তুই কেমন অতিথি-সৎকার করিস।'

৬৭

গেঙ্কার জন্মোৎসব

শনিবার সন্ধ্যায় ছেলেরা এল গেঙ্কার বাড়িতে। টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো খাবারের আয়োজন দেখে ওদের তো চক্ষু চড়কগাছ। একদিকে রয়েছে একটা ফুটন্ত সামভার, ওপরে রঙিন কেত্‌লি চাপানো। টেবিলের মাঝখানে খাবারভর্তি প্লেট: চর্বির চিলতে, দইমণ্ড, মাংসের কোপ্তা, আর মেঠাই। ছ'জনের জন্য পরিবেশন করা হয়েছে। টেবিলের পাশে ঘুরঘুর করছেন আগ্রিপ্পিনা পিসি।

মিশা টেনে টেনে বলল, 'ও বাবা! এত কি করেছিস? গেঙ্কা তোর ভালো হোক্!'

গেঙ্কা উদাসীনভাবে বলল, 'বিশেষ কী আর এমন! বসবি না তোরা?' নাটুকে ভঙ্গি করে ওদের টেবিলে আমন্ত্রণ জানাল গেঙ্কা।

আগ্রিপ্পিনা পিসি বললেন, 'এখুনি বন্ধুদের বসতে বলছিস কেন রে? অন্যদের জন্য সবুরও করবি না?'

ছেলেরা একসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'কারা আসবে?'

গেঙ্কা লাল হয়ে উঠল।

'মিখাইল করোভিন। আর কেউ না। সত্যি বলছি, আর কেউ আসবে না।'

ছ'নম্বর প্লেটটা দেখিয়ে মিশা জিজ্ঞেস করল, 'এটা তাহলে কার জন্য?'

'ওটা ? ও ! ওটা এমনি রাখা হয়েছে ! জানি তো না ... যদি কেউ হঠাৎ এসে পড়ে।'

'এত জোগাড় করলি, টাকা পেলি কোথায় ?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'সে আমার এক গোপন রহস্য আছে,' বলেই গেঙকা আগ্রিপ্পিনা পিসির দিকে তাকাল, কিন্তু তার আগেই পিসিমা মুখ খুলেছেন।

সব ফাঁস করে দিয়ে বললেন, 'ওর বাবা পাঠিয়েছে। আমি ওকে বললাম, গেন্নাদি, যা খাবার তা একমাস চলবে, কিন্তু কে কার কথা শোনে। সব টেবিলে এনে রাখো, সাবাড় করে দাও, ব্যস ! এই হল ওর কথা। স্বভাবটাই ঠিক ওর বাপের মতোই !' মন্তব্য করলেন পিসিমা। তিরস্কার করে কথাগুলো বললেও গলার স্বরে ওঁর তারিফের সুর ফুটে উঠেছে।

মিশা বলল, 'উনি তো মিষ্টিও পাঠিয়েছেন দেখছি।'

আগ্রিপ্পিনা পিসি বললেন, 'না! গেঙকা নিজেই কিনেছে রে। স্কেট্‌দুটো বেচে দিয়েছে।'

গেঙকা চেঁচাল, 'পিসিমা ! তোমায় না বলেছিলাম কিচ্ছু বলে দিও না ?'

আগ্রিপ্পিনা পিসি হাত নেড়ে বললেন, 'বলব না কেন শুনি ? ভালো কাজই তো করেছ। ফেল্ট্‌জুতো জোড়া এবার একটু বেশি টিঁকবে।'

মিশা বলল, 'আমি যদি জানতাম বড়াই দেখাবার জন্য তুই স্কেট্‌ বেচে দিয়েছিস তাহলে আসতামই না।'

গেঙকা মাথা নাড়ল, 'স্কেট ছাড়াই চালিয়ে নেব। আমার জোড়াটা কি বিচ্ছিরি! যখন কাজে ঢুকব তখন একজোড়া নরওয়েজীয়ান রেসের স্কেট কিনে নেব। তুইও তো তোর স্ট্যাম্পের খাতা বেচে দিয়েছিস, তাই না ? কেন বেচলি ?'

এড়াবার মতো করে জবাব দিল মিশা, ‘বেচতে হল যে।’

‘আমি জানি।’ গেঙ্কা বলল, ‘চামড়ার জ্যাকেট কিনবি বলে পয়সা জমাচ্ছিস। যাতে খাঁটি কমসমোল সভ্যের মতো দেখায়।’

‘হতে পারে।’ মিশা এড়িয়ে গেল, ‘স্লাভাও ওর দাবার বোড়েগুলো বেচে দিয়েছে।’

অবাক হয়ে গেঙ্কা বলল, ‘সত্যি? সত্যি নাকি রে? হাতির দাঁতেরগুলো নয় তো? কেন বেচলি?’

স্লাভাও এড়িয়ে গেল, ‘বেচতে হল যে।’

এমন সময় তিনবার ঘণ্টা বাজল।

আগ্রিপ্পিনা পিসি বললেন, ‘আরো অতিথি এল!’ দরজা খুলতে গেলেন উনি।

মিখাইল করোভিন ঢুকল শ্রম-আবাসের* স্কুল ইউনিফর্ম আর টুপি পরে। ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। পকেট থেকে এক বাক্স সিগারেট বের করে একটা নিয়ে আগুন ধরাল।

মিশা জিজ্ঞেস করল, ‘কী খবর সব?’

‘খুব ভালো। কাল চতুর্থ মানের পরীক্ষায় পাশ করেছি।’

‘তোর মাইনে এখন কতো?’

‘প্রায় নব্বুই রুবল।’ উদাসীনভাবে জবাব দিল করোভিন। পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করল, এ্যালার্ম ঘড়ির মতো বড়ো। ঘড়িটা কানে চেপে ধরে বলল, ‘ঘড়িওয়ালার কাছে নিয়ে যাবার সময়ই পাচ্ছি না। পরিষ্কার করা দরকার।’

‘দেখি, দেখি!’ ঘড়িটা নিয়ে গেঙ্কা কানের ওপর রাখল, ‘চলেছে তো দিব্যি!’

---

* এই আবাসগুলো গণশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদনে খুলেছিলেন বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিৎ আন্তন মাকারেঙ্কো। মাকারেঙ্কো পরে তাঁর ‘জীবনের পথযাত্রী’ ও ‘বাঁচতে শেখা’ বই দু’খানিতে এর বর্ণনা দিয়েছিলেন।

করোভিন বলল, 'হ্যাঁ, তা চলে। পনেরটা জুয়েল।' ঘড়িটা কোর্তার পকেটে রেখে আবার বলল, 'আমাদের ওখানে একটা কমসমোল দল তৈরি হচ্ছে। আমি এর মধ্যেই একটা দরখাস্ত করে দিয়েছি।'

মাসে নব্বুই রুবল্‌ আর একটা ঘড়ি—ছেলেরা এতটাও হজম করতে পারছিল। কিন্তু শেষ খবরটায় ওরা একেবারে বসে পড়ল। ওরা এখনো পাইওনিয়রই রয়েছে, স্বপ্ন দেখছে কবে কমসমোলে যোগ দেবে, আর এদিকে করোভিন এর মধ্যেই দরখাস্ত দিচ্ছে।

মিশা জানিয়ে দিল, 'আমরাও কমসমোলে যাচ্ছি, সরাসরি পাইওনিয়র দল থেকে।' গেঙ্কা আর স্লাভার দিকে ট্যারা চোখে তাকাল মিশা।

মিশা যেন সত্যি কথাই বলেছে এমনিভাবে গম্ভীর হয়ে আর সবাই চুপ করে রইল।

করোভিন বলল, 'আমাদের ইস্কুলে নতুন ছেলে কে এসেছে জানিস?'

'কে?'

'হাড়কিপ্‌টে বর্‌কা।'

'সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ রে। সেই ছোরার খাপটার জন্য ওর বাবা তো ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল আর কি। ও পালিয়ে এসে এখন আমাদের ওখানেই উঠেছে।'

'ও, তা কেমন আছে ও?'

'মন্দ না। স্বভাবের উন্নতি হচ্ছে।'

আবার ঘণ্টা বাজে। দরজা খুলতে গেলেন আগ্রিপ্পিনা পিসি। ঘরের মাঝখানে গেঙ্কা দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো, চুপচাপ। দরজা খুলতেই জিনা ক্রুগলোভা ঘরে ঢুকল।... ও, ব্যাপার তাহলে এই! মিশা আর স্লাভা অর্থপূর্ণ চোখে এ ওর দিকে চাইল। গেঙ্কা নড়ল না, শুধু হাতটা বাড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলল:

'বসবি না তোরা?'

খিল্‌খিল্‌ করে হাসল জিনা, আর সবাই হেসে উঠল। ফলে গেঙ্কার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। নাটকীয় ভঙ্গিতে ও ঘোষণা করল:

'প্রিয় অতিথিবৃন্দ, আপনাদের অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ, এবার আমি আপনাদের উপহার গ্রহণ করব! দয়া করে ঠেলাঠেলি করবেন না। সার বেঁধে দাঁড়ান!' যতোক্ষণ না দম ফুরিয়ে যায় ততোক্ষণ কেবলি হাসল জিনা। এত মজাদার মেয়ে! ও উপহার দিল একটা সংয়ের পুতুল, সেটার মাথার চুলের গোছা অনেকটা গেঙ্কার মতো দেখতে।

গেঙ্কা বলল, 'চমৎকার! মেয়েদের কাজে কখনো গল্‌তি হয় না। জানি না ছেলেরা এবার কী উপহার দিয়ে আমায় খুশি করবে!'

মিশার যেন হঠাৎ মনে পড়ল, 'ও, হ্যাঁ, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম আর কি!'

স্কুলের ব্যাগ খুলে একটা পুঁট্‌লি বের করল ও। মুখখানা ওর এমন গম্ভীর যে সবাই চুপ করে তাকিয়ে রইল ওর হাতের দিকে। পুঁট্‌লিটা ধীরে ধীরে খুলল ও, বন্ধুরা যে নীরবে প্রতীক্ষা করে রয়েছে সে যেন ওর খেয়ালই নেই।

শুধু যখন শেষ মোড়কটা খুলতে বাকি, পরিষ্কার বোঝা গেল একটা লম্বা মতো জিনিস ভেতরে রয়েছে। মিশা একটু থেমে চারদিক দেখে নিল। অধীরভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ল গেঙ্কা। শেষ মোড়কটা এবার খুলে ফেলতেই একটা স্কেটের ইস্পাত-ফলা চক্‌চক করে উঠল ওর হাতের মধ্যে... নরওয়েজীয়ান রেসের স্কেট্‌!

গেঙ্কা সাবধানে হাতে নিল স্কেট্‌টা। প্রথমে একটি কথাও না বলে ভালো করে দেখল, তারপর হাত বুলোল ফলাটার ধার দিয়ে হাতের নখ ঘষে। কানের পাশে রেখে আঙুলের টোকা মারল। তারপর বলে ওঠল:

'আঃ, দারুণ জিনিস! আরেকটা কোথায়?'

মিশা হাত ছুঁড়ল।

'এইটেই শুধু আছে রে। জোড়া খুঁজে পেলাম না।'

হতাশায় গেঙ্কার মুখ লম্বা হয়ে গেল।

মিশা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঘাবড়াসনি। আপাতত একখানা দিয়েই চালিয়ে দিতে পারবি।'

স্কেটিং-এর ময়দানে একখানা স্কেট পায়ে গেঙ্কা দৌড়চ্ছে কল্পনা করতেও হাসি পায়, তবু গেঙ্কার মুখের ভাবখানা এমন বেদনার্ত হয়ে উঠল যে জিনা পর্যন্ত হাসতে পারল না।

একটা টুলের ওপর উপহারটা রেখে গেঙ্কা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিমর্ষভাবে বলল, 'তোরা কি বসবি না ভাই?'

স্লাভা ওকে বলল, 'থাম্, এক মিনিট। তোর জন্য আমিও একটা উপহার এনেছি।' ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দ্বিতীয় স্কেটখানা বের করল স্লাভা।

গেঙ্কা হৈ হৈ করে উঠল, 'আবার বোকা বানালি!' তারপর চুপ করে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বলল, 'তার মানে স্ট্যাম্পের খাতা, দাবার বোড়ে, চামড়ার জ্যাকেট ...'

'ব্যস্, ব্যস্,' মিশা বাধা দিয়ে বলল, 'এখন ওসব ভুলে যা।'

৬৮

পুশ্কিনো

অবশেষে পেত্রোগ্রাদ থেকে জবাব এল।

'ছোট্ট বন্ধুরা,

'তোমাদের চিঠি পেয়েছি। আমাদের এখানে তো অনেক তেরেন্তিয়েভ আছে, কিন্তু তোমরা যাদের খুঁজছ তারা নেই। আগের যিনি বাড়িউলী ছিলেন — ভাসিলিয়েভা, তাঁর কাছে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। তিনি বললেন তেরেন্তিয়েভ ও তার স্ত্রী যুদ্ধের আগে তাঁর বাড়িতেই থাকতেন, ওদের মা থাকতেন মস্কোর কাছাকাছি কোথাও। এইটুকুই জানতে পেরেছি। আর

গাড়িমাসির কথা যে তোমরা বলেছ, সে সম্পর্কে তো মেজাজ খারাপ করার দরকার নেই। পেত্রোগ্রাদে তেরেন্তিয়েভ নামের লোক আছে হাজার জন, পুরোপুরি বিবরণ না পেলে তাদের ঠিকানা দেওয়া তো অসম্ভব।

'কমসমোল অভিনন্দনসহ

কুপ্রিয়ানভা।'

মিশা বলল, 'এই দ্যাখ্, এবার শেখ কেমন করে বিজ্ঞান আর যন্ত্রের কৌশল কাজে লাগাতে হয়।'

'যন্ত্রের কৌশল আবার এল কোত্থেকে?' গেঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

'দেখতে পাচ্ছিস না? ডাকবিলির কাজটাও তো একটা যন্ত্রের কৌশলই? বুদ্ধিমান যারা তারা এইভাবেই চলে, আর যাদের মাথায় কিছু নেই তারা সব জায়গায় কেবল ছুটে বেড়ায়।'

গেঙ্কা খোঁচা দিয়ে বলল, 'গড়িমসির জবাবটা তোকে বুঝি দমিয়ে দিয়েছে, নারে?'

মিশা উত্তরে বলল, 'আজ্ঞে না। কিন্তু কথা সেটা নয়। রবিবার আমরা পুশ্‌কিনো যাব, সঙ্গে আমাদের স্কিগুলোও নেব।'

'স্কি আবার কী জন্য?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল স্লাভা।

'চোখে ধুলো দেবার জন্য।'

...পরের রবিবার মিশারা ট্রেনে চেপে পুশ্‌কিনো স্টেশনে গিয়ে নামল। প্রত্যেকের সঙ্গে একেকজোড়া স্কি আর ছড়ি।

লড়ঝড়ে রেল-স্টেশন। উঁচু কাঠের প্লাটফর্মের পাশে পাশে অসংখ্য দোকানঘর, ছাদে উঁচু হয়ে বরফ জমেছে। সেগুলোর পেছনে অনেক চওড়া রাস্তা নানাদিকে চলে গেছে। পাশ দিয়ে কালো কালো বেড়া-ঘেরা একেক চিলতে জমির মাঝখানে কাঠের তৈরী কুটির, সঙ্গে কাঁচের বারান্দা। ছোট্ট একেকটা রাস্তা উঠে গেছে প্রত্যেকটা কুটিরের সামনে, গভীর তুষার পায়ের চাপে চাপে

শক্ত হয়ে গেছে। শুধু চোখে দেখলে মনে হয় এ তল্লাটে মানুষের বসবাস নেই। একমাত্র জীবনের আভাস চিম্‌নির ভেতর দিয়ে ওঠা নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

মিশা বলল, 'স্লাভা, তুই আমার সঙ্গে আয়। রাস্তার একটা দিক আমরা ধরছি, আর গেঙ্কা, তুই ধর্‌ ঊদিকটা। আসল কাজ হবে প্রত্যেকটা বাড়ির নামের ফলকের ওপর নজর রাখা।'

স্লাভা মন্তব্য করল, 'ওতে তো গোটা বছর কেটে যাবে। তার চেয়ে এখানকার স্থানীয় সোভিয়েতে খোঁজ নিলেই ভালো হয়।'

মিশা আপত্তি করল, 'না, সে চলবে না। জায়গাটা নেহাৎই ছোট, লোকে সন্দেহ করতে পারে।'

গেঙ্কা তর্ক তুলল, 'কাকে ভয় করি আমরা, শুনি? গুপ্তধন পেলে তখন তো বুড়ি খুব খুশিই হবে।'

মিশা বলল, 'এখনো তাঁকে চোখে দেখলি না অথচ তক্‌কো করছিস। চল্‌ চল্‌।'

সারাদিন ধরে খুঁজল ওরা, কিন্তু তেরেন্তিয়েভার ঘরের হদিস পেল না।

মিশারা স্টেশনে ফিরে এলে স্লাভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এভাবে খুঁজলে কোনো পাত্তাই মিলবে না। অর্ধেক বাড়িরই নামের ফলক নেই। এখানকার সোভিয়েতেই জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে।'

মিশা চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু বললাম তো তা করা যাবে না। স্‌ভিরিদভ কী বলেছিল মনে আছে? এ ব্যাপার নিয়ে হৈ-হল্লা করা চলবে না। সামনের রোববার আবার এসে খোঁজা যাবে।'

স্কি খুলে তুলে নিল ওরা। টিকিটঘরের জানলায় এসে দাঁড়াতেই কে যেন ওদের চেঁচিয়ে ডাকল:

'এই যে, ভাইরা সব!'

ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল—বাজিকর ইয়েলেনা আর ইগর বুশ।

মিষ্টি করে হাসছিল ইয়েলেনা। ছোট্ট ফারের টুপির ফাঁক দিয়ে সোনালি চুল বেরিয়ে এসে কোটের কলারের ওপর পড়েছে। ইগর যেমনটি থাকে তেমনি

গম্ভীর। ওদের হাতে হাত মিলিয়ে ইগর হেঁড়ে গলায় বলল, 'অনেক কাল দেখাসাক্ষাৎ নেই আমাদের।'

ইয়েলেনা জিজ্ঞেস করল, 'স্কি করতে এসেছিলে বুঝি? আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসোনি কেন?'

মিশা জবাব দিল, 'তোমরা যে এখানে থাকো তা তো জানতাম না।'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকি। কাছেই আমাদের নিজের কুঁড়েঘর। আসবে নাকি?'

মিশা বলল, 'এখন তো দেরি হয়ে গেছে। সামনের রোববার আসব।'

গেঙ্কা বলল, 'ঘাবড়িও না, নিশ্চয় আসব।' তারপর রহস্য করে আরো জুড়ে দিল, 'এখানে আমাদের কাজ আছে।'

'কী কাজ?' জিজ্ঞেস করল ইয়েলেনা।

গেঙ্কার দিকে সরোষে তাকিয়ে মিশা বলল, 'না, এমন কিছু নয়...'

ইয়েলেনা আবার বলল, 'বলোই না।'

হঠাৎ গেঙ্কা বলে উঠল, 'আমার পিসিমার খোঁজ করছি।'

অবাক হয়ে গেল ইয়েলেনা।

'তোমার পিসিমা না মস্কোতে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ইনি আরেকজন। আমার কি দুটো পিসিমা থাকতে নেই?'

'তাঁকে তুমি খুঁজে পাওনি বলছ?'

'না, ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।'

'নাম কি?'

ছেলেরা জবাব দিল না।

'নাম কি তাঁর? সেটাও কি হারিয়েছ নাকি?'

'নাম তেরেন্তিয়েভা, সবাই ডাকে মারিয়া গাভ্রিলভনা বলে।' আচমকা বলে বসল মিশা, 'তাঁকে তুমি চেন?'

'তেরেন্তিয়েভা, মারিয়া গাভ্রিলভনা? চিনি বৈকি। আমাদেরই পড়শি। এসো দেখিয়ে দিচ্ছি...'

নিকিৎস্কি

রাস্তায় যেতে যেতে মিশা বলল, 'গেঙ্কার পিসিমাকে কিন্তু বোলো না যে তাঁকে খোঁজা হচ্ছে, মনে থাকবে তো?'

'কেন বলব না?'

'সে এক লম্বা ইতিহাস। উনি জানেন গেঙ্কা মারা গেছে, তাই তাঁকে খবরটার জন্য আগে থাকতে তৈরি করে নিতে হবে। যদি বিনামেঘে বাজ পড়ার মতো হাজির হই তাহলে হয়তো হঠাৎ সহ্য করতে না পেরে খুশির চোটেই মারা যাবেন। ওঁর তো আবার স্বাস্থ্য ভাল নয় ... দেখতেই তো পাচ্ছ তাঁর "ভাইপোটি" কী দরের!'

ইয়েলেনা জবাব দিল, 'ওঁর সঙ্গে আমাদের জানাশোনা প্রায় নেই বললেই হয়। কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না।'

মিশা বলে চলল, 'মোটের ওপর, কাউকে এ কথা জানিও না। তোমার বাবাকেও বোলো না।'

'বাবা মারা গেছেন।' বলল ইয়েলেনা।

মিশা বিব্রত হয়ে বলল, 'শুনে খুব খারাপ লাগছে ভাই। জানতাম না সে খবর।' একটু চুপ করে থেকে মিশা জিজ্ঞেস করল, 'এখন কীভাবে তোমাদের দিন কাটছে?'

'নিজেরাই রোজগার করি। ইগর আর আমি সার্কাসে কাজ করছি।'

ওরা বুশদের বাড়ির কাছে আসে।

পাশের একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে ইয়েলেনা বলল, 'ওই ওঁর বাড়ি।'

উঁচু বেড়ার ওপাশে ওরা শুধু দেখতে পেল ছাদটুকু, কিনারায় বরফের আস্তর পড়েছে ফুটো ফুটো হয়ে।

মিশা জিজ্ঞেস করল, 'এ রাস্তাটার নাম কি?'

ইগর বলল, 'ইয়াম্‌স্কায়া স্লবদা। আমাদের নম্বর আঠারো, তেরেন্তিয়েভার কুড়ি।'

গেঙকাকে ধমকাল মিশা, 'ভারি নজর করে দেখেছিলি তো?'

গেঙকা চোখ সরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'কেমন করে নজর এড়াল বুঝতে পারছি না।'

স্লাভা ফোঁড়ন দিল, 'রাস্তার ওপাশটায় তো স্কি-এর দাগই নেই মোটে।'

রাস্তার দিকে তাকিয়ে গেঙকা আস্তে আস্তে বলল, 'তা হতেই পারে না। গেল কোথায় দাগটা? নিশ্চয় মুছে গেছে! তাই হবে।' ফাঁকা রাস্তাটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখেছিস কতো গাড়িঘোড়া চলে গেছে!'

ইয়েলেনা সাধাসাধি করল, 'একবারটি এসো না ভেতরে। তিনদিন অবিশ্যি বাড়ি ছিলাম না, সত্যি। কিন্তু এক সেকেন্ডে উনোন ধরিয়ে ফেলব, দেখতে দেখতে গরম হয়ে যাবে ঘর।'

ঘরটা ছোটখাটো, চুপচাপ। জানলাগুলোর ওপর পুরু হয়ে বরফ জমেছে। দেয়াল-ঘড়ির এক টানা টিক্‌টিক্‌। বন্ধুরা সবাই ভেতরে ঢুকতেই পাটাতনের তক্তা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করে উঠল। মেঝেটা ভালো করে ধোয়া। তার ওপর রঙিন সরু গালিচা পাতা। একটা বড়ো প্যারাফিন বাতি টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। টেবিলে ফুল নকশা কাটা অয়েলক্লথ ঢাকা। দেয়ালে বড়ো বড়ো ফ্রেমে-আঁটা ছবি, একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি আঁকা। ভদ্রলোকটির প্রকাণ্ড গোঁফ, চুল বেশ পাট করে আঁচড়ানো। পরিষ্কার কামানো থুতনিটা শক্ত মাড় দেওয়া কলারের ওপর এসে পড়েছে। কলারের কোণদুটি ওপরে তোলা। মিশা ভাবল — ঠিক রেভস্কে আমার সেই দাদুর ছবিটার মতো।

ইয়েলেনা একটা পুরনো কোট গায়ে দিয়ে ফেল্টের জুতো পরল আর মাথায় বাঁধল একটা রুমাল। এবার ওকে দেখতে হল একেবারে গাঁয়ের মেয়ের মতো বড়ো বড়ো নীল চোখ আর ছোট্ট টিকলো নাকে।

ইগরকে ডেকে বলল, 'চলো উনুনের চেলাকাঠ নিয়ে আসি।'

ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা আনছি। কোথায় আছে বলে দাও।'

খিড়কির আঙিনায় দল বেঁধে ঢুকল সবাই। ইয়েলেনা চালাঘর খুলে দিল। কাঠ চেলা করতে লেগে গেল মিশা আর গেঙ্কা। স্লাভা আর ইগর কাঠ নিয়ে ঘরে আসতে লাগল। ওরা কাজে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে ইয়েলেনা বালতির আওয়াজ করতে করতে জল আনতে চলল।

গেঙ্কা বেশ মন দিয়েই কাজ করছিল।

কুড়ুলটা দুলিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'সব কাঠ চেলা করে নামিয়ে দেব একবারে, কেন বারবার লকড়ির জন্য মাথা ঘামানো।'

কিন্তু একটা কাঠের গুঁড়ি ও কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিল না।

মিশা পরামর্শ দিল, 'ওটা বাদ দিয়ে আরেকটা ধর না।'

'উঁহু।' গেঙ্কার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘোড়সওয়ারী টুপিটা মাথার পেছনে সরে গেছে। 'যেমন এই গুঁড়িটা, আমারও তো তেমনিই গোঁ।'

দেখতে দেখতে ঘরের দুটো উনোনেই গন্‌গনে আঁচ উঠল। ছোট্ট রান্নাঘরে উনোন ঘিরে বসল সবাই — ইয়েলেনা আর স্লাভা চেয়ারে, বাকি সব মেঝের ওপর।

হাতের বোনার কাজটা শুরু করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল ইয়েলেনা, 'এইভাবেই তো দিন কাটাচ্ছি। শুধু ছুটির দিনেই এখানে আসি যখন আমাদের খেলা থাকে না।'

ইগর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আমাদের মস্কোতেই যেতে হবে।'

ইয়েলেনা আপত্তি করল, 'এখান থেকে চলে যেতে মন চায় না। মা বাবা থাকতেন এ বাড়িতেই।'

নলের ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে আগুনের শিখা উঠল, মেঝেতে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল।

ইয়েলেনা বলল, 'এ হপ্তাটা পুরো এখানে থাকব। আমাদের কাছে আসবে কিন্তু।

মিশা বলল, 'জানি না হয়ে উঠবে কিনা। এ হপ্তায় আমাদের বড়ো ব্যস্ত থাকতে

হবে। কাল পাইওনিয়র দলের মিটিং আছে, কমসমোলে আমাদের ঢোকানো যাবে কিনা তাই নিয়ে। যদি ওরা আমাদের সুপারিশ দেওয়া ঠিক করে, তাহলে আবার কমসমোল দলের ব্যুরোতে যেতে হবে। তারপর কমসমোল দলের সভায়, তারপর কমসমোলের জেলা কমিটিতে।'

ইয়েলেনা অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা এখনই কমসমোল সভ্য হতে যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ।' একটু চুপ করে থেকে মিশা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমাদের চিলেকোঠা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখান থেকে তেরেন্তিয়েভার বাড়ির উঠোন দেখা যায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলো তো?'

'একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল।'

'এসো তাহলে, দেখিয়ে দিই।'

ঠান্ডা বারান্দার মধ্যে ঢুকল মিশা আর ইয়েলেনা। চিলেকোঠার খাড়া সিঁড়িটা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

ইয়েলেনা হাত বাড়িয়ে দিল, 'তোমার হাতটা দাও, নাহলে হঠাৎ পড়ে যাবে।'

চিলের ছাদের ঘুলঘুলির কাছে গেল ওরা।

সামনে গোটা পল্লীর চেহারাটা দেখা যাচ্ছে — রাস্তা দিয়ে ভাগ-ভাগ করা। পেছনে কালো জঙ্গল, তার মাঝখান দিয়ে দূরে রেললাইন চলে গেছে।

মিশার পাশে দাঁড়িয়ে ইয়েলেনা। চাঁদের আলোয় ওর মুখটা ঢলঢল করছে। শুধু সরু ভুরুজোড়া আর চোখের বাঁকা পাতাগুলোকে দেখাচ্ছে যেন আরো কালো। মিশার হাত ধরে আছে ও। দু'জনেই চুপচাপ ...

তেরেন্তিয়েভ্‌দের খিড়কির আঙিনার দিকে তাকাল মিশা। প্রকাণ্ড আঙিনা, জনমনিষ্যি নেই। বেড়ার কাছে কতোগুলো কাঠের গুঁড়ি আর চালাঘর।

কোথায় যেন একটা ইঞ্জিনের সিটি বেজে উঠেই আচমকা থেমে গেল।

মিশা আঙিনাটার দিকে তাকিয়ে আছে এমন সময় হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। কাঁধের ওপর খাটো ফারের কোর্তা চড়িয়ে একটি ঢ্যাঙা লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। মিশার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। তারপর সিগারেটের টুকরোটা বরফের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। গায়ের জোরে মিশা চেপে ধরল ইয়েলেনার হাত।

লোকটা নিকিৎস্কি!

৭০

বাবার কথা

বন্ধুরা সেদিন অনেক রাত করে মস্কো ফিরল। মিশা যখন বাড়ি পৌঁছল তখন মাঝরাত্রি।

মা টেবিলের ধারে বসে বই পড়ছিল। মিশা ঢুকতেই মা ওর দিকে ফিরে নীরব তিরস্কার জানিয়ে মাথা নাড়ল।

মিশা তাড়াতাড়ি বলল, 'বুঝেছ মা, পুশ্‌কিনোতে দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাই এত দেরি। রাতের খাওয়া ওখানেই সেরে

এসেছি। তুমি ভেবো না।' মার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে বলল, 'কী বই পড়ছ? ও! "আন্না কারেনিনা"।'

ওর গলার স্বরে একটা উদাসীনতার আভাস পেল মা।

বলল, 'তোর এ বই পছন্দ হয় না?'

'তেমন নয়। ওর চেয়ে "যুদ্ধ ও শান্তি" বেশি ভালো লাগে আমার।' বিছানায় বসে মিশা জামা জুতো খুলতে লাগল।

'কেন রে?'

'কেন?' এক মুহূর্ত কী ভাবল মিশা, তারপর বলল, '"যুদ্ধ ও শান্তির" নায়করা প্রত্যেকেই গম্ভীর প্রকৃতির: বলকোন্‌স্কি, বেজুখভ্‌, রস্তোভ ... কিন্তু এখানে তুমি বুঝেই উঠতে পারবে না ওরা কী চরিত্রের মানুষ। স্তিভা লোকটি তো কুঁড়ে। চল্লিশ বছর বয়েস, এদিকে সব সময় খোকামি!'

. মা প্রতিবাদ করল, 'সব নায়ক তো আর অত গায়ে ফুঁ লাগানো নয়। যেমন লেভিনের কথাই ধর্‌ না।'

'হ্যাঁ, লেভিন অবিশ্যি ওদের তুলনায় একটু বেশি গম্ভীর। কিন্তু সেও তো আবার নিজের খামারটি ছাড়া আর কিছুর ধারই ধারে না।'

মা আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা কথা বেছে বেছে বলতে থাকল, 'তোর বোঝা উচিত যে এই লোকগুলোর মধ্যে তাদের নিজেদের যুগের, নিজেদের সমাজেরই খাঁটি চরিত্রটি ফুটে উঠেছে ...'

'সে সবই আমি বুঝি।' মিশা ততোক্ষণে কম্বলের তলায় ঢুকে মাথার নিচে হাতদুটো ভাঁজ করে রেখেছে। 'ওসব খানদানী সমাজের ব্যাপার। "যুদ্ধ ও শান্তির" মধ্যেও সেই উঁচুতলার সমাজই দেখানো হয়েছে। কিন্তু তফাতটা দেখো। সেখানে লোকগুলোর জীবনে লক্ষ্য আছে, উচ্চাকাংক্ষা আছে, সমাজের প্রতি কর্তব্যের বোধ আছে তাদের, কিন্তু তোমার ওই বইটাতে কিছুতে বুঝেই উঠতে পারবে না ওরা কেন বেঁচে আছে, যেমন ধরো না ভ্রোন্‌স্কি আর স্তিভার কথাই। তুমিই বলো: প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে কিছু লক্ষ্য থাকা উচিত না কি?'

মা বলল, 'স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমার মনে হয় "আন্না কারেনিনার" প্রত্যেকটি নায়কনায়িকারই জীবনের লক্ষ্য আছে। তাদের লক্ষ্যগুলো হয়তো নিছক ব্যক্তিগত, সত্যি কথা: যেমন ধরো — ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিংবা যাকে একজন ভালোবাসে তারই সঙ্গে জীবন কাটাতে চাওয়া। লক্ষ্যগুলো ছোটখাটো হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য তো বটেই।'

মিশা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হল।

'একে কি তুমি লক্ষ্য বলো মা? সেভাবে বিচার করলে তো প্রত্যেকটি লোকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য আছে। একটা মাতালেরও তাহলে লক্ষ্য আছে: রোজ মদ খেয়ে মাতলামি করা। বুর্জোয়াদের লক্ষ্য হল টাকা জমানো। কিন্তু সে ধরনের লক্ষ্যের কথা তো আমি বলছি না।'

'তাহলে কী ধরনের লক্ষ্যের কথা বলছিস?'

'কেমন করে বোঝাই। মানে, একজনের লক্ষ্য হওয়া উচিত খুব উঁচু, বুঝলে না? মহৎ।'

'কিন্তু কি বোঝাতে চাচ্ছিস তা তো বললি না তুই।'

'আচ্ছা, ধরো সেদিন যেমন স্লাভার বাবার সঙ্গে আমার কথা হল। উনি নিজেই বললেন একটা কথা। আগের দিনে উনি শুধু টাকা রোজগারের জন্যই কাজ করতেন। যেখানে লোকে তাঁকে সবচেয়ে বেশি পয়সা দেবে সেখানেই ছুটতেন। তার মানে কোনো উঁচু লক্ষ্য তাঁর ছিল না। আর এখন উনি যদি সারাদিন মেহনত করে কারখানাটাকে আবার চালু করতে চান আর তার ফলে আমাদের দেশের পণ্য বেড়ে যায় তাহলে সেটাকে বলতে হবে এক মহান্ লক্ষ্য। হয়তো আমার উদাহরণটা খুব যুৎসই হল না। কিন্তু জিনিসটা আমি এভাবেই বুঝি।'

'ওঁকে কি করে দোষ দেবে বলো? তুমি তো ভালো করেই জানো যে এমন একটা লক্ষ্য ঠিক করা ওঁর পক্ষে আগে সম্ভবই হত না। তখন উনি কাজ করতেন বণিক মালিকের জন্য, তাই নিজের মাইনেটা ছাড়া আর কিছুতে ওঁর আগ্রহই ছিল না।'

মিশা ওর স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, 'ও'র পক্ষে সেটা করা উচিত হয়নি। বাবা তো মালিক পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করতেন না।'

'কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়।' মা মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার বাপকেও ওদের জন্যেই কাজ করতে হত।'

'কিন্তু সে তো একেবারে আলাদা রকম। উনি কাজ করতেন শুধু রোজগারের আশায়। কিন্তু সেটাই তাঁর জীবনের একমাত্র জিনিস ছিল না। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। বিপ্লবের জন্যই জীবন দিয়েছেন। তার মানে বাবার জীবনের লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে মহৎ।'

দু'জনেই চুপ করল।

মিশা বলল, 'জানো মা, বাবার চরিত্র আমি বেশ কল্পনা করতে পারি। আমার মনে হয় উনি কক্ষনো কোনোকিছুকে ভয় করতেন না।'

'হ্যাঁ, তাই বটে।' মা জবাব দিল, 'দারুণ সাহসী মানুষ ছিলেন।'

মিশা বলেই চলল, 'তাছাড়া, আমার মনে হয় উনি নিজের কথা, নিজের সুখসুবিধার কথা কখনো ভাবতেন না। সবকিছুর উপরে স্থান দিতেন পার্টির স্বার্থকে।'

মা জবাব দিল না। মিশা জানত বাবার কথা মনে পড়লেই মার খুব মন খারাপ হয়ে যায়, তাই ও আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না।

মা বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল, কিন্তু মিশা অনেকক্ষণ চোখ চেয়ে জেগে রইল। ঘরের ভেতর চাঁদের আলো এসে পড়েছে, তাই দেখে।

মার সঙ্গে কথাবার্তায় ওর মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। এই প্রথম বোধহয় জীবনের লক্ষ্য নিয়ে এত আলোচনার পর ওর পরিষ্কার মনে হচ্ছে যে শৈশব ওর পার হয়ে গেছে, জীবনের পাকা সড়কে ও এখন যাত্রা শুরু করল।

ভবিষ্যতের কথা ভাবে মিশা। বিপ্লবের মহান্ আদর্শের জন্য ওর নিজের বাপ আর ওর বাপের মতো অন্য মানুষরা যাঁরা প্রাণ দিয়ে গেছেন তাঁদের মতো করেই বাঁচতে চায় ও, অন্য কোনোভাবে নয় ...

গেঙ্কার গলতি

পুশকিনো অভিযানের পরের দিন সকালে কমরেড সুভিরিদভকে মিশা জানাল যে ও নিকিৎস্কিকে দেখেছে। সুভিরিদভ ওদের সবুর করতে বললেন, হুকুম দিলেন পুশকিনোতে ওরা যেন আর না যায় এখন।

এর মধ্যে মিশা অন্য একটা ব্যাপারে মেতে উঠেছিল। দলের পরিষদ ঠিক করেছে পাইওনিয়রদের কয়েকজনকে কমসমোলে যেতে দেবার সুপারিশ করবে, সে কজনের মধ্যে আছে মিশা, গেঙ্কা, স্লাভা, শুরা অগুরেয়েভ আর জিনা ক্রুগলোভা। ওদের নিজেদের কমসমোল দলের সভা ইতিমধ্যেই ওদের দলে নিয়েছে। ওরা এখন তৈরি হচ্ছে জেলা কমসমোল কমিটির প্রবেশিকা কমিশনের সামনে দাঁড়াবার জন্য।

মিশা দারুণ চিন্তায় পড়েছে। ও যে শীগগিরই কমসমোল সদস্য হবে তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। ওর এতদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে এও কি সম্ভব? কমসমোল সদস্যরা যখন জেলা কমিটির বারান্দায় আর কামরায় এসে ভিড় জমায়, ও একটা চাপা ঈর্ষা নিয়ে দেখে ওদের। কী ফুর্তি আর আত্মবিশ্বাস ছেলেগুলোর! প্রবেশিকা কমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা জানলে মন্দ হত না। খুব সম্ভব ওরাও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু ওদের কাছে এখন সেসব তো অতীতের কথা। আর মিশা পোস্টার-সাঁটা একটা বড়ো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের পালা কখন আসবে সেই অপেক্ষায় রয়েছে। এই দরজাটারই ওপাশে কমিশনের কাজ চলছে, ওর ভাগ্যও শীগগিরই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

গেঙ্কার প্রথম ডাক পড়ে।

কামরা থেকে বেরিয়ে আসার পর বন্ধুরা ওকে ছেঁকে ধরল, 'কী হল?'

'সব ঠিক হ্যায়।' গেঙ্কা তার টুপি বেপরোয়া ভঙ্গিতে একপাশে সরিয়ে বলল, 'সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।'

ওকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে আর ও যা উত্তর দিয়েছে সবই বলল। একটা প্রশ্ন ছিল: স্কুলের ছেলেদের জন্য শিক্ষানবিসীর সময় কতোদিনের।

গেঙ্কা বলল, 'আমি বলেছি ছ'মাস।'

মিশা প্রতিবাদ করল, 'ওটা তো ভুল উত্তর হল। এক বছর হবে।'

গেঙ্কা তবু বলল, 'না, ছ'মাস। আমি তাই বললাম আর সভাপতিও বললেন ঠিক আছে।'

মিশা ধাঁধায় পড়ে গেল, 'কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমি তো নিয়মকানুনগুলো নিজে পড়েছি।'

মিশার পালা এল। বড়ো ঘরটার মধ্যে ঢুকল ও। টেবিলগুলোর একটাতে কমিশনের পরামর্শ চলেছে। একধারে বসে আছে কোলিয়া সেভাস্তিয়ানভ। মিশা জড়োসড়ো হয়ে বসে, উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্নের অপেক্ষা করতে লাগল।

রুশ কামিজ আর চামড়ার জ্যাকেট পরা কটা চুলওয়ালা একটি তরুণ হল সভাপতি। মিশার দরখাস্তটা সে চট্‌পট্‌ পড়ে নিতে নিতে প্রত্যেকটা কথার শেষে একটা করে 'ও, বুঝলাম' জুড়ে দিতে লাগল। 'পলিয়াকোভ — ও, বুঝলাম। মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ — ও, বুঝলাম। ছাত্র — ও, বুঝলাম।'

কোলিয়া সেভস্তিয়ানভ হেসে বলল, 'এ আমাদেরই একজন সক্রিয় সভ্য: উপদলের নেতা, স্কুল পরিষদের সদস্য।'

সভাপতি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'নিজের লোকের গুণ গাইবেন না। আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে নিচ্ছি।'

প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিল মিশা। শেষ প্রশ্নটা শিক্ষানবিসীর সময় সংক্রান্ত। মিশা জানত সেটা এক বছর, কিন্তু গেংকা যে ...

'ছ' মাস,' ইতস্তত করে ও বলে বসল।

'ভুল,' সভাপতি বলল, 'এক বছর। তুমি এবার যেতে পারো।'

কমিশনের কাছে সকলের ডাক পড়ার পর ছেলেরা তাড়াতাড়ি ছুটল স্‌ভিরিদভের সঙ্গে দেখা করতে। উনি বলেছিলেন দশটার সময় ওঁর ওখানে যাবার জন্য। রাস্তায় মিশা আর স্লাভা গেংকাকে খুব এক হাত নিল। স্লাভাও ভুল উত্তর দিয়েছিল।

মিশা বলল, 'আবার নতুন করে শুরু করতে হবে সব। আমরা ছাড়া আর সবাইকেই ওরা নেবে। গোটা ইস্কুলের কলঙ্ক হলাম আমরা!'

স্লাভা মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল, 'কিন্তু স্কেটিং-এর মাঠে তো ওর জুড়ি নেই! সারাদিন সেখানেই কাটায়, খবরের কাগজগুলো উল্‌টেও দেখে না পর্যন্ত।'

যা ঘটেছে তাতেই গেঙ্কা ভয়ানক দমে গেছে, তাই জবাব দিল না। ট্রামগাড়ির পুরু বরফ ঢাকা জানলার ওপর ভোঁস্ ভোঁস্ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু ওর নীরবতায় কোনো কাজ হল না। বন্ধুরা সমানে বকাবকি করে চলেছে, আর সবচেয়ে যেটা ওর মর্মে আঘাত দিচ্ছে তা হল বন্ধুরা কেউ ওর সঙ্গে সরাসরি কথা না বলে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করছে ওর নামটা।

মিশা খোঁচা দিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে, ব্যস্। আমাদের দমাবে এমন সাধ্যি কার! কারুর তোয়াক্কা করি নাকি, সব আমরা করতে পারি!'

স্লাভা জুড়ে দিল এই সঙ্গে, 'আরে, আমরা তো কড়ে আঙুল নাচিয়েই জিতে যাব রে!'

মিশা তাতেও খুশি না হয়ে বলতে থাকল, 'উনি আবার সব সময় গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখেন। গুপ্তধন, গুপ্তধন! চেহারাটা দ্যাখ্ না একবার গুপ্তধন-সন্ধানীর!'

স্লাভা একটু সদয়ভাবে বলল এবার, 'ও যে কোটিপতি হতে চায়।' দমে যাওয়া বন্ধুটির জন্য এবার ওর একটু দুঃখ হচ্ছে।

একটা বড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। নিচের তলায় কমরেড স্ভিরিদভের সঙ্গে ২০৩ নম্বর কামরায় দেখা করার অনুমতিপত্র ওদের দেওয়া হল।

ছেলেরা আপিসঘরে ঢুকতেই উনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'দেরি করলে কেন?'

'কমসমোল জেলা কমিটিতে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। প্রবেশিকা কমিশন ছিল কিনা তাই।' জবাব দিল মিশা।

স্ভিরিদভ ভুরু তুললেন, 'তাই নাকি? তাহলে আমার অভিনন্দন নাও।'

নিরাশভাবে নিঃশ্বাস ছাড়ল ওরা।

'কী ব্যাপার?' ওদের খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলেন স্ভিরিদভ, 'কিছু গোলমাল হল নাকি?'

‘আমরা ফেল হয়ে গেছি।’ চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দিল মিশা।

‘ফেল? কেমন করে?’ স্ভিরিদভ অবাক হয়ে বললেন।

‘শিক্ষানবিসীর প্রশ্নটাতে।’

গেঙ্কা হাঁড়িমুখ করে বলল, ‘দোষ আমারই।’

‘অন্যসব প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছ তো?’

‘তা বোধহয় দিয়েছি।’

স্ভিরিদভ হেসে বললেন, ‘মুখ তোলো হে! একটা ভুল উত্তরের জন্য ওরা তোমাদের বাতিল করে দেবে না। যারা কমসমোল সভ্য হতে চায়, হবার যোগ্যতা আছে, তারা নিশ্চয়ই হবে। আমার কথা শোনো, ঘাবড়িও না। এবার এসো তো কাজের কথায়। মন দিয়ে শোনো। নিকিৎস্কি বলছে তার নাম সের্গেই ইভানভিচ নিকোল্স্কি। তাছাড়া সে কয়েকজন সাক্ষীরও নাম দিয়েছে, ফিলিন আছে তাদের মধ্যে,’ স্ভিরিদভ হাসলেন, ‘ছোরার খাপটা হারাবার পর অবশ্য সবাই মিলে ঝগড়া করেছে। ফিলিন দোষ দিচ্ছে স্ট্যাম্পওয়ালার, স্ট্যাম্পওয়ালা দোষ দিচ্ছে ফিলিনের। হ্যাঁ, আরেকটা কথা,’ ছেলেদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, ‘সেই বাক্সগুলো ওরা সময়মতো সরিয়ে নিয়েছে তলাকুঠরি থেকে। নিশ্চয়ই কেউ ওদের ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল।’

বন্ধুরা মুখ লাল করে মেঝের দিকে তাকাল।

মুখে প্রায় দুর্লক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে স্ভিরিদভ আবার বললেন, ‘হ্যাঁ, কেউ ওদের ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে তোমরা যাতে নিকিৎস্কির সামনাসামনি হাজির হতে পারো তার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা যা জানো সব বলবে। সমস্ত প্রশ্নের সত্যি জবাব দেবে। কিছু বানিয়ে বলবে না। এবার পাশের ঘরে যাও, অপেক্ষা করো গে। যখন দরকার হবে ডেকে পাঠাব। আরেকটা কথা,’ দেরাজ থেকে ছোরাটা বের করে মিশার হাতে দিয়ে বললেন, ‘আমি যখন জিজ্ঞেস করব তেরেন্তিয়েভকে নিকিৎস্কি কেন খুন করেছিল তখন এই ছোরাটা বের করে দেখাবে।’

৭২

নিকিৎস্কির মুখোমুখি

প্রথম ডাকা হল স্লাভাকে, তারপর গেঙ্কা আর একেবারে শেষে মিশা।

মিশা যখন ঘরের ভেতর এল, স্ভিরিদভ ছাড়াও তখন আরেকটি লোক সেখানে ছিল। মধ্য বয়েসী মানুষ, জাহাজী উর্দি পরনে, টেবিলের ধারে বসে আছে মুখে পাইপ নিয়ে। দেওয়ালের কাছে গম্ভীর হয়ে হাঁটুর ওপর টুপি রেখে বসে ছিল গেঙ্কা আর স্লাভা।

দরজার ধারেই রাইফেল হাতে একজন সান্ত্রী। নিকিৎস্কি কামরার মাঝখানে স্ভিরিদভের সামনাসামনি একটা চেয়ারে বসেছে। পরনে তার অফিসারের জ্যাকেট, নীল ঘোড়সওয়ারী ব্রিচেস্, উঁচু বুট। পায়ের ওপর পা রেখে বসে আছে, একান্ত নির্বিকার ভঙ্গি। কালো চুল বেশ পরিপাটি করে পেছনের দিকে আঁচড়ানো।

ঘরের ভেতর ঝলমলে রোদের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল।

মিশা ঢুকতেই নিকিৎস্কি চট্ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে একবার দেখে নিল। কিন্তু এ তো আর রেভস্ক নয়, রেলগার্ডের সেই কুঠিও নয়। মিশাও নিকিৎস্কির দিকে চোখ ফিরিয়ে সোজা চেয়ে রইল। ওর মনে পড়ে গেল পলেভোয়ের কথা, মার খাওয়া রক্ত মাখা চেহারা, সেই ভাঙা রেল লাইন, সবুজ মাঠের মধ্যে সওয়ারহীন ঘোড়াগুলো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে সেই দৃশ্য।

নিকিৎস্কিকে দেখিয়ে স্ভিরিদভ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটিকে চেনো?'

'হ্যাঁ।'

'কে এ?'

'ভালেরি সিগিজ্মুন্দোভিচ নিকিৎস্কি।' নিকিৎস্কির দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল মিশা।

নিকিৎস্কি নড়ল না।

স্ভিরিদভ বললেন, 'কেমন করে একে জানলে সব খুলে বলো তো।'

মিশা রেভস্ক আক্রমণ, ফৌজী ট্রেনের ওপর হামলা চালানো আর ফিলিনের গুদামঘরের বর্ণনা দিল।

স্ভিরিদভ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য শ্রীনিকিৎস্কি?'

নিকিৎস্কি শান্তভাবে উত্তর দিল, 'সে তো আগেই বলেছি আমি, এই বাচ্চা খোকাটির কল্পনার চেয়ে আরো অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমি আপনার হাতে দিয়েছি।'

'আপনি কি এখনো বলতে চান আপনার নাম সের্গেই ইভানভিচ নিকোল্স্কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর বলছেন আপনি মারিয়া গাভ্রিলভ্না তেরেন্তিয়েভার বাড়িতে থাকতেন এই সূত্রে যে আপনি তাঁর ছেলে ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভের অধীনে চাকরি করতেন?'

'হ্যাঁ। উনিও একথা সমর্থন করবেন।'

'আপনি কি এখনো বলছেন ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভ "সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজডুবির আগে বিস্ফোরণের ফলে মারা যান?'

'হ্যাঁ, সকলেই তা জানে। আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম। তারপর একটা লঞ্চ্ এসে আমাকে তুলে নেয়।'

'তাহলে আপনি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এবার পলিয়াকোভ, তুমি বলো তো, তেরেন্তিয়েভকে কে গুলি করেছিল, তুমি জানো?' কথাগুলো ধীরে ধীরে বলবার সময় স্ভিরিদভ ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন নিকিৎস্কিকে।

'ইনিই গুলি করেছিলেন,' নিকিৎস্কিকে দেখিয়ে মিশা দৃঢ়ভাবে জবাব

দিল। নিকিৎস্কি তবু স্থির হয়ে বসে রইল। 'পলেভোয় আমাকে বলেছেন, তিনি সবকিছু নিজের চোখে দেখেছিলেন।'

স্ভিরিদভ নিকিৎস্কিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?'

নিকিৎস্কি ক্ষীণভাবে একটু হাসল।

'এর চেয়ে আজগুবি কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। এত কিছুর পরও কি তাহলে ওঁরই মায়ের বাড়িতে এসে থাকতাম? এসব উদ্ভট জিনিস যদি আপনি বিশ্বাস করেন সে... আপনার নিজস্ব ব্যাপার।'

'পলিয়াকোভ, তুমি কোনো প্রমাণ দিতে পারো?'

মিশা পকেট থেকে ছোরাটা বের করে স্ভিরিদভের সামনে রাখল। নিকিৎস্কি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছোরাটার দিকে।

খাপ থেকে ফলাটা টেনে বের করে স্ভিরিদভ হাতল ঘোরালেন। ধাতুর মোড়ানো পাতটা বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে আবার ছোরাখানা বন্ধ করে রাখলেন উনি। নিকিৎস্কি ওঁর হাতের প্রত্যেকটা ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল।

'আচ্ছা, শ্রীনিকিৎস্কি, এ জিনিসটার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?'

চেয়ারের পিঠের ওপর শরীরের ভার ছেড়ে দিল নিকিৎস্কি।

'এ আমি আগে কখনো দেখিইনি।'

'একগুঁয়েমি করে আপনার কোনো লাভ হবে না।' শান্তভাবে স্ভিরিদভ বললেন। কতগুলো কাগজের নিচে ছোরাখানা রাখলেন উনি। 'হ্যাঁ, এবার তাহলে সাক্ষী মারিয়া গাভ্রিলভ্না তেরেন্তিয়েভাকে নিয়ে এসো।' সান্ত্রীকে হুকুম দিলেন।

দীর্ঘকায়া এক বৃদ্ধা মহিলা এলেন। গায়ে তাঁর কালো কোট, মাথার পাকা চুলের ক'গাছি বেরিয়ে এসেছে কালো শালের তলা দিয়ে।

স্ভিরিদভ একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'আপনি দয়া করে বসুন।'

মহিলাটি বসে ক্লান্তভাবে চোখ বুজলেন।

স্ভিরিদভ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা শ্রীযুক্তা তেরেন্তিয়েভা, এই

ভদ্রলোকটির নাম বলবেন দয়া করে?'

চোখ না তুলে শান্তভাবে বললেন তেরেন্তিয়েভা, 'সের্গেই ইভানভিচ নিকোল্‌স্কি।'

'কোথায়, কখন আর কি অবস্থায় আপনার সঙ্গে এ'র পরিচয় হয়েছে?'

'যুদ্ধের সময় ও আমার ছেলের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল।'

'আপনার ছেলের নাম?'

'ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ।'

'তিনি কোথায়?'

'সে মারা গেছে।'

'কবে?'

'উনিশ শ' ষোলো সালের সাতই অক্টোবরে যখন "সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজে বিস্ফোরণ হয়।'

'উনি যে বিস্ফোরণেই মারা যান সে সম্পর্কে আপনি নিঃসন্দেহ?'

'নিশ্চয়।' চোখ তুলে স্‌ভিরিদভের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললেন উনি, 'নিশ্চয়। আমাকে সরকারী নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যে।'

'তাঁর জিনিসপত্র আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল?'

'না। কেমন করে পাঠাবে? কেউ তো বাঁচাতে পারেনি কিছু!'

'তার মানে আপনার ছেলের সমস্ত জিনিসপত্র খোয়া গেছে?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আপনি একটু টেবিলের কাছে আসবেন?'

তেরেন্তিয়েভা ক্লান্তদেহে উঠে ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন।

কাগজের তলা থেকে ছোরাটা বের করে স্‌ভিরিদভ ভদ্রমহিলার সামনে উঁচু করে ধরলেন।

'চিনতে পারেন এই ছোরাখানা?' তীক্ষ্ণগলায় প্রশ্ন করলেন উনি।

ছোরাটা খঁুটিয়ে লক্ষ্য করে তেরেন্তিয়েভা বললেন, 'হ্যাঁ... হ্যাঁ...' নিকিৎস্কির দিকে বিমূঢ় চোখে তাকালেন। কিন্তু সে নড়াচড়া করল না। 'হ্যাঁ, এটা তো আমাদেরই ... এটা তো ... ওরই ছোরা ... ভ্লাদিমিরের, হ্যাঁ।'

'আপনার ছেলের সমস্ত জিনিসপত্র হারিয়ে গেছে আর এই ছোরাটাই শুধু রয়ে গেল, আপনার অবাক লাগছে না ভাবতে?'

তেরেন্তিয়েভা জবাব দিলেন না। টেবিলের কিনারায় ওঁর আঙুলগুলো কেঁপে উঠল।

স্ভিরিদভ বললেন, 'আপনার তাহলে কিছু বলবার নেই। আচ্ছা, তাহলে বলুন, শেষবারের মতো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কথাটা — এই লোকটি কে?' নিকিৎস্কিকে দেখিয়ে বললেন উনি।

'নিকোল্স্কি।' ভদ্রমহিলার গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই গেল না।

স্ভিরিদভ উঠলেন।

বললেন, 'বেশ, তাহলে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে এই লোকটি,' নিকিৎস্কির দিকে হাত তুলে দেখালেন স্ভিরিদভ আর তেরেন্তিয়েভা বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন সেই দিকে, 'এই লোকটিই আপনার ছেলের হত্যাকারী।'

তেরেন্তিয়েভার শরীর দুলে উঠল। কাঁপা আঙুলে টেবিলের কিনারা চেপে ধরলেন।

'কী ...' বুজে আসা গলায় ফিস্ফিসিয়ে বললেন, 'কী বললেন আপনি?...'

ওঁর দিকে না তাকিয়ে স্ভিরিদভ শুকনো সাদামাটা গলায় পড়ে শোনাতে লাগলেন:

'উনিশ শ' ষোলো সালের সাতই অক্টোবর লেফটেন্যান্ট নিকিৎস্কি দ্বিতীয় র‍্যাঙ্কের ক্যাপ্টেন ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভকে গুলি করে হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্য ছিল ছোরাটা চুরি করা।'

ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সান্ত্রী এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিল। কার্পেটের

ওপর আস্তে করে তার রাইফেলের গোড়াটা ঠেকল। নিকিৎস্কি নিশ্চল হয়ে বসে আছে, তার চোখ বুটজুতোর ডগায়। নিকিৎস্কির দিকে তাকিয়ে তেরেন্তিয়েভা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরেছে ওঁর লম্বা শুকনো আঙুলগুলো।

ফিস্‌ফিস করে বললেন উনি, 'ভালেরি ... ভালেরি ...' তারপর ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম করতেই স্‌ভিরিদভ আর জাহাজী উর্দি-পরা সেই লোকটি লাফিয়ে এগিয়ে এলেন ওঁকে ধরতে।

৭০

তেরেন্তিয়েভ পরিবার

ইয়ারস্লাভ্‌ল সড়ক ধরে একটা বড়ো গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়িতে আছেন স্‌ভিরিদভ, সঙ্গে সেই নাবিক, তেরেন্তিয়েভা আর আমাদের বন্ধুরা।

মস্কোর শহরতলীর ছোট ছোট বাড়িগুলো সাঁ সাঁ করে পেছনে চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে এসে পড়ল এবার পাইনের বন। ধূসর গলা বরফে-ঢাকা খেত-জমি আর অসংখ্য গ্রাম।

মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না বলছিলেন, 'ছোরাটা একসময় ছিল পলিকার্প্‌ তেরেন্তিয়েভের সম্পত্তি, দেড়শ' বছর আগেকার এক বিখ্যাত বন্দুক-মিস্ত্রি ছিলেন তিনি। পূব দেশে তাঁর এক অভিযানের সময় নাকি তিনি এটা পেয়েছিলেন।'

মিশা কনুই দিয়ে খোঁচাল বন্ধুদের। ইশারা করে একটা আঙুল তুলল।

মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না বলেই চলেছেন, 'সম্রাজ্ঞী এলিজাভেতা পেত্রোভ্‌নার আমলে পলিকার্প্‌ তেরেন্তিয়েভ তাঁর জমিদারীতে ফিরে গিয়ে নিজের বাড়িতে একটা গোপন লুকোনোর জায়গা তৈরি করেন। সে সময় দিনকাল যেমন খারাপ

যাচ্ছিল তাতে সেটা না করে উপায় ছিল না। বোধহয় নানা ধরনের যন্ত্রের দিকে ঝোঁক আছে বলে কয়েকটা জিনিস রয়ে গেছে: বিশেষভাবে তৈরি গোপন টিপকল-লাগানো একটা বাক্স, নানা তোলা-যন্ত্র, এমন কি নিজের ডিজাইন অনুযায়ী তৈরি একটা ঘড়িও। তাঁর সবচেয়ে বড়ো শখ ছিল গভীর সমুদ্রে ডুবুরির কাজ।

'কিন্তু ডুবুরির সাজসরঞ্জাম আর ডুবে যাওয়া কয়েকখানা জাহাজ সমুদ্রের তলা থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যে সব নকশা আর পরিকল্পনা করেন সেগুলো সবই সে-যুগের তুলনায় অতি উদ্ভট। তাহলেও, ডুবুরির আর জাহাজ উদ্ধারের কাজ আমাদের পরিবারের একটা বিশেষ ঐতিহ্যের মতো। পলিকার্প তেরেন্তিয়েভের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁর ছেলে ও নাতি এবং আমার ছেলে ভ্লাদিমির। ওদের মধ্যে অনেকে দূর দূর দেশে অভিযান চালিয়েছেন। ভ্লাদিমিরের দাদামশাই কয়েক বছর সিংহলেও ছিলেন একটা জাহাজ উদ্ধারের কাজে। আর ভ্লাদিমিরের বাবা 'প্রিন্স' জাহাজ সম্পর্কে অনেকগুলো খবরাখবরও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু এসব কাজই ছিল রহস্যে ঢাকা। এই রহস্যও পরিবারের ঐতিহ্য হয়ে ছিল।'

'মজার ব্যাপার তো!' স্‌ভিরিদভ বললেন।

মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না বলে চললেন, 'গুপ্ত স্থানটার একটা ব্যাপার ছিল এই যে পরিবারের মধ্যে একজনই শুধু সেটার সম্পর্কে খবর রাখতে পারতেন — পরিবারের যিনি কর্তা, তিনি। সেই গোপন রহস্যের চাবিকাঠিই বুড়ো এই ছোরাটার ভেতর রেখেছিলেন। তেরেন্তিয়েভ পরিবারের শেষ বংশধর আমার এই ছেলে। ঊনিশ শ' পনের সালের ডিসেম্বরে ওর বাপ ওকে ছোরাটা দেয়, ভ্লাদিমির এইটে নেবার জন্যই বিশেষ করে পুশকিনোতে আসে। ঠিক এই সময়েই ওর স্ত্রী ক্সেনিয়ার সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়। বউয়ের ইচ্ছা ছিল ছোরাটা ভ্লাদিমির তার কাছেই রেখে যাক্‌ আর গুপ্ত ঘাঁটিটাও তাকে দেখিয়ে দিক্‌। সে ঝগড়ায় একটা মস্তো মাতব্বর ছিল ক্সেনিয়ার ভাই ভালেরি নিকিৎস্কি। বোধহয় তার ধারণা ছিল গুপ্ত ঘাঁটির মধ্যে দামী দামী হীরাজহরত আছে।

অবশ্য তার ধারণাটা ভুল। তা যদি হত তাহলে ভ্লাদিমির নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাবার আগে ছোরাটা আমার জিম্মাতেই রেখে যেত।’

মিশা আর স্লাভা এবার বিদ্রূপভরে তাকাল গেঙ্কার দিকে।

মারিয়া গাভ্রিলভ্না বলে চলেছেন, ‘গত বছর ভালেরি আমার কাছে এসে আমায় বোঝাল যে গুপ্ত ঘাঁটিতে এমন কতকগুলো দলিল আছে যা দিয়ে ভ্লাদিমিরকে বিপদে ফেলানো যায়। সে বলল ভ্লাদিমির নাকি তার কোলেই মাথা রেখে মারা যায় আর মরার আগে অনুরোধ করে যায় যেন দলিলগুলো নষ্ট করে ওর সম্মান বাঁচায় ভালেরি। ভালেরি আমাকে বুঝিয়েছিল যে এই কারণেই ও রাশিয়াতে থেকে গেছে আর লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।’

পুশকিনোতে এসে গাড়িখানা তেরেন্তিয়েভার বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

পুরনো ইটের বাড়ি। সামনে বড়ো বড়ো থাম। অনেকগুলো গুদামঘর রয়েছে চত্বরে। অযত্নে পড়ে থাকা, কিছু কিছু ধ্বসেও পড়েছে। কিন্তু আসল বাড়িটা ঠিক আছে। বাড়ির ডানধারে মসৃণ বরফ আর বরফে-ঢাকা জানলা দেখলে বোঝা যায় যে শুধু বাঁ দিকটাতেই লোক থাকে।

খাবার ঘরের ভেতরে ঢুকল ওরা। ঘরের মাঝখানটিতে গোল পায়াওয়ালা একটা লম্বা টেবিল পাতা। টেবিল ঢাকা কাপড়ের একটা কোণা উল্‌টোনো, অয়েলক্লথের ওপর ময়দার তিনটে ছোট ছোট ঢিবি: নিশ্চয়ই কেউ বাছাই করছিল ওগুলো।

মারিয়া গাভ্রিলভ্না বললেন, ‘বাড়িতে আমাদের অনেকগুলো ঘড়ি আছে। ঠিক কোন্‌টার কথা বলা হয়েছে তা তো জানিনে।’
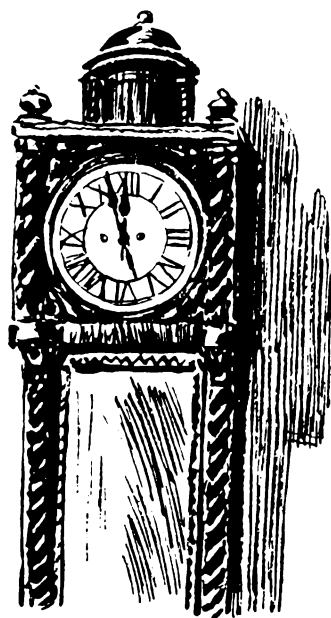
স্ভিরিদভ মন্তব্য করলেন, 'খুব সম্ভব আপনি যেটার কথা বলছিলেন সেটাই।'

'সেটা রয়েছে লাইব্রেরিঘরে।'

লাইব্রেরিঘরের একটা কুলুঙ্গিতে কাঠের কেসের ভেতর একটা মস্তো ঘড়ি। কাঁচের আড়ালে ঘড়ির মুখটা হলদে দেখায়। দম দেবার চাবির ফুটোর কাছেই একটা চেরা জায়গা আছে, প্রায় চোখেই পড়ে না এমনি। ঘড়ির মুখটা খুলে ফেললেন স্ভিরিদভ। পেণ্ডুলামটা কাত হয়ে দুলে খরখর আওয়াজ করে উঠল।

ঘড়ির কাঁটাদুটোকে ১২টা বাজার এক মিনিট আগে দাঁড় করিয়ে দিলেন স্ভিরিদভ। তারপর চেরা জায়গাটার মধ্যে ছোরার সেই ব্রোঞ্জের সাপটা ঢুকিয়ে সাবধানে ডানপাশে মোচড় দিয়ে ঘড়িতে চাবি দিলেন।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। গেংকা দাঁড়িয়ে আছে মুখখানা একেবারে হাঁ করে।

মিনিটের কাঁটা কেঁপে উঠে সরে গেল — ঘড়ির মুখের ওপর একটা ছোট্ট দরজা খুলে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা নকল কোকিল। 'কু-উ, কু-উ' করে বারোবার ডাকল পাখিটা, ঘড়িটা ঘড়ঘড় করে উঠল। কোকিলটা সামনে ঠেলে বেরিয়ে আসতেই ঘড়ির উপরের বুরুজ এগিয়ে এল আর ঘড়ির কেসের উপরের অংশটা খুলে গেল। ঘড়ির কেসে দুটো দেয়াল আছে। লুকোনোর জায়গাটার সবচেয়ে বড়ো কেরামতি হল — ঘড়ির কেস্টাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা পুরো নিরেট কাঠ দিয়ে তৈরি। শুধু যখন সাপ দিয়ে ঘড়িতে চাবি দেওয়া হবে তখনই বুরুজ উঁচু হয়ে লুকোবার জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে। সেটার ভেতরে আছে কাগজপত্রে ঠাসা একটা বড়ো চারকোণা বাক্স।

কিনারা-ছেঁড়া অনেকগুলো নীল নকশা-কাগজ পেঁচিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, পুরনো হল্দে হয়ে-যাওয়া কাগজ দিয়ে শক্ত করে ঠাসা

পুঁথি, নোট বই আর মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই একটা প্রকাণ্ড খাতাও আছে বাক্সের ভেতরে।

স্ভিরিদভ আর নাবিক ভদ্রলোক সাবধানে দলিলপত্তরগুলো তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। ছেলেরাও টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করল।

নাবিক ভদ্রলোক বললেন, 'সমুদ্র আর মহাসাগর অনুযায়ী সবকিছু সাজানো আছে। এই দ্যাখো, ভারত মহাসাগরও রয়েছে।' একটা খাতার মলাটের ওপরের লেখাটা পড়লেন, "গ্রস্‌ভেনর", ইংরেজ জাহাজ। সিংহলের কাছে ১৭৮২ সালে নিমজ্জিত হয়। জাহাজের সওদা: সোনা ও দামী পাথর। "বেট্‌সি", দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ ...'

কথার মাঝখানে বললেন স্ভিরিদভ, 'এবার আমাদের নিজেদের সমুদ্রগুলো একটু দ্যাখো তো।'

'বেশ,' দস্তাবেজগুলো এক এক করে বেছে বেছে 'কৃষ্ণসাগর' লেখা একটা খাতা খুললেন নাবিক ভদ্রলোক। 'এই যে জাহাজের নাম "ত্রাপেজুন্দ", ক্রিমিয়ার খাঁ দৌলত্-গিরেই'এর সম্পত্তি। ১৮৫৪ সালের ১৪ই নভেম্বর ঝড়ের সময় চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে বালাক্লাভা উপসাগরে জলমগ্ন হয়েছিল "প্রিন্স" জাহাজ। ওঃ, এ যে দেখছি মস্ত এক তালিকা!' কাগজ ওলটাতে ওলটাতে মাথা নাড়লেন, 'দারুণ মূল্যবান্ জিনিস! জাহাজ ডুবির সঠিক জায়গাগুলোর হুবহু বর্ণনা হয়েছে, সাক্ষ্যপ্রমাণ সমস্ত আছে। সব খবরই তো এতে দেওয়া আছে দেখছি, কিছু বাদ নেই ...'

স্ভিরিদভ বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যিই অদ্ভুত জিনিস। আমাদের নতুন জাহাজ উদ্ধার-সংগঠনটার কাজে লাগবে।'

নাবিক বললেন, 'তা বটে, খুব কাজে লাগবে।'

৭৪

কমসমোলের নতুন সভ্য

ইয়ারস্লাভ্ল সড়ক ধরে আবার গাড়ি ছুটল। এবার চলেছে মস্কোর দিকে। পেছনের আসনে আরাম করে বসেছে মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা। স্ভিরিদভ আর নাবিক ভদ্রলোক তেরেন্তিয়েভার বাড়িতেই রয়ে গেছেন। ছেলেদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল কারণ ওদের আবার তাড়া আছে — ইস্কুলে লাল ফৌজের পঞ্চম বার্ষিকী উৎসবে হাজির থাকতে হবে।

আসনের নরম পিঠটার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে গেঙ্কা খুব ভারিক্কি চালে বলল, 'গাড়ি চড়তে আমি ভালোবাসি।'

মিশা ফোঁড়ন কাটল, 'অভ্যেস যাবে কোথা!'

গেঙ্কা এবার শুরু করল, 'মোটের ওপর বুড়োটা বিচ্ছিরি ধরনের লোক।'

'কে?'

'পলিকার্প তেরেন্তিয়েভ।'

'কেন?'

'এমন হাড়কিপ্টে যে লুকোনো জায়গাটাতে কিছু পয়সাকড়িও রেখে যায়নি।'

'ও, তাই বল!' মিশা হাসল, 'এবার তোর সেই সুতোর গল্প কিছু শোনা!'

'সুতোর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? তোরা ভেবেছিস গুদামঘরে অস্ত্রশস্ত্র ছিল সে খবর আমি তখুনি জানতাম না? জানতাম — যা খুশি বাজি রেখে বলতে পারি জানতাম। তবে তোদের কাছে সুতো বলেছিলাম ইচ্ছে করেই। আমার নিজস্ব একটা গোপন ব্যাপার থাকুক — এই ভেবেছিলাম আমি। মাইরি বলছি! আর এও বুঝেছিলাম যে নিকিৎস্কি একটা গুপ্তচর। দেখবি তোরা, ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করবে "সম্রাজ্ঞী মারিয়া" জাহাজ ওই ডুবিয়েছিল।'

মিশা বলল, 'ব্যাপারটা বেশ মজার, নারে? নিকিৎস্কি তখনো পুশকিনোতে

লুকিয়ে ছিল, অথচ স্ভিরিদভ সব খবরই রাখত, সীমান্তের কাছে ওকে এমনিতেই ঠিক ধরে ফেলত।'

স্লাভা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মিশা, চিঠিটার কী হল?'

হঠাৎ মনে পড়তেই মিশা বলল, 'ও! হ্যাঁ!'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল ও। স্ভিরিদভ ওকে খুব রহস্যের ভাব করে চিঠিটা দিয়েছিল। লেফাফার ওপরে কার যেন পরিষ্কার হাতের লেখা: 'মিখাইল পলিয়াকোভ ও গেন্নাদি পেত্রোভকে। ব্যক্তিগত।'

স্লাভাকে ঠাট্টা করে গেঙ্কা বলল, 'দেখলি তো? তোর নাম পর্যন্ত করেনি।'

মিশা ওকে খোঁচা দিল, 'আগেভাগেই লাফাসনে। আগে পড়ে দেখা যাক্।'

চিঠিটা খুলে ও জোরে জোরে পড়তে লাগল:

'ভাই মিশা আর গেস্কা!

'কে লিখছে আন্দাজ করো দেখি। ধরতে পারলে? নিশ্চয় পেরেছ। ঠিক বলেছ! হ্যাঁ. আমিই সের্গেই ইভানভিচ পলেভোয়। তারপর, কেমন চলছে, মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ? ভালো তো, কী বলো?

'কমরেড স্ভিরিদভ আমাকে তোমাদের কথা লিখে জানিয়েছেন। বাহাদুর ছেলে! আমি তো ভাবতেই পারিনি তোমরা নিকিৎস্কিকে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল করতে পারবে। রেভস্কে থাকতে আমাকে সে একটু ধোলাই দিয়েছিল, সে-কথা ভাবলে এখনো লজ্জা পাই।

'আমার একটা চিহ্ন হিসেবে তোমরা ছোরাটা নিজেদের কাছে রাখতে পারো। শুনেছি তোমাদের তৃতীয় আরেক বন্ধু আছে। তাই তোমাদের তিনজনকেই দিলাম ছোরাটা। তোমরা যখন বড়ো হয়ে একসঙ্গে তিনবন্ধুতে মিলবে, তখন ছোরাখানা দেখে তোমাদের কৈশোরের কথা মনে পড়বে!

'আমার নিজের খবর হল, আমি আবার নৌবাহিনীর চাকরিতে ঢুকেছি। তবে এখন একটা নতুন কাজে হাত দিয়েছি। জাহাজ উদ্ধার করে, মেরামত করে ফের সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য তৈরি করে দেওয়া — এই হল নতুন কাজ।

'আমার এই ছোট চিঠিটা এখানেই শেষ করছি।

'তোমরা বড়ো হয়ে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হবে, আমাদের মহান্ বিপ্লবের সত্যিকারের সন্তান হবে এই আমার কামনা।

'কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ
'পলেভোয়।'

...গাড়ি এতক্ষণে শহরের ভেতর এসে পড়েছে, সামনের কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুখারেভ টাওয়ার।

মিশা বলল, 'মিটিঙে যেতে আমাদের দেরি হয়ে যাবে দেখছি।'

স্লাভা বলল, 'এর চেয়ে না যাওয়াই বোধহয় ভালো। অন্যরা সবাই কমসমোল সদস্যের কার্ড পাবে আর আমাদের তাই দাঁড়িয়ে দেখা মোটেই সুখের হবে না ...'

মিশা বলল, 'সেইজন্যই তো আরো বেশি করে আমাদের যাওয়া দরকার। নইলে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করবে।'

ড্রাইভার জানিয়ে দিল, 'এই যে, এসে পড়েছি!'

গাড়ি থেকে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে ওরা ইস্কুল বাড়ির মধ্যে ঢুকল। সভা ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। সিঁড়িটা নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু পোষাকঘরের কাছে বসে ব্রশা মাসি তার বোনা নিয়ে বরাবরকার মতো ব্যস্ত।

ব্রশা মাসি বলল, 'এখন কাউকে ঢুকতে দেবার কথা নয়। ঠিক সময়ে আসতে শেখা উচিত প্রত্যেকের।'

মিশা সাধাসাধি করল, 'ব্রশা মাসি গো, এবারটি ছেড়ে দাও, বার্ষিকী উৎসব আছে যে!'

'শুধু বার্ষিকী উৎসবের জন্যই ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে।' বলে ব্রশা মাসি ওদের কোটগুলো হাতে নিল।

ছেলেরা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে পা টিপে টিপে ভিড়-ঠাসা হলঘরটায় ঢুকল। ঠিক দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা। হলের একেবারে ওপাশে

মঞ্চের ওপর লাল কাপড়ে ঢাকা টেবিলটা দেখতে পেল, টেবিলের ওধারে সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যরা বসে আছেন। চওড়া চওড়া জানলাগুলোর ওপর দিয়ে দেয়াল জুড়ে লাল শালুতে লেখা: 'সাম্যবাদী বিপ্লবের ভয়ে কেঁপে উঠুক শাসক শ্রেণীরা। হাত পায়ের শেকল ছাড়া সর্বহারা শ্রেণীর আর কিছুই নেই হারাবার। জিতে নেবার জন্য আছে গোটা দুনিয়া।'

কথাগুলো পড়তে কষ্ট হচ্ছে মিশার। ফেব্রুয়ারির গোল পাণ্ডুর সূর্য। এমন ঝাঁঝালো রোদ জানলার ভেতর দিয়ে ঠিকরে এসে পড়ছে যে ওর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল।

কোলিয়া সেভস্তিয়ানভ বক্তৃতার শেষদিকে নোটবইটা বন্ধ করে বলল:

'বন্ধুগণ! এই অনুষ্ঠানের মর্যাদা আজ আরো বেড়ে গেছে এইজন্য যে খামোভ্‌নিকি জেলা কমিটির কমসমোল পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ আমাদের দলের সেরা পাইওনিয়রদের প্রথম গ্রুপকে কমসমোল সদস্যপদে গ্রহণ করা হল ...'

তিনটি ছেলের মুখ লাল হয়ে উঠল। মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইল গেঙ্কা আর স্লাভা। কিন্তু মিশা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সূর্যের দিকে, চোখ ওর জ্বালা করল, তবু ওর মনে হল যেন সারা দিগন্ত জুড়ে জ্বলছে হাজার হাজার খুদে খুদে সূর্য।

কোলিয়া শুরু করল, 'এবার নামগুলো বলছি।' ফের নোটবই খুলল সে, 'মারগারিতা ভরোনিনা, জিনা ক্রুগলোভা, শুরা অগুরেয়েভ, স্লাভা এলদারভ, মিশা পলিয়াকোভ, গেন্নাদি পেত্রোভ ...'

কী বলল? ওরা ঠিক শুনেছে তো! তিন বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। গেঙ্কা হঠাৎ খুশি চাপতে না পেরে স্লাভার পিঠে চাপড় মেরে বসল। স্লাভাও পাল্‌টা দিতে গেল, কিন্তু কাছেই বসেছিলেন আলেক্সান্দ্রা সের্গেয়েভনা। আঙুল উঁচিয়ে সাবধান করে দিলেন উনি। স্লাভা তাই গেঙ্কাকে পা দিয়ে শুধু একটা গুঁতো মেরেই ক্ষান্ত হল।

এবার সকলে দাঁড়িয়ে 'আন্তর্জাতিক' গান ধরল। মিশা গম্‌গমে গলায় গাইতে থাকে, তার গলায় একটা অদ্ভুত কাঁপুনি।

জানলার ওপাশে উজ্জ্বল থালাটা এবার যেন আরো ঝলমলে, আরো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। সূর্যের কিরণ আরো জায়গা জুড়ে আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ল সারা দিগন্তরেখা জুড়ে — ছড়িয়ে পড়ল বাড়িঘর, ছাদ, ঘণ্টাঘর আর ক্রেমলিনের মিনার-চূড়ার ওপর।

মিশা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল উজ্জ্বল থালাটার দিকে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ফৌজী ট্রেনের সেই দৃশ্য, — লালফৌজের সৈনিকরা, ধূসর ফৌজী ওভারকোট-পরা পলেভোয় আর সেই পেশীবহুল-দেহ মজুরের ছবি — একটা মস্তো হাতুড়ির ঘায়ে সে দুনিয়াজোড়া শেকল ভেঙে ফেলছে!